স্বামী তুরীয়ানন্দ

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ



উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা

প্রকাশক
স্বামী আত্মবোধানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা—৩

মুদ্রাকর
শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য
ইকনমিক প্রেস
২৫, রায়বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা

আশ্বিন, ১৩৬১

সাড়ে তিন টাকা



ভূমিকা

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে বেলুড় মঠে পূজনীয় স্বামী তুরীয়ানন্দজীকে প্রথম দর্শন করি। তখন আমি সাধু হইতে চেষ্টা করিতেছিলাম। তৎপূর্বে তাঁহার কঠোর ত্যাগ-তপস্যার কথা তদীয় গুরুভাইদের মুখে শুনিয়াছিলাম। প্রথম দর্শনেই তাঁহার প্রতি আমি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হই এবং মঠে আসিলে তাঁহার সহিত ধর্মবিষয়ে আলাপ ও তাঁহার সেবাদি করিবার সুযোগ খুঁজিতাম। তিনি এত স্বাবলম্বী স্বাধীনচেতা ছিলেন যে, তখন অসুস্থ হইলেও সহজে অন্যের সেবা লইতে সম্মত হইতেন না। মাঝে মাঝে তিনি অবশ্য সামান্য সেবা লইতেন; কিন্তু তাহা অনেকটা অনিচ্ছাসত্ত্বে।

সাধু হইবার জন্য তিনি আমাদিগকে খুব উৎসাহ দিতেন এবং সময় সময় স্বামীজীর এই কথাটি বলিতেন, 'Young men of Bengal, to you I especially appeal'. (বাংলার তরুণগণ, তোমাদিগকেই আমি বিশেষভাবে আবেদন করি।) "স্বামীজী কত আশা করে গেছেন, তোমাদের মত অনেক যুবক তৎপ্রবর্তিত সেবা-ধর্ম গ্রহণ করবে। তোমরা সাধু হয়ে তাঁর কাজ করে ধন্য হও।"

উক্ত বৎসরের অক্টোবর মাসে পুরীধামে স্বামী তুরীয়ানন্দকে পুনরায় দর্শনলাভের সুযোগ হয়। ঐ সময়ে আমি পুরীতে পূজ্যপাদ ব্রহ্মানন্দ মহারাজের কাছে যাইয়া সংঘে যোগদান করি এবং তাঁহাদের সহিত 'শশী নিকেতনে' থাকি। তাঁহাদের পূত সঙ্গে মাসাধিক কাল কাটাইবার পর আমি মাদ্রাজ মঠে প্রেরিত হই। পুরীতে হরি মহারাজ শঙ্করাচার্যের প্রকরণ-গ্রন্থাবলী প্রথমে পড়িতে আমাকে উৎসাহিত করেন।

তথায় উচ্চ রাজকর্মচারী শ্রীঅটলবিহারী মৈত্রের বাড়ীতে সেইবার ৺জগদ্ধাত্রীপূজার আয়োজন হয়। মহারাজ আমাকে পূজক নির্বাচিত করেন এবং পূজার পূর্বে আমাকে পূজা-পদ্ধতি ভালরূপে অম্বিকানন্দজীর দ্বারা শিখাইয়া লন। উক্ত পূজায় পূজনীয় হরি মহারাজ প্রধান তন্ত্রধারক এবং স্বামী অম্বিকানন্দ সহকারী তন্ত্রধারক ছিলেন। ব্রহ্মানন্দ মহারাজও পূজার স্থানে উপস্থিত ছিলেন। ৺জগদ্ধাত্রী-পূজা খুবই বিস্তৃত এবং বহু ঘণ্টা ব্যাপিয়া চলে। এত বড় পূজা আমি সেই প্রথম করি। আনুষ্ঠানিক পূজার দীর্ঘ ন্যাসাদি করিতে অনভ্যস্ত আমার মন মাঝে মাঝে ক্লান্তিবোধ করিতেছিল। কিন্তু ধ্যানকালে আনন্দ পাইতেছিলাম, সেইজন্য কিছু বেশীক্ষণ ধ্যান করিতেছিলাম। হরি মহারাজ দুই-এক বার ইহা লক্ষ্য করিলেন, পরে দৃঢ়স্বরে বলিয়া উঠিলেন, “ধ্যান হয়ে গেছে, এবার পূজা আরম্ভ কর।”

যথাকালে ৺মায়ের পূজা আরম্ভ হইল। খানিকক্ষণ পরে ঔপচারিক পূজায় মনে একটু অবসাদ আসিল। কিন্তু ধ্যানের সময় আসিতেই তাহা কাটিয়া গেল। আমি বেশ আনন্দে ধ্যান করিয়া যাইতেছি, সময় উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এ বিষয়ে আমার খেয়াল ছিল না। এবার হরি মহারাজ পূর্বাপেক্ষা দৃঢ়তর কণ্ঠে ও কতকটা তিরস্কারের সুরে বলিলেন, “অনেকক্ষণ ধ্যান হয়ে গেছে, এবার পূজা আরম্ভ কর। অধিক ধ্যানে পূজার বিলম্ব করিয়া ভক্তদের অসুবিধা করিও না।” তৎপরে সাধারণ পূজা ও কুমারীপূজা সমাপ্ত হইল।

পূজায় যাঁহারা ব্যাপৃত ছিলেন তাঁহারা সকলে জলযোগ করিতে বসিলেন। হরি মহারাজ নিজের থালা হইতে ভাল ভাল জিনিসগুলি আমার পাতে সস্নেহে তুলিয়া দিলেন। পূজাকালে তাঁহার ভর্ৎসনার জন্য আমার মনে যে একটু কষ্ট হইয়াছিল তাহা এখন মুছিয়া গেল এবং তাঁহার কৃপায় আনন্দে মন ভরিয়া উঠিল।

পূজার শেষে আমরা সকলে 'শশী নিকেতনে' ফিরিয়া গেলাম। হরি মহারাজ আমাকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, "পূজার সময় তোমার যে ধ্যানের ভাব আসিয়াছিল তাহা উত্তম। কিন্তু অধিক ধ্যান করিলে পূজা এবং ভোগরাগ ও ভক্তদের প্রসাদগ্রহণ প্রভৃতি শেষ হইতে খুব বিলম্ব হইত; ইহা কিছুতেই বাঞ্ছনীয় নহে।" তিনি আরও বলিলেন, "জান আমাদের আদর্শ কি? যখনই ধ্যানের ইচ্ছা হইবে তখনই ভিতরে ঢুকিয়া বাহিরের দ্বার বন্ধ করিয়া ধ্যানমগ্ন হইব। আবার আবশ্যক হইলে ধ্যান ছাড়িয়া সহজভাবে বাহিরে আসিয়া কাজ করিব।" তিনি সাধুজীবনের উচ্চ আদর্শ অনুসরণ করিতে আমাকে খুব উৎসাহ দিতেন। মাদ্রাজ যাইবার পূর্বে তিনি ও মহারাজ পরামর্শ করিয়া আমাকে ব্রহ্মচারী নিত্যচৈতন্য নাম দিলেন এবং খুব আশীর্বাদ করিলেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দকে দর্শন করিবার পর হইতে তাঁহার পূতসঙ্গে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিবার আন্তরিক ইচ্ছা পোষণ করিতেছিলাম। ইহা পূর্ণ করিবার সুবর্ণ সুযোগ আসিল ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে। শ্রীশ্রীমা সেই সময়ে বাগবাজার মঠে অন্তিম অসুখে শয্যাশায়িনী। আমি কাশীতে সকালে পৌঁছিয়া বিকালে যখন হরি মহারাজকে দর্শন করিতে যাই তখন তিনি আপনা হইতেই বলিলেন, "তুমি আমার কাছে থাক না কেন? সনৎ শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে কলিকাতা যাইতেছে।" তখন হইতে ১৯২১ খ্রীঃ মার্চ মাস পর্যন্ত তাঁহার পূতসঙ্গ ও সেবা করিবার অধিকার পাইয়া ধন্য হইয়াছিলাম। আমি মাঝে মাঝে পূজনীয় হরি মহারাজের সঙ্গে খুব ধর্মপ্রসঙ্গ করিতাম। আমি একদিন তাঁহার সহিত আলোচনা করিতেছিলাম। আমার ধারণা ছিল, আত্ম-সমর্পণ করা তত কঠিন নহে। কিন্তু হরি মহারাজ বলিলেন, "ঠিক ঠিক আত্মসমর্পণ তখনই করা যায় যখন ঠাকুরের সেই উপমার "মাস্তলের পাখী"র মত উড়িয়া উড়িয়া ডানা দুটি এত ক্লান্ত হইয়া পড়িবে যে,

আর উড়িবার শক্তি থাকিবে না। প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া যখন সাধক দেখে তাহার আর চেষ্টা করিবার সামর্থ্য নাই, তখনই শরণাগতির ভাব ঠিক ঠিক আসে।"

পূজনীয় হরি মহারাজ তাঁহার সেবকদের সর্বাঙ্গীণ বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক মঙ্গল সর্বদা কামনা করিতেন এবং তাহাদের জন্য খুব দায়িত্ববোধ করিতেন। কখন কখন বলিতেন, "এরা আমার শরীরের সেবা করে, আর আমি এদের মনের সেবা করি।" সময় সময় আমরা নানা কারণে মন খারাপ করিয়া অজ্ঞানতাবশতঃ তাঁহাকে চিন্তিত করিয়া তুলিতাম। কচিৎ কখন বিরক্ত হইয়া তিনি বলিয়াও উঠিতেন, "সময় সময় তোমাদের মনের সেবা করিতে গিয়া আমাকে প্রাণান্ত হইতে হয়।" আমাদের মন যাহাতে উচ্চ সুরে, ভগবদ্‌ভাবে বাঁধা থাকে ও আমরা আনন্দে থাকি, তাহার দিকে তিনি খুব দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহার জনৈক সেবক তাঁহার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিল। আমাদের মনে হইত তাঁহার উপর হইতে মন তুলিয়া লইয়া সেই ভালবাসা ঈশ্বরে অর্পণ করাইবার উদ্দেশ্যে তিনি উক্ত সেবককে সময়ে সময়ে খুব বকিতেন। সন্ধ্যার পর সেবাশ্রমের স্কুলবাড়ীতে তিনি শুইতে যাইতেন এবং একজন সেবককে সারারাত তাঁহার কাছে থাকিতে হইত। একদিন রাত্রে তাঁহার কাছে আমার থাকিবার পালা পড়িল। আমি নিজে না যাইয়া উক্ত সেবকটিকে যাইতে বলিলাম। আমার কথায় সেবকটি যাইয়া হরি মহারাজের বকুনি খাইয়া ফিরিয়া আসিল। তবু আমি নিজে না যাইয়া আর একটি সেবককে যাইতে অনুরোধ করিলাম এবং বলিলাম, "আমি তাঁহার কাছে যাইয়া ভর্ৎসনা খাইতে চাহি না। দ্বিতীয় সেবকটি রাত্রে তাঁহার কাছে গিয়া রহিল। কিন্তু পরদিন ভোরে আমাকে সেবার জন্য হরি মহারাজের নিকট যাইতে হইল। আমাকে দেখিবামাত্র তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তুমি আমার কাছে আসতে ভয় পাচ্ছিলে শুনে কাল

রাত্রে আমার প্রাণটা ছ্যাঁক্ করে উঠল।" তিনি একজনকে প্রয়োজনবশতঃ বকিতেন তাহার কোন দোষ দূর করিবার জন্য। ইহাতে অন্য কেহ ভীত হইলে এইরূপ স্নেহের স্পর্শ দিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিতেন।

পূজনীয় হরি মহারাজ তখন বহুমূত্ররোগে ভুগিতেছিলেন। একদিন আমি তাঁহার গা হাত পা টিপিয়া দিতেছিলাম। অনবধানতাবশতঃ আমার হাতের নখ লাগিয়া তাঁহার গায়ের সামান্য একটু চামড়া উঠিয়া গেল। আমি ভাবিয়াছিলাম, তিনি হয়ত এইজন্য আমাকে বকিবেন। কিন্তু এই বিষয়ে কোনরূপ ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তিনি অন্য একটি সেবককে বলিলেন, "এই জায়গায় একটু অ্যালকোহল (alcohol) লাগাইয়া দাও।" আর আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "অসুখে আমার শরীরটা একেবারে পচে গেছে!"

ডাক্তারের পরামর্শমত এই সময় হরি মহারাজ ঠাণ্ডা শরবত আদি পান করিতেন। বাদাম ও পেস্তা বাঁটিয়া এবং উহার সঙ্গে গোলমরিচ গুঁড়া করিয়া মিশাইয়া শরবত প্রস্তুত হইত। তখন আমিই উক্ত প্রকারে তাঁহার জন্য পানীয় তৈয়ার করিতাম। একদিন উহা খাইয়া বলিলেন, "আজকে বুঝি যথেষ্ট গোলমরিচ দাও নি! মন দিয়ে কাজ কর না?" আমি যথাসাধ্য ভালরূপেই শরবত প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। তাঁহার মন্তব্য শুনিয়া মনটা খারাপ হইয়া গেল। তাহা বুঝিতে পারিয়া তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, "এই সামান্য ব্যাপারেই মন খারাপ করে বসলে?"

হরি মহারাজের শারীরিক উত্তাপ স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিক হইতেছিল। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর উত্তাপ দেখিবার জন্য ডাক্তার বলিয়াছিলেন। হরি মহারাজ আমাকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, "উত্তাপ লইবার সময় তোমাকে ডাকিব।" আমি ঘুমাইবার পূর্বে মনকে বলিয়া রাখিয়াছিলাম, "তিনি ডাকিলেই উঠিতে হইবে।" রাত্রি প্রায়

একটার সময় হরি মহারাজ আমাকে ডাকিতেই আমি সজাগভাবে তাঁহার কাছে গেলাম এবং তাঁহার উত্তাপ লইলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘুমের আবেশ আছে নাকি?" আমি উত্তর দিলাম, "না, মহারাজ।" এইরূপ সত্বর সেবায় তিনি বিশেষ প্রীত হইলেন। কিন্তু সেইসঙ্গে আবার বলিলেন, "এজন্য যেন গর্ববোধ করো না।"

একদিন সকালে দেখিলাম, যে সেবকটিকে তিনি খুব বকিতেন সে বৃষ্টির জন্য মাথায় কম্বল চাপা দিয়া সেবাশ্রমের অফিসের দিকে যাইতেছে। অনেক সময় কাটিয়া গেল, কিন্তু সে ফিরিল না। হরি মহারাজ তাহার জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। বলিলেন. "দেখ দেখি ছেলেটি কোথায় গেল। সেকি অন্যত্র চলিয়া গেল, না আত্মহত্যা করিল? তার জন্য মনটা খুব চিন্তিত। তুমি আর কাউকে নিয়ে তাকে খুঁজে বের করে সঙ্গে করে নিয়ে এস।" এই উক্তি হইতে বোঝা যায়, তিনি সেবককে কত ভালবাসিতেন এবং তাহার কত মঙ্গল কামনা করিতেন। আমি অন্য দুই-তিন জনের সহিত তাহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে গঙ্গার ধারে গেলাম। সেখানে দেখি উক্ত সেবকটি গঙ্গার ঘাটের উপর চুপ করিয়া বসিয়া ধ্যান করিতেছে। তাহার দুঃখের কারণ আমি জানিতাম। তাই তাহাকে আরও কিছুক্ষণ মনের শান্তিতে বসিয়া থাকিবার অবকাশ দিয়া সেবাশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম। হরি মহারাজের স্নানের সময় হইয়াছে, আমাকে তাঁহার কাছে থাকিতে হইবে। ঘাটস্থ অন্যান্য সাধুকে বলিয়া আসিলাম, সেবককে সঙ্গে করিয়া হরি মহারাজের কাছে আনিতে। আমাকে সেবাশ্রমে একাকী ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কোথায়?" আমি সব সংবাদ দিলাম। আমার উপর তাঁহার আদেশ ছিল সেবককে সঙ্গে করিয়া আনিবার। আমি তাহা না মানিয়া নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া সেবককে গঙ্গাতীরে অন্য সাধুদের

নিকট রাখিয়া আসিলাম ; ইহাতে হরি মহারাজ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া আমাকে ভীষণভাবে বকিতে লাগিলেন। আমি বিষণ্ণ হইয়া পড়িলাম। তাহা দেখিয়া তিনি খুব শান্তভাবে ইংরেজীতে বলিলেন, 'Don't you feel nervous !' (ভয় পাইও না)। আমি যেই নিজেকে একটু সামলাইয়া লইলাম আবার তাঁহার ভর্ৎসনাবর্ষণ আরম্ভ হইল। আমি ত এই ব্যাপার দেখিয়া অবাক্ ! বাহিরে তাঁহার যে রাগের ভাব ছিল তাহা উপর উপর, তাহার পশ্চাতে ছিল সুগভীর শান্ত ভাব। ইহা দেখিয়া তাঁহার বকুনির জন্য আমি আর দুঃখিত হইলাম না। সেবকটি কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিল। হরি মহারাজ আমাদের সকলের উপর, বিশেষতঃ তাহার উপর, অশেষ করুণা দেখাইলেন।

ধর্মজীবনের প্রথমেই বেদান্তশাস্ত্র রীতিমত প্রণালীবদ্ধভাবে পড়িবার ইচ্ছা হয়। কি কি গ্রন্থ পড়া উচিত সে সম্বন্ধে হরি মহারাজকে পত্রে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাহার উত্তরে তিনি ৫।৫।১২ তারিখে কনখল হইতে আমাকে লিখিয়াছিলেন—"বেদান্ত সম্বন্ধে উপনিষদ, গীতা ও শারীরক ভাষ্যই প্রস্থানত্রয়। ইহাতেই বিশেষ গতি থাকার প্রয়োজন, প্রকরণগ্রন্থও অনেক। সকল পুস্তক দেখা কঠিন। পঞ্চদশী, যোগ-বাশিষ্ঠ, বিবেকচূড়ামণি প্রভৃতি গ্রন্থও খুব প্রসিদ্ধ। পঞ্চদশী বেশ ভাল করিয়া পড়িলে অদ্বৈতমতের মোটামুটি তথ্য বেশ ভাল জানা যায়। সর্বোপরি সাধনার বিশেষ অপেক্ষা। বেদান্তে—অনুভূতিই আসল। তাহা সাধনসাপেক্ষ। পঠন তাহার সহায়ক মাত্র।"

আর এক পত্রে এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম, "আমার খুবই মনে হয় আমরা চারিদিকে গণ্ডী কাটিয়া নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখি এবং তদ্দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ বন্ধ করি।" তদুত্তরে তিনি কনখল হইতে ২৫।৩।১২ তারিখে আমাকে লিখিয়াছিলেন—"তুমি আপন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ আমার বোধ হয় রোগনির্ণয়ে তাহা ঠিকই হইয়াছে। শুধু

যে উহা তোমারই পক্ষে সত্য তাহা নহে, উহা সকলের পক্ষেই একরূপ। গণ্ডী কাটিয়াই আমরা আমাদের উন্নতির পথ প্রতিরোধ করি। অবশ্য গণ্ডীর আবশ্যক নাই, এরূপ কহিতেছি না। তবে কখন আবশ্যক আছে, কখন নাই—ইহা জানা খুব আবশ্যক। গীতায় (৬৷৩) আছে—

আরুরুক্ষোঃ মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥[১] ইত্যাদি

যাহা একবার যত্ন করিয়া আবাহন করিতে হয় তাহারই আবার সময়ান্তরে বিসর্জন অত্যাবশ্যক হয়। অবস্থাভেদে ব্যবস্থাভেদ—এই আর কি। তবে ইহা ঠিক করা বড়ই কঠিন সন্দেহ নাই। প্রভুর হস্তে সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলে আর কিছুরই জন্য অনুশোচনা করিতে হয় না, ইহা নিশ্চয়। প্রভুর কৃপায় সকলই ঠিক হইয়া যাইবে, ভাবনা নাই। ভগবচ্ছরণম্, ভগবচ্ছরণম্।"

অন্য পত্রে আমি এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম: "বীজমন্ত্রের ঠিক ঠিক অর্থ কি? বেদোপনিষদে প্রণব ছাড়া অন্য মন্ত্র দেখি না। তদুপরি ইহাও শুনি যে, অন্যান্য যেসব বীজমন্ত্র আছে তাহাদের উদ্ভব প্রণব হইতে। বিশেষ বিশেষ বীজমন্ত্র যদি জপ করা যায় তাহা হইলে সাধকের ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথে সেগুলি প্রণবে লীন হইবে কি?" তদুত্তরে তিনি আমাকে কাশী হইতে ২৭।১১।১২ তারিখে লিখিয়াছিলেন, "যেমন বীজে বৃক্ষের ভাবী উৎপত্তি ও বৃদ্ধি এবং ফুলফলাদির সম্ভাবনা নিহিত থাকে, সেইরূপ যে শব্দসহায়ে সাধকের আধ্যাত্মিক উন্নতির শক্তি উৎপন্ন হইয়া তাহাকে চরম উৎকর্ষপ্রাপ্তি করায়, তাহাই বীজমন্ত্র। মহাজন বলিয়াছেন—

---

১ যে মুনি যোগারূঢ় হইতে ইচ্ছুক তাঁহার পক্ষে নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান আবশ্যক আর যিনি যোগারূঢ় হইয়াছেন তাঁহার কর্মত্যাগ প্রয়োজন।

"মন তুমি কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব-জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফল্‌তো সোনা।
গুরুদত্ত বীজ রোপণ করে ভক্তিবারি তায় সেঁচ না।
আপনি যদি না পারিস্ মন, রামপ্রসাদকে সঙ্গে নেনা॥
কালীনামে দেও রে বেড়া মন, ফসলে তছরূপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁসে না॥"

মানব-জমি, গুরুদত্তবীজ, বীজরোপণ, ভক্তিজল-সেঁচন আর কালী-নামের বেড়া দেওয়া—এইরূপে সাধন করে আপনাকে পর্যন্ত নিবেদন—এই হ'ল সঙ্কেত। ঠাকুর বলতেন, 'রামপ্রসাদকে সঙ্গে নেনা।' এর মানে অহংবুদ্ধি—আমি রামপ্রসাদ অথবা অমুক—এ পর্যন্ত ভুলে যাওয়া। একেবারে তন্ময়ত্বলাভ করা, এই হল সাধনের পর্যবসান। ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবী সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দেরই ভিন্ন ভিন্ন শক্তির প্রকাশিত মূর্তি মাত্র—ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত—সাধকের অভীষ্টপূরণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিকাশিত। সুতরাং বীজও ভিন্ন ভিন্ন হইবে না কেন? তন্ত্রশাস্ত্রে এ বিষয়ে বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হইবে।

"সমস্ত হিন্দুমত এক বেদকেই আশ্রয় করিয়া (স্থিত) আছে। সুতরাং কোন মতই, অর্থাৎ পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি কিছুই অবৈদিক নহে। ইহাদের সকলেরই ভিত্তি বেদে। সাধকের বুঝিবার সুবিধার জন্য কেবল ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ঋষিরা ব্যাখ্যা করিয়াছেন ও সাধনপদ্ধতি বাঁধিয়া দিয়াছেন, এই মাত্র। শাস্ত্র প্রণেতারা বলেন, বেদেই তাঁহাদের প্রস্তাবিত বিষয়ের উল্লেখ আছে। আমরা সমস্ত বেদ না পড়িয়া 'ওসব বেদে নাই' এইরূপ বলিলে অন্যায় করিব, সন্দেহ নাই। শব্দমাত্রই যেমন প্রণবসম্ভূত, তখন সমস্ত বীজই যে প্রণবাত্মক, তাহাতে আর কথা কি? অনাহত শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, শুনিয়াছি। বীজমন্ত্রও জ্যোতিঃ—অক্ষরে দৃষ্ট হয় ও কখন কখন শ্রুতও হইয়া থাকে। বীজ প্রণবে মিলিত হইয়া যায়

কিনা, জানি না। তবে মন্ত্র ও দেবতা অভেদ, ইহা শুনিয়াছি। মন্ত্র যেন দেবতার শরীরের অধিষ্ঠানস্বরূপ। এসব ব্যাপার কেবল জিজ্ঞাসা করিয়া সিদ্ধান্তিত হয় না, সাধন করিতে হয় এবং গুরুকৃপায় ক্রমে উপলব্ধ হইয়া থাকে। ঠাকুরের কথা—'সিদ্ধি সিদ্ধি' বলিলে নেশা হয় না। সিদ্ধি আনিয়া তাহাকে ধুইতে, পরে বাঁটিতে হয়, তৎপরে পান করিলে তবে নেশা হয়। তখন 'জয় কালী,' 'জয় কালী' বলে আনন্দ কর। শাস্ত্রেও বলিয়াছেন, হেতুনিষ্ঠ হওয়া ভাল নহে। অবশ্য বুঝিবার জন্য কিছু কিছু প্রশ্ন করা যাইতে পারে। কিন্তু সাধন করিতে করিতেই ক্রমে সকল আপনিই উপরত হইয়া যায়। সাধন বিনা প্রশ্নের বিরাম অসম্ভব।

"প্রশ্নও যেমন ভিতর হইতে হয় সেইরূপ সাধন দ্বারা তত্ত্বনিশ্চয় হইলে, তবে ভিতরেই সকল সন্দেহের অবসান হইয়া যায় এবং ইহারই নাম শান্তি বা বিশ্রান্তিলাভ। ভগবৎকৃপায় যাহার হয় সেই-ই জানিতে পারে। নচেৎ প্রশ্ন করিয়া কোনকালে কাহারো সেই অবস্থা লাভ হয় না। ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ'[১] ইত্যাদি শত শত শাস্ত্রবচন ইহার প্রমাণ। লেগে যাও খুব, প্রভুর কৃপা হবেই। তখন 'জয় কালী' 'জয় কালী' বলিয়া কেবলি আনন্দ করিবে।"

আমি পত্রে হরি মহারাজকে অনেক প্রশ্ন করিতাম। উদ্ধৃত পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, "হেতুনিষ্ঠ হওয়া ভাল নহে। অবশ্য বুঝিবার জন্য কিছু কিছু প্রশ্ন করা যাইতে পারে ইত্যাদি।" ইহার পরবর্তী পত্রে কোন প্রশ্ন করি নাই। শুধু লিখিয়াছিলাম, "সমাধি না হওয়া পর্যন্ত সন্দেহ দূর হইবে বলিয়া মনে হয় না।" ইহার উত্তরে তিনি কাশী হইতে ২।১।১৩ তারিখে আমাকে লিখিয়াছিলেন, "এবার কোন

১ এই আত্মাকে বেদাধ্যাপনা দ্বারা লাভ করা যায় না।—কঠোপনিষদ্-১।২।২৩ বা মুণ্ডকোপনিষদ্-৩।২।৩



প্রশ্ন কর নাই। ঠিক বলিয়াছ, যতদিন সমাধি না হয় ততদিন সন্দেহের সম্পূর্ণ অবসান হয় না। সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ বিনা পড়িয়া বা শুনিয়া ঠিক ঠিক নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। তবে বিচারের দ্বারা অনেক উপলব্ধি হয়। শ্রদ্ধাপূর্বক শাস্ত্রপাঠ অনেক সাহায্য করে। সৎসঙ্গের ত কথাই নাই।"

জীবন্মুক্তি লাভ করিতে হইলে পুরুষকার বা ভগবৎকৃপা কোন্‌টির উপর অধিক নির্ভর করিতে হইবে, এই প্রশ্নের উত্তরে কাশী হইতে ২০।২।১৩ তারিখে তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন, "মানুষ যন্ত্রমাত্র, প্রভুই যন্ত্রী। ধন্য সেই যাহার দ্বারা তিনি আপন কার্য করাইয়া লন। সকলকে এই সংসারে কার্য করিতে হয়, না করিয়া কাহারও যাইবার যো নাই। তবে যে নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কর্ম করে, তাহার কর্ম তাহাকে পাশ হইতে মুক্ত না করিয়া বন্ধন ঘটায়। আর তাঁহার জন্য কাজ করিয়া কুশলী পুরুষ কর্মপাশ ছিন্ন করিয়া থাকে। আমি নই, তিনিই কর্তা—এই বোধে পাশ ছিন্ন হয়। আর ইহাই অতিশয় সত্য। 'আমি কর্তা'-বোধ ভ্রান্তিমাত্র। কারণ 'আমি'কে খুঁজিয়া পাওয়া দুরূহ। 'কে আমি' বিচার করিলে ঠিক ঠিক 'আমি' তাঁহাতেই পর্যবসিত হয়। দেহ-মন-বুদ্ধি এ সকলে 'আমি'বোধ অবিদ্যা-কল্পিত ভ্রান্তিমাত্র। শেষ পর্যন্ত টেকে কই? কিছুই ত আর বিচারে থাকে না। সব চলে যায়, থাকে মাত্র এক সত্তা, যাঁহা হইতে সমস্ত নির্গত হইতেছে, যাঁহাতে সমস্ত স্থিত এবং অন্তে যাঁহাতে সব লীন হয়। সেই সত্তাই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, অহংপ্রত্যয়সাক্ষী, আবার সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারী, অথচ নির্লিপ্ত বিভু। তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এই জগৎ-যন্ত্র তাঁহার শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। লীলাময় তাঁহার লীলা দেখিতেছেন ও আনন্দ করিতেছেন। যাহাকে তিনি বুঝাইতেছেন, সেই বুঝিতেছে। অন্যে বুঝিয়াও বুঝিতেছে না, আপনাকে

তাঁহা হইতে ভিন্ন ভাবিয়া মুগ্ধ হইতেছে। এই তাঁহার মায়া। তাঁহার শরণাগত হইয়া কর্ম করিলে এই মায়া অপগত হয়। কর্তা বোঝে যে, সে কর্তা নহে, যন্ত্রমাত্র। ইহার নাম, করিয়াও না করা। ইহাই অকর্তানুভূতি, ইহাই জীবন্মুক্তি। এই জীবন্মুক্তিসুখ ভোগ করিবার জন্যই আত্মার দেহধারণ। নতুবা নিত্যমুক্ত আত্মার সংসারকামনা করিয়া জন্মগ্রহণ কোনরূপেই সঙ্গত হয় না। এই দেহ থাকিতেও অদেহবোধ-লাভ করাই মনুষ্যজীবনের চরম উদ্দেশ্য। ইহা লাভ করিতে পারিলেই মানুষ কৃতার্থ হয়। প্রভুর নিকট ঐকান্তিক প্রার্থনা—এই জীবনেই যেন আমরা তাঁহার কৃপায় সেই জীবন্মুক্তিসুখ লাভ করিতে পারি। এই জীবনই যেন আমাদের শেষ জীবনধারণ হয়। অর্থাৎ আর যেন আপনার স্বার্থসাধন জন্য দেহ ধরিতে না হয়। তাঁহার জন্যই যেন আমাদের জীবন, অন্য কিছুর জন্য নহে—এই ধারণা, বিশ্বাস, অনুভূতি এই জীবনেই বদ্ধমূল হয়। প্রভু আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। জয় শ্রীগুরু মহারাজকী জয়।”

আমাদের একটি গুরুভ্রাতা পূর্বে সংঘে যোগ দিতে একবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য হয় নাই। দ্বিতীয়বার চেষ্টা করিয়া সে সফলকাম হয় এবং মাদ্রাজ মঠে যাইয়া সংঘে যোগদান করে। তখন তাহার সম্বন্ধে আমি মাদ্রাজ হইতে হরি মহারাজকে লিখিয়াছিলাম। তিনি কনখল হইতে ১৪।৫।১৩ তারিখে আমাকে লিখিয়াছিলেন, “তাহাকে আমাদের শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানাইবে। গীতায় (৬।৫) আছে—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥

তাঁহাকে মনে করাইয়া দিবে—

নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাতাচ তিষ্ঠতঃ।
ন পুত্রো দারং ন জ্ঞাতিঃ ধর্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ॥

ইহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে বলিবে। প্রভু তোমাদের সহায়। কোন চিন্তা নাই, সকল বিপদ কাটিয়া যাইবে। খুব দৃঢ়, খুব অনুরক্ত থাকিবে। কোন ভয় নাই।”

অনেকদিন হরি মহারাজকে চিঠি দিতে পারি নাই। তৎপরে একখানি পত্রে তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম, সাধুজীবনে এ পর্যন্ত বিশেষ কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। তাই নিরানন্দে দিন কাটিতেছে। তদুত্তরে তিনি আলমোড়া হইতে ২৭।৭।১৫ তারিখ আমাকে লিখিয়াছিলেন, “যদি ভগবানলাভ হইল না বলিয়া সত্যসত্যই নিরানন্দ বোধ করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার শুভদিনের সমুদয় হইয়াছে, সন্দেহ নাই। যত এইরূপ বোধ ঘনীভূত হইবে ততই প্রভুর কৃপা সন্নিকট জানিবে। আর যদি অন্য কোন বাসনা অভ্যন্তরে থাকিয়া এইরূপ নিরানন্দ ভাব সৃষ্টি করে, অবিলম্বে তাহাকে মন হইতে দূরে বহিষ্কৃত করিবার চেষ্টা করিবে। কোনমতে অবহেলা করিবে না। কারণ উহাই পরমার্থপথে প্রধান পরিপন্থী জানিবে। সর্বদা যোগ্যতা লাভ করিবার প্রযত্ন করিবে। তাহা হইলেই ভগবান প্রসন্ন হইয়া সকল সুখের অধিকারী করিয়া দিবেন। ‘গুরুকে ঘরমে গৌ জ্যায়সে পড়া রহনা,’ ইহাই স্বামীজী কোন প্রসিদ্ধ মহাপুরুষের[১] নিকট হইতে উপদেশ পাইয়া আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ উহা শুনাইয়াছিলেন। আর একটি পরম হিতোপদেশ দিয়াছিলেন তাহা এই—‘গুরুভাইকো গুরু জ্যায়সা জাননা।’ প্রভুর দ্বারে পড়িয়া থাকাই আসল কাজ। পড়িয়া থাকিতে পারিলে তাঁহার দয়া হইবেই হইবে। নিরানন্দ ঘুচিয়া মহানন্দ দেখা দিবে। আমাকে তিনি তাঁহার দ্বারে পড়িয়া থাকিতে দিলেই তাঁহার মহাকৃপা। যিনি উহা উপলব্ধি করিতে পারেন তিনি

১ গাজীপুরের পওহারী বাবা।

শীঘ্রই প্রভুর পূর্ণ কৃপা লাভ করেন, সন্দেহ নাই। সমস্ত প্রাণমন দিয়া তাঁহাকে ভালবাসিতে চেষ্টা করিবে। আপনার আনন্দ-নিরানন্দ-সন্ধান কেন? তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়া তিনি যেমন রাখেন তাহাই মঙ্গল—এই ভাব যাহাতে হৃদয়ে বদ্ধমূল ও সদা জাগরিত থাকে তাহার জন্য সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিবে। তাহা হইলেই সকল মঙ্গল হইবে।"

আমাদের কোন কোন সাধুভ্রাতা বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট সন্ন্যাস লইয়া মাদ্রাজ মঠে ফিরিয়া যান। হরি মহারাজ তখন আলমোড়ায় ছিলেন। সাধুদের সন্ন্যাসগ্রহণের সংবাদ তাঁহাকে পত্রে আমি জানাইয়াছিলাম। তদুত্তরে তিনি ২১।৪।১৬ তারিখে আমাকে লিখিয়াছিলেন, "তাহারা সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছে জানিয়া সুখী হইয়াছি। প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি, ঠিক ঠিক উহা পালন করিয়া মনুষ্যজীবন ধন্য করিবার শক্তি যেন তিনি দেন; নতুবা শুধু নামে সন্ন্যাস লইলে যথেষ্ট হয় না। সন্ন্যাস বড় কঠিন সমস্যা। ঠাকুর বলিতেন, 'যাহারা গাছের উপর হইতে হাত পা ছাড়িয়া পড়িতে পারে তাহারাই সন্ন্যাসের অধিকারী।' বড় সোজা কথা নয়। সম্পূর্ণ ভগবানে নির্ভর না হইলে আর ওরূপ করা সম্ভব হয় না।"

পূজনীয় হরি মহারাজ সর্বদা তাঁহার অপূর্ব আধ্যাত্মিক ভাব দ্বারা আমাদের সম্মুখে সাধুজীবনের উচ্চ আদর্শ উজ্জ্বল করিয়া ধরিয়া রাখিতেন এবং সেইরূপেই আমাদিগকে উপদেশ ও প্রেরণা দিতেন। একদিন আমরা অনেকে সারনাথদর্শনে গিয়াছিলাম। সেখানকার অশোকস্তম্ভ, স্তূপ এবং যাদুঘরে রক্ষিত প্রাচীন স্মৃতিদ্রব্যাদি (relics) দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া সোৎসাহে হরি মহারাজের নিকট সব বলিতে লাগিলাম। তিনি সব শুনিয়া শেষে বলিলেন, "তোমাদের বেশ একটা 'চকড়বা' হয়ে গেল।" এই বাক্যে তিনি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন—'ঘোরাঘুরি প্রভৃতি মানসিক অস্থিরতার ফলেই হয়। মন স্থির হইলে

একস্থানে বসিয়া ভাগবত আনন্দ লাভ করা যায়। নানাস্থানে ছুটাছুটি করিবার আর প্রয়োজন থাকে না।'

একদিন তিনি নিজের অবস্থা সম্বন্ধে বলিলেন, "গভীর ধ্যান করছি। এক পা এগুলেই ব্রহ্মে লীন হয়ে যাই। কিন্তু ঠাকুর আমাকে তা করতে না দিয়ে টেনে আনলেন। তিনি তাঁর লীলার জন্য নূতন recruitও (সেবকগ্রহণও) করেন।" কোন কোন সাধককে বিলীন হইতে না দিয়া ভগবান জগতের কল্যাণার্থ ভগবৎভাবে বিভোর বিশুদ্ধ ব্যক্তিত্ব রাখিয়া দেন। ইঁহারা সমাধির আনন্দ ত্যাগ করিয়া নানাভাবে জগতের কল্যাণসাধনে ব্যাপৃত হন। স্বামী তুরীয়ানন্দ সেইপ্রকার মহাপুরুষই ছিলেন বলিয়া আমার বিশ্বাস।

ঠাকুর হরি মহারাজ সম্বন্ধে বলিতেন, "সে গীতোক্ত যোগী।" শাস্ত্রে সিদ্ধপুরুষের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা হরি মহারাজের জীবনে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষের দিব্যজীবন এবং অনুভূতিপ্রসূত উপদেশ সাধককে আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হইতে প্রেরণা দেয়। তাঁহার অলৌকিক জীবন ও অমৃতবাণী পড়িয়া পাঠক-পাঠিকার পরমার্থকল্যাণ হউক—এই প্রার্থনা।

বেলুড় মঠ
শ্রাবণী পূর্ণিমা, ভাদ্র, ১৩৫৭

স্বামী যতীশ্বরানন্দ

প্রশস্তি

(১)

ফুল্লচিত্তায় ধীরায় গীতানির্মাল্যমালিনে।
তুরীয়াম্বুধিমগ্নায় তুরীয়ায় নমোঽস্তুতে॥

—শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী

(২)

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৫ খ্রীঃ একটি পত্রে আমেরিকা হইতে লিখিয়াছিলেন—

"যখনই হরি ভাইর অদ্ভুত ত্যাগ, কঠোর তপস্যা ও দৃঢ়নিষ্ঠার কথা ভাবি তখনই মনে নূতন বল পাই।"

(৩)

শ্রীসারদাদেবী স্বামী তুরীয়ানন্দের কোন সন্ন্যাসী সেবককে বলিয়াছিলেন—

"ঠাকুর এসেছিলেন, তাই এদের এনেছিলেন। এরা ত মানুষ নয়। হাজার বছর তপস্যা করলে যা না হয় এসব মহাপুরুষদের একদিন মন দিয়ে সেবা করলে তার চেয়ে বেশী ফললাভ হয়। প্রাণপণে এদের সেবা কর।"

(৪)

১৯৩০ খ্রীঃ ১৪ই জানুয়ারী মঙ্গলবার স্বামী তুরীয়ানন্দের শুভ জন্মতিথিতে স্বামী শিবানন্দ বেলুড় মঠে সাধু-ব্রহ্মচারীদিগকে বলিয়াছিলেন—

"আজ খুব শুভদিন। হরি মহারাজ মহাপুরুষলোক, শুদ্ধসত্ত্ব শুকদেবের মত পবিত্র ছিলেন। ছোটবেলা থেকে 'গীতা', 'বিবেকচূড়ামণি'

খুব পড়তেন। এসব বই তাঁর মুখস্থ ছিল। তিনি ধ্যানপরায়ণ, নির্জনতাপ্রিয় যোগী তপস্বী ছিলেন। স্বামীজী ওঁকে জোর করে আমেরিকায় নিয়ে গেলেন। উনি যেমন নিষ্ঠাবান, সহজে কি যেতে চান? তবে স্বামীজীকে খুব ভালবাসতেন কিনা, তাই ওঁর কথা ফেলতে পারলেন না। ওদেশে প্রায় তিন বৎসর আন্দাজ ছিলেন। ওঁর contactএ (সংস্পর্শে) এসে কয়েক জনের জীবন একেবারে বদলে গেল। ফিরে আসবার পথে বর্মাতে স্বামীজীর শরীরত্যাগের কথা শুনে মর্মাহত হয়ে বসে পড়লেন। ইচ্ছা ছিল, স্বামীজীর কাছে অনেক মনের কথা বলবেন।...

"সংঘের উপর তাঁর কি অগাধ ভালবাসা!.. সংঘ সম্বন্ধে স্বামীজীর উপদেশ হরি মহারাজের বড়ই প্রিয় ছিল। শেষ জীবনে অসুস্থ অবস্থাতেও কাশীতে বহু লোকের কত উপকার করে গেলেন। তাঁর জীবনে এতটুকুও দোষ নেই, সবই গুণ, পূত পবিত্র জীবন। যোগ, জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম সমস্তই তাঁর জীবনে প্রতিফলিত হয়েছিল। তোমাদের সকলের কর্তব্য তাঁর জীবনের গুণ অনুশীলন করা। অনুশীলন করলে উন্নত হতে পারবে। মহারাজ তাঁকে কি ভালবাসতেন! পাঁচ বৎসর একত্রে পাঞ্জাব, সিন্ধু, করাচী, রাজপুতানা প্রভৃতি জায়গায় কাটিয়েছেন। দুজনের ভারী ভাব ছিল। কখনো কখনো একত্রে আছেন, অথচ কথাটি নেই। হয়ত একচোটে সাতদিনই কেটে গেল, হরি মহারাজ গুম হয়ে আছেন। মহারাজ বলতেন, 'হরি মহারাজের মেজাজ কখনো কখনো বুঝা যেত না।'

"হরি মহারাজের সমগ্র চণ্ডী মুখস্থ ছিল, এক ঘণ্টা লাগত। তাঁর সঙ্গে বই সর্বদা থাকত—এই যেমন গীতা, চণ্ডী, বিবেক-চূড়ামণি, উপনিষদ্, বেদান্তদর্শন এইসব। তিনি খুব পড়তেন, তাঁদের পড়াই ধ্যান। গীতা, উপনিষদের শ্লোক নিয়ে ধ্যান করতেন।"

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

বাল্যকথা

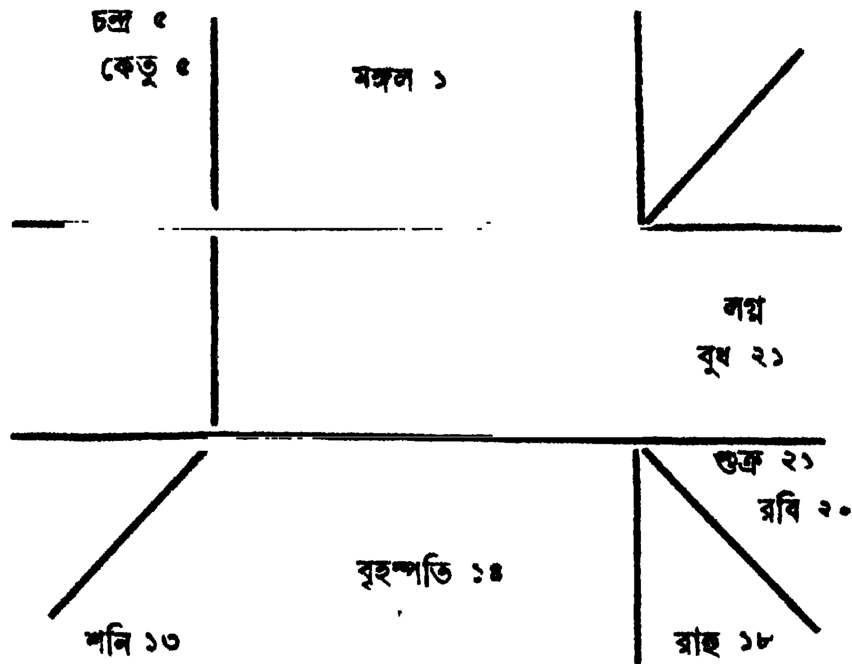
বিগত শতাব্দীর প্রথমার্ধে কলিকাতায় বাগবাজার বসুপাড়া পল্লীতে এক ঘর ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। দেবভক্তি, সত্যানুরাগ ও ধর্মনিষ্ঠা ব্যতীত উল্লেখযোগ্য সম্পদ তাঁহাদের আর কিছুই ছিল না। গৃহকর্তা চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তেজস্বী, স্পষ্টবাদী ও পল্লীর শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তিনি ডবলিউ ওয়াট্‌সন কোম্পানীর গুদাম-সরকারের কাজ করিতেন। চন্দ্রনাথের একটি অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল, নাড়ী দেখিয়া মৃত্যুর কাল বলিয়া দিতে পারিতেন। তখনকার দিনে আসন্ন-মৃত্যু বৃদ্ধবৃদ্ধাগণের গঙ্গাযাত্রা করিবার সাধারণ প্রথা ছিল। ত্রিরাত্র ত্রিতাপনাশিনীর তীরে বাসপূর্বক অর্ধাঙ্গ গঙ্গাসলিলে নিমজ্জিত করিয়া আত্মজগণ ও আত্মীয়স্বজনগণের মুখে 'গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম' নাম শুনিতে শুনিতে অন্তিম-শ্বাসত্যাগ করা মহাসৌভাগ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। ত্রিরাত্রযাপন না হউক, মৃত্যুর কিছু পূর্বে অথবা সমসময়ে মুমূর্ষুকে গঙ্গাতীরস্থ করিবার জন্য গৃহস্থগণ ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। এরূপ অবস্থায় কবিরাজ অপেক্ষা মৃত্যুনাড়ী-জ্ঞানাভিজ্ঞ চন্দ্রনাথের অভ্রান্ত বিধানকে গৃহস্থগণ কত মূল্যবান মনে করিতেন তাহা সহজে অনুমেয়। পাড়ার প্রাচীনাগণ চন্দ্রনাথকে কেহ পুত্র, কেহ ভাই, কেহ দেবর সম্বোধনে সনির্বন্ধ মিনতি করিয়া বলিয়া রাখিতেন, "শেষ সময় ভুলো না, হাড় ক'খানা যাতে গঙ্গায় যায় তার ব্যবস্থা করো।" কথিত আছে, চন্দ্রনাথ নিজের নাড়ী পরীক্ষা করিয়া তাঁহার সুহৃদ তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনকে বলিয়াছিলেন, "আমি আর এক বৎসর পরে মরবো।"

স্বামী তুরীয়ানন্দ

চন্দ্রনাথের তিনটি পুত্র ও তিনটি কন্যা হইয়াছিল। পুত্রত্রয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ মহেন্দ্রনাথ, মধ্যম উপেন্দ্রনাথ ও কনিষ্ঠ হরিনাথ। কন্যাদের ভিতর জ্যেষ্ঠা ব্যতীত অন্য দুইজন অকালে মারা যান। হরিনাথই উত্তরকালে রামকৃষ্ণ সংঘে স্বামী তুরীয়ানন্দ নামে প্রসিদ্ধ। জ্যেষ্ঠা সহোদরার মতে হরিনাথের জন্মকাল সন ১২৬৯ সাল, ২০শে পৌষ, শনিবার, শুক্লা চতুর্দশী তিথি, মৃগশিরা নক্ষত্র; ইংরেজী ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ, ৩রা জানুয়ারী, বেলা ৯টা। ঠিকুজী[১] হইতে জানা যায়, লগ্নস্থানে বুধ এবং ধর্মস্থানে শনি থাকায় তিনি বিদ্বান, তপঃপরায়ণ, স্বধর্মনিষ্ঠ ও সন্ন্যাসী হইবেন।

---

১ হরি মহারাজের ঠিকুজীখানি এইরূপ :—



"বিদ্যা-বিত্ত-তপঃ-স্বধর্মনিরতো লগ্নস্থিতে বোধনে।"

"শনিধর্মগঃ শর্মকৃৎ সন্ন্যাসং বা।"

অর্থাৎ বুধ লগ্নস্থ হওয়ায় বিদ্যা, বিত্ত, তপঃ ও ধর্মে নিষ্ঠাবান হইবে। শনি ধর্মস্থানে থাকায় মোক্ষদায়ক সন্ন্যাস অবশ্যম্ভাবী।

হরিলুটের সন্তান বলিয়া চন্দ্রনাথ পুত্রের নাম রাখিলেন হরিনাথ। পাড়ায় বালকের প্রচলিত নাম ছিল লালা হরি। জননী প্রসন্নময়ী দেবীর নিঃশঙ্ক ক্রোড়ে সুস্থ সবল শিশু প্রতিপদের শশাঙ্কবৎ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। কিন্তু এই দুর্লভ মাতৃস্নেহ কনিষ্ঠ শিশুর ভাগ্যে বেশী দিন সহ্য হইল না।

কলিকাতার উত্তরাংশ তখন পল্লীগ্রামের মত অপেক্ষাকৃত জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। রাত্রির ত কথাই নাই, দিবসেও শৃগালের কোলাহল শুনা যাইত। একদিন হঠাৎ একটা ক্ষিপ্ত শৃগাল আসিয়া শিশু হরিনাথকে আক্রমণ করিল। সন্তানগতপ্রাণা জননী ছুটিয়া আসিয়া ভীত বালককে ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিলেন। শৃগাল আক্রান্ত শিশুকে না পাইয়া মাতাকে দংশন করিল। তখনকার প্রচলিত চিকিৎসায় কোন ফল হইল না। প্রাণাধিক পুত্রের জীবনরক্ষার্থ জননী আত্মবলি দিলেন।

জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়ার উপর মাতৃহীন শিশুর লালনপালনের ভার পড়িল। বড়বধূ দেবরটিকে সস্নেহে মানুষ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মাতার অভাব শিশুরও বুঝিতে বিলম্ব হয় না। সহিষ্ণুতার প্রতিমা মাতার অভাব দুরন্ত বালককে শান্ত সংযত করিল। কিন্তু বালকের নিরুদ্ধ তেজ সময়ে সময়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বসিত। হরিনাথের ভ্রাতৃদ্বয় এবং আত্মীয়গণ বলেন, "হরি বাল্যকালে খুব শান্ত ও বাধ্য ছিল। আহারে তাহার কোন বাচ-বিচার ছিল না—যা পেত তাই খেত, কিন্তু রাগলে বেজায় মারধর করত।" হরি মহারাজ পরবর্তী জীবনে স্বীয় বাল্যকথাপ্রসঙ্গে সন্ন্যাসী সেবককে বলিয়াছিলেন, "ছেলেবেলাতেই মার শরীরত্যাগ হয়ে গিয়েছিল। সেইজন্য বড় বৌদির কাছেই মানুষ হয়েছিলুম। তখন মাত্র তিন বৎসর বয়স। সর্বদাই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকতুম। তাঁর কাছ ছেড়ে কোথাও যেতে চাইতুম না। ভয়ানক

নেওটো ছিলুম। বড় বৌদিও আমায় খুব স্নেহ যত্ন করতেন, মার মত মানুষ করেছিলেন। সাধু হয়ে গেলেও তাঁর জন্য চিন্তা ছিল। তাঁর শরীর না যাওয়া পর্যন্ত চিন্তিত ছিলুম। তাঁর দেহত্যাগের পর নিশ্চিন্ত হলুম।”

হরিনাথ অপেক্ষা মহেন্দ্রনাথ বিশ ও উপেন্দ্রনাথ দশ বৎসরের বড় ছিলেন। উপেন্দ্রনাথ মেডিকেল কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডাক্তারী করিয়া সংসার চালাইতেন। দুই দাদাই কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিনাথকে খুব ভালবাসিতেন। কিছু বড় হইয়া হরিনাথ শাস্ত্রপাঠ ও ধর্মচর্চাদি করিতেন বলিয়া উভয়ে তাঁহাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন। পাড়ার প্রাচীনরা অনেক সময় তাঁহার বিরুদ্ধে দাদাদের কাছে বলিতেন, “ছেলেটা কি করছে তা তোমরা দেখ না। এ রকম করে কাল কাটান তার ভাল নয়।” প্রতিবেশীদের কাছে ছোট ভাইয়ের এইরূপ নিন্দা শুনিয়া তাঁহারা উত্তর দিতেন, “কেন, ব্রাহ্মণের যা কর্তব্য, এতো তাই করছে।” দাদারা এইভাবে প্রতিবেশীদের বুঝাইয়া দিতেন এবং বরাবর হরিনাথের পক্ষই লইতেন।

কম্বুলিয়াটোলা বাংলা স্কুলে পড়িতে পড়িতে হরি ক্রমে দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করিলে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। কিন্তু মাতার মৃত্যুর ন্যায় ইহা আকস্মিক ঘটে নাই। এক বৎসর পূর্বে চন্দ্রনাথ স্বীয় মৃত্যুর সময় নির্ণয় করিয়াছিলেন। দিনে দিনে অন্তিম সময় সন্নিকট হইল। চন্দ্রনাথ নিজের নাড়ী পরীক্ষা করিয়া পাল্কী আনাইবার আদেশ দিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, পুত্রগণ ও আত্মীয়বন্ধুগণ তাহা বহিবে। গঙ্গাযাত্রী বৃদ্ধের গৃহ হইতে গঙ্গাভিমুখে যাত্রাকালে হরিনাথ অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রোরুদ্যমান পুত্রের প্রতি পিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া জ্যেষ্ঠা কন্যা বলিলেন, “হরি কাঁদছে, ওকে একটু

সান্ত্বনা দিন।" পরলোকযাত্রী বৃদ্ধ উত্তর দিলেন, "হরিকে আর কি বলব! হরি জগতের, জগৎ হরির।" মুমূর্ষুর নিস্তেজ নয়নে তখন মহানিদ্রার ঘোর আসিতেছিল। কিন্তু মুহূর্তের জন্য যেন বৃদ্ধের অন্তশ্চক্ষুতে পুত্রের ভবিষ্যৎ জীবনচিত্র প্রকটিত হইল। চন্দ্রনাথের বয়স তখন প্রায় সত্তর বৎসর।[১]

ছেলেবেলায় হরিনাথ প্রবীণদের কথা সাধ্যানুসারে মানিতেন। একটু বড় হইয়া তিনি পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে খুব মিশিতেন এবং তাহাদের দলের সর্দার হইয়া উঠিয়াছিলেন। রোজ আখড়ায় যাইয়া কুস্তি করিতেন এবং ডন ও বৈঠক দিতেন। তিনি একসঙ্গে একশত ডন এবং পাঁচশত বৈঠক দিতে পারিতেন। নিয়মিত শরীর চচার ফলে তাঁহার শরীর সবল ও সুপুষ্ট হইয়াছিল। ছেলেবেলা হইতে তাঁহার মনের গঠন এরূপ ছিল যে যাহা ধরিতেন তাহা চরম করিয়া ছাড়িতেন। অল্পস্বল্প করা তাঁহার ধাতে ছিল না, সব বেশী বেশী করা চাই। অন্য সব বিষয় যেমন ব্যায়ামও তেমনি বেশী করিয়া করিতেন। সঙ্গীরা বলিত, "অত বেশী করিস্ নি। বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছিস্। শেষে মরে যাবি।" ইহা শুনিয়া হরিনাথ বিদ্রূপ করিয়া উত্তর দিতেন, "যা যা, তোরাই বেঁচে থাকবি, আর আমি একা মরে যাব।" ধর্ম-সাধনায়ও তাঁহার অনুরূপ অনুরাগ ছিল। বাল্য হইতেই তাঁহার জীবনে ধর্মভাবের বীজ অঙ্কুরিত হয়। উপনয়নের পরে বালব্রহ্মচারী হরিনাথ গায়ত্রীজপ ও সন্ধ্যা-বন্দনায় দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত মগ্ন হইতেন। তিনি প্রত্যহ তিনবার গঙ্গাস্নান, স্বপাক হবিষ্যান্ন ভোজন এবং কঠোর

---

১ পিতার মৃত্যুকালে হরিনাথের বয়স সম্বন্ধে মতভেদ আছে। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন, আমরা এখানে তাহারই অনুসরণ করিলাম।

ব্রহ্মচর্য পালন করিতেন। বাল্যকাল হইতে কঠোরতাই তাঁহার ভাল লাগিত। রাত্রে একখানি কম্বলের উপর নিদ্রা যাইতেন এবং ভোর চারটার সময় উঠিয়া বাগবাজারে বিচালির ঘাটে গঙ্গাস্নান করিতেন। কোন কোন দিন জ্যোৎস্নায় বা অন্ধকারে রাত্রি বুঝিতে না পারিয়া রাত দুইটা-তিনটার সময় উঠিয়া গঙ্গাস্নানে যাইতেন। ঘড়ি না থাকায় আন্দাজেই সময় ঠিক করিতে হইত।

হরিনাথ পরে খ্রীষ্টান শিক্ষালয় জেনারেল এসেম্‌ব্লিতে অধ্যয়ন করিতেন। বাইবেলপাঠ এই বিদ্যালয়ের অন্যতম নিয়ম ছিল। কিন্তু বাইবেল ক্লাশ প্রায়ই ছাত্রশূন্য থাকিত। এমন অনেক দিন হইয়াছে, স্বহস্তে নিত্য-অনুষ্ঠিত নারায়ণসেবা সমাপনান্তে বিদ্যালয়ে গিয়া হরিনাথ ছাত্রশূন্য বাইবেল ক্লাশে একাকী পরম শ্রদ্ধাসহকারে বাইবেল অধ্যয়ন করিয়াছেন। এই ধর্মনিষ্ঠ ছাত্রের উপর অধ্যাপকগণ অতিশয় প্রসন্ন ছিলেন। কিন্তু হরিনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বার অবধি অগ্রসর হইয়া হঠাৎ পিছাইয়া আসিলেন। লোকে প্রশ্ন করিত, "এণ্ট্রান্সটি দিলে না কেন হে?" হরিনাথ মৃদু হাসিয়া উত্তর দিতেন, "কি হবে পাশের সম্মান নিয়ে?" তিনি বাল্যকাল হইতেই সম্মান বা সুখের প্রার্থী বা প্রয়াসী ছিলেন না। প্রতিবাসী নটকবি গিরিশচন্দ্রকে তিনি বলিয়াছিলেন, "সুখ নিয়ে কি হবে, গিরিশ দাদা?" অর্থকরী ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিতে অনুরুদ্ধ হইলে তিনি উত্তর দিতেন, "কি হবে ইংরেজী পড়ে?"

বয়সের সঙ্গে একদিকে সংস্কৃত শিক্ষার অনুরাগ যেমন বাড়িতে লাগিল, অন্যদিকে ধর্মাচারও তেমনি কঠোর হইতে কঠোরতর হইয়া উঠিল। জপ, তপ ও শাস্ত্রচর্চায় দিবসের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। দীর্ঘকেশ ধারণ, কঠিন শয্যায় শয়ন এবং

স্বপাক হবিষ্যান্নগ্রহণ—তাহাও আবার পঞ্চগ্রাসমাত্র। কৌতূহল প্রশ্ন করে, "মাত্র পাঁচটি গ্রাস খাও কেন?" নিষ্ঠা উত্তর দেয়, "পাঁচটি গ্রাস পঞ্চভূতের জন্য।" এই সময়ে হরিনাথের প্রিয়তম সুহৃদ এবং অনুক্ষণ সঙ্গী ছিলেন গঙ্গাধর, যিনি পরে রামকৃষ্ণ সংঘে "স্বামী অখণ্ডানন্দ" নামে সুপরিচিত। দুই বন্ধুতে মিলিয়া সারাদিন শাস্ত্রচর্চা, আলোচনা ও বিচার করিতেন। হরিনাথ একদা গঙ্গাধরকে এই শ্লোক দুটি বলিয়াছিলেন—

> হরীতকীং ভুঙ্ক্ষ্ব রাজন্ মাতেব হিতকারিণী।
> কদাচিৎ কুপিতা মাতা নোদরস্থা হরীতকী॥
> হরিং হরীতকীং চৈব গায়ত্রীং জাহ্নবীজলং।
> অন্তর্মলবিনাশায় স্মরেৎ ভক্ষেৎ জপেৎ পিবেৎ॥

—হে রাজন্, মাতার মত উপকারিণী হরীতকী খাও। মাতাও কখন কখন কুপিতা হন, কিন্তু উদরস্থা হরীতকী কদাপি অনিষ্টকারিণী হয় না। মনের ময়লা দূর করিবার জন্য হরিস্মরণ, হরীতকী ভক্ষণ, গায়ত্রী জপ ও গঙ্গাজল পান কর্ত্তব্য।"

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীত হয়, তখন হরিনাথের মনোভাব কিরূপ ছিল। গৃহাগত প্রতিবাসী ও প্রতিবাসিনীগণ সত্যব্রত, ব্রহ্মচর্যপরায়ণ, তরুণ হরিনাথের ধর্মনিষ্ঠা, শাস্ত্রানুরাগ ও আনন্দোজ্জ্বল মুখচ্ছবি দর্শনে শ্রদ্ধাপূর্ণ নয়নে চাহিয়া থাকিতেন। যখন হরিনাথের বয়স ৮।১০ বৎসর তখন বাল্যবন্ধু গঙ্গাধরকে বলিয়াছিলেন, "বিয়ে করবো না।" ভবিষ্যৎ জীবনের পূর্বাভাস বাল্যেই প্রতিভাত হইয়াছিল।

একদিন অতি প্রত্যুষে গঙ্গাস্নানে গিয়াছেন। স্নানার্থ একগলা জলে নামিয়া পড়িলেন। ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকে দেখিলেন, একটি খড়ের তাল ভাসিয়া আসিতেছে। ভাবিলেন, বোধহয় নৌকা হইতে

বিচালি পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছে। সেটা যখন কাছে আসিল তখন তিনি দেখিলেন, সেটা একটা কুমীর, খড়ের তাল নয়। তখন একটা চীৎকার উঠিল—কুমীর, কুমীর। কুমীরটা আস্তে আস্তে তাঁহার দিকে ভাসিয়া আসিতেছিল। তৎক্ষণাৎ তিনি জল হইতে উঠিয়া পড়িবার চেষ্টা করিলেন। একগলা জল হইতে এক হাঁটু জলে যখন আসিলেন, তখন তাঁহার বেদান্তবোধ জাগিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, এই বুঝি আমার বেদান্ত পড়া এবং 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' বলা। তিনি পুনরায় একগলা জলে নামিয়া স্থিরভাবে বিচার করিতে লাগিলেন, "আমি তো শুদ্ধবুদ্ধ আত্মা। আমার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই। আমি দেহ, মন বা বুদ্ধি নই। তবে আমি মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করিব কেন?" তিনি বিচারপরায়ণ এবং আত্মভাবস্থ হইয়া নির্ভয়ে গঙ্গাজলে রহিলেন। তীরস্থ ব্যক্তিরা হরিনাথকে মৃত্যুর সম্মুখীন দেখিয়া তাঁহাকে তীরে উঠিবার জন্য বারংবার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। তীব্র চীৎকারে কুমীরটা অন্যদিকে চলিয়া গেল। হরিনাথ ধীরে গঙ্গাতীরে উঠিয়া আসিলেন।

শরৎচন্দ্র ঘোষ নামক এক প্রতিবাসী যুবক এই সময়ে হরিনাথের একান্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের জন্মভূমি রাজারহাট বিষ্ণুপুর গ্রাম শরতের জন্মস্থান এবং স্বামী নিরঞ্জনানন্দ তাঁহার নিকট জ্ঞাতি। শরৎ বলেন, "কবিবর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের[১] 'মহিলাকাব্য' এবং ভক্তশ্রেষ্ঠ তুলসীদাসের দোঁহাবলী হরিনাথের কণ্ঠস্থ ছিল। সন্ধ্যাসমাগমে মলয়ানিলে গঙ্গাতীরে বসিয়া হরিনাথ কখন তুলসীদাসের দোঁহাবলী, কখন বা মহিলাকাব্য হইতে বিশেষতঃ মাতার অংশ স্তবকের পর স্তবক

১ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

সাশ্রুনয়নে অনর্গল আবৃত্তি করিয়া যাইতেন।" দূরে ওপারে তরুশীর্ষে লাল মেঘের কোলে রক্তরবি, আর এপারে তরুণ হরিনাথের ব্রহ্মতেজোমণ্ডিত দিব্যভাবোদ্ভাসিত মুখচ্ছবি! সংসারের কঠোর সংঘর্ষে সেই তরুণ বয়সের কত মধুময় স্মৃতি চিরদিনের জন্য মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে, কিন্তু গঙ্গাতীরের সেই স্বর্গীয় চিত্র শরৎচন্দ্রের মানসপটে মৃত্যুকাল পর্যন্ত উজ্জ্বল প্রভায় ঝলমল করিত।

গঙ্গাতীরের একটি বিপরীত চিত্র হরিনাথের জীবনে দেখা যায়। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, হরিনাথের প্রকৃতি স্বভাবতঃ শান্ত হইলেও ক্রোধের উদয়ে উহা অতিশয় উগ্র হইয়া উঠিত। প্রিয়নাথ নামে তাঁহার এক খুল্লতাত ভ্রাতা ছিলেন। হরিনাথ তাঁহাকে 'সেজদা' বলিয়া ডাকিতেন। একদিন গঙ্গাতীর হইতে প্রিয়নাথ বিষণ্ণবদনে বাড়ী ফিরিতেছিলেন। হরিনাথ তাঁহার ম্রিয়মাণ মুখমণ্ডল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে সেজদা?" উত্তরে প্রিয়নাথ বলিলেন, "পোর্টকমিশনারদিগের গঙ্গাতীরবর্তী রেলপথসংক্রান্ত একজন লোক আমার প্রতি নানা অপভাষা প্রয়োগ করিয়াছে।" হরিনাথ সবিস্ময়ে সেজদার মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "অপমান নিয়ে তুমি বাড়ী ঢুক্‌ছ কি করে? চল, এখনই তাকে শিক্ষা দিতে হবে।" ভ্রাতাকে লইয়া হরিনাথ গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। সেজদা অবমাননাকারীর দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিলে হরিনাথ সিংহনাদে গর্জন করিলেন, "আমার সামনে তুমি একে বেশ করে জুতিয়ে দাও। দেখি, কি করে।" প্রিয়নাথ আর দ্বিতীয় অনুরোধের অপেক্ষা করিলেন না। হরিনাথের জবাকুসুমবৎ রক্তচক্ষুর দিকে তাকাইয়া লোকটি নিরুপায়-ভাবে প্রিয়নাথের পাদুকার প্রহার সহ্য করিয়া স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল। হরিনাথ আজীবন অন্যায়ের অপ্রতিকারকে পাপ বলিয়া

গণ্য করিতেন। পরবর্তী জীবনে তিনি বলিতেন, "অন্যায়, অবিচার দেখলে তার প্রতিবাদ করা উচিত; নতুবা তাহাতে একরকম সায় দেওয়াই হয়। সাধুর স্বাধীনচেতা হওয়া দরকার। সে আবার কার বা কিসের ভয় করবে? সত্যের ও ন্যায়ের প্রতি তাহার ঐকান্তিক নিষ্ঠা চাই।"

সত্যসন্ধ নিষ্পাপ হৃদয়ে মৃত্যু গভীর রেখাপাত করে এবং বিবেক বৈরাগ্যের প্রেরণা দেয়। কিশোর হরিনাথ তাঁহার পিতার দেহত্যাগ স্বচক্ষে দেখিয়া সংসারের নশ্বরতা স্বতঃই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আর একটি প্রিয়জনের বিচ্ছেদ তাঁহাকে কয়েক বৎসর পরে প্রত্যক্ষ করিতে হইয়াছিল। কেদারনাথ নামে পূর্বোক্ত প্রিয়নাথের আর একটি ভাই ছিলেন। তিনি হরিনাথের প্রায় সমবয়সী। বিসূচিকা রোগে হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। হরিনাথ স্থিরদৃষ্টিতে কিয়ৎকাল প্রিয় ভ্রাতার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার অন্তঃস্থল হইতে উদ্বেলিত সিন্ধুর সুগভীর মর্মোচ্ছ্বাসের ন্যায় একমাত্র বাক্য উচ্চারিত হইল, "এই জীবন!" পার্থিব জীবন ঘোর অন্ধকারে জোনাকীর আলোর ন্যায় এই জ্বলিতেছে, এই নিভিতেছে। পদ্ম-পত্রস্থিত বারিবিন্দুর ন্যায় চঞ্চল জীবন লইয়া মানুষ ইহলোকে স্থায়িত্ব কামনা করে! বায়ুপুষ্ট বুদ্বুদের মত ক্ষণস্থায়ী জীবন লইয়া মানব ভোগোন্মত্ত হয়। কবি সত্যই গাহিয়াছেন—

জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা রবে?
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে! জীবননদে?

দেহধারী মাত্রই মৃত্যুভয়ে কম্পিত। একমাত্র বৈরাগ্যেই অভয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভর্তৃহরি সত্যই বলিয়াছেন, "ভোগে রোগভয়, কুলে চ্যুতিভয়, বিত্তে রাজভয়, মানে দৈন্যভয়, বলে রিপুভয়, রূপে জরাভয়,

শাস্ত্রে বাদিভয়, গুণে খলভয় এবং দেহে মৃত্যুভয় আছে। পৃথিবীতে সর্ববস্তুই ভয়ান্বিত। বৈরাগ্যই মানবের একমাত্র অভয়স্থল।" হরিনাথ বৈরাগ্যে আশ্রয় লইলেন।

উক্ত ঘটনার কিছুদিনের মধ্যে চিৎপুরে সর্বমঙ্গলার মন্দিরে এক সাধু মহাত্মার শুভাগমন হয়। হরিনাথ এবং গঙ্গাধর প্রায় নিত্যই তাঁহার সন্দর্শনে যাইতেন। কথিত আছে, এই ত্যাগী বাক্‌সিদ্ধ সাধু যাহাকে যাহা বলিতেন, তাহাই ফলিত। এইজন্য তাঁহার কাছে লোকের খুব ভিড় হইত। কেহ দুরারোগ্য ব্যাধির কবল হইতে নিষ্কৃতি, কেহ পুত্র, কেহ অর্থ কামনা করিত। বৈরাগ্যবান্ তরুণযুগল সাধুর কাছে বসিয়া বসিয়া নির্বোধ নরনারীর এইসব প্রার্থনা শুনিতেন আর মৃদুহাস্য করিতেন। একদিন সাধু হরিনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেটা, তুমি আস যাও, কিছু ত বল না। কি চাও?" হরিনাথ বলিলেন, "সাধনভজন আর ভগবানলাভ চাই।" উত্তর শুনিয়া সাধু উল্লাসে অধীর হইয়া বলিলেন, "বেশ, বেশ। কিন্তু এখন ঘরে থেকে সাধনা কর। সময় হয় নাই, একটু দেরী আছে।" হরিনাথ সাধুবাক্য শিরোধার্য করিয়া লইলেন। ইতোমধ্যে বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। কিন্তু যাঁহারা পাত্র দেখিতে আসিতেন, হরিনাথের মুখে সজীব বৈরাগ্যের ভাষা শুনিয়া তাঁহারা আর সে-মুখ হইতেন না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণের পূত সঙ্গে

শাস্ত্র সত্যই বলেন, সাধনের আগ্রহ আন্তরিক হইলেই অপ্রার্থিত-ভাবে গুরুলাভ হয়। হরিনাথের গুরুলাভ হইল অপ্রত্যাশিতভাবে ও অজ্ঞাতসারে। গঙ্গার পূতধারা সাগরসঙ্গমে মিলিত হইল। শ্রীরাম-কৃষ্ণকে প্রথম দর্শনের কথা স্বামী তুরীয়ানন্দ ঢাকার কোন ভক্তকে পুরীধাম হইতে ১৯১৭ খ্রীঃ ১৯শে সেপ্টেম্বর নিম্নোক্ত পত্রে [১] এইরূপে সংক্ষেপে লিখিয়াছিলেন—

"আমি বাগবাজারে শ্রীযুক্ত দীননাথ বসুর বাটীতে প্রথম ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলাম। সে বহুদিনের কথা। তখন অধিকাংশ সময় তিনি সমাধিস্থ থাকিতেন, সবে কেশব বাবুর সহিত ঠাকুরের পরিচয় হইয়াছে। দীননাথ বসুর ভ্রাতা কালীনাথ বসু কেশব বাবুর অনুচর ছিলেন। তিনি ঠাকুরকে দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং আপনার জ্যেষ্ঠকে অনুরোধ করিয়া ঠাকুরকে তাঁহার গৃহে আবাহন করেন। আমরা তখন বালক, তের-চৌদ্দ বৎসরের হইব। পরমহংস আসিবেন—এই কথা পল্লীতে রাষ্ট্র হইলে দর্শনার্থ আমরা তথায় সমবেত হইয়াছিলাম। দেখিলাম, একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ীতে করিয়া দুইজন পুরুষ দ্বারে উপস্থিত হইলে সকলেই 'পরমহংস আসিয়াছেন', 'পরমহংস আসিয়াছেন' বলিয়া সেইদিকে আকৃষ্ট হইল। প্রথমে একজন অবতরণ করিলেন, বেশ হৃষ্টপুষ্ট বপু, কপালে সিন্দুরের ফোঁটা, দক্ষিণ হস্তের বাহুতে স্বর্ণ কবচ এবং দেখিলেই খুব বলশালী ও কর্মঠ বলিয়া মনে হয়।

১ উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত 'স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্রাবলী'তে আছে।

তিনি[১] নামিয়া একজনকে গাড়ী হইতে নামাইতে লাগিলেন। ইনি দেখিতে অত্যন্ত কৃশ। গায়ে একটি পিরাণ, পরিহিত বস্ত্র কোমরে বাঁধা। এক পা গাড়ীর পাদানে ও অন্য পা গাড়ীর মধ্যে রহিয়াছে। একেবারে সংজ্ঞাহীন। বোধ হইতেছে যেন মহামাতালকে ধরিয়া নামাইতেছে! যখন নামিলেন দেখিলাম, কি এক অপূর্ব জ্যোতিঃ মুখমণ্ডলে বিরাজ করিতেছে। মনে হইল, শাস্ত্রে যে শুকদেবের কথা শুনিয়াছি উনি কি সেই শুকদেব? ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে উপরে লইয়া যাইলে কিঞ্চিৎ সংজ্ঞা পাইয়া দেওয়ালে বৃহৎ কালীমূর্তি দেখিতে পাইয়া প্রণাম করিলেন এবং একটি মনোমুগ্ধকর সংগীতে উপস্থিত সকলের মনে এক অপূর্ব ভক্তিভাব ও সমন্বয়ের স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিলেন। গানটি কালী ও কৃষ্ণের একত্বসূচক। যথা—

যশোদা নাচাত তোরে বলে নীলমণি।
সে রূপ লুকালে কোথা করালবদনী শ্যামা॥
(একবার নাচ গো শ্যামা) (অসি ফেলে বাঁশী লয়ে)
(মুণ্ডমালা ফেলে বনমালা লয়ে) (শিব বলরাম হোক)
(তেমনি তেমনি তেমনি করে নাচ গো শ্যামা)
(একবার বাজা গো মা, তোর মোহন বেণু)
(যে বেণুর রবে গোপীর মন ভুলিত)
(যে বেণুরবে ধেনু ফিরাতিস্) (যে বেণুরবে যমুনা উজান বয়)॥
গগনে বেলা বাড়িত, রাণীর মন ব্যাকুল হতো,
বলে, 'ধর, ধর, ধর, ধররে গোপাল, ক্ষীর সর ননী'।
এলায়ে চাঁচর কেশ, রাণী বেঁধে দিত বেণী॥
শ্রীদামের সঙ্গে, নাচিতে ত্রিভঙ্গে, (গো মা),

১ ইনি ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়।

(আবার) তাথৈয়া তাথৈয়া তাতা থৈয়া থৈয়া, বাজিত নূপুর-ধ্বনি।
শুনতে পেয়ে আস্‌ত ধেয়ে, যত ব্রজের রমণী (গো মা)॥

"এই গানের দ্বারা লোকের মনে কি যে এক অপূর্ব ভাবের উদয় হইল, তাহা বর্ণনাতীত। তারপর অনেক পরমার্থপ্রসঙ্গ হইয়াছিল। তিনি আরও একবার দীননাথের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। পরে আবার দুই-তিন বৎসর অন্তে আমি তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার ঘরে দর্শন করিয়াছিলাম।" শ্রীরামকৃষ্ণের সেই ভাবভোলা মূর্তি, ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা ভাব, জগন্মাতার নাম করিতে করিতে মুহুর্মুহুঃ সমাধি হরিনাথের চক্ষে এক অভিনব ভাবরাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত করিল। পূর্বোক্ত শরৎচন্দ্র বলেন, "এই সময়ে গঙ্গাতীরে সান্ধ্যবাসরে হরিনাথ প্রায়ই গাহিতেন—

আমায় দে মা পাগল করে।
আর কাজ নেই জ্ঞানবিচারে॥"

হরিনাথের আকুল কণ্ঠস্বর, ভক্তিপ্লুতভাব শরৎচন্দ্রের কর্ণে মধু বর্ষণ করিত।

হরিনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দর্শনলাভ করেন সম্ভবতঃ ১৮৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে। ইহার দুই-তিন বৎসর পরে অনুমান ১৮৭৮-৭৯ খ্রীঃ দ্বিতীয় দর্শন হয় দক্ষিণেশ্বরে। শীঘ্রই তিনি ঠাকুরের প্রতি অনুরক্ত হন এবং ঘন ঘন তাঁহার কাছে যাইতে আরম্ভ করেন। ছুটির দিনগুলিতে ঠাকুরের নিকট অধিক লোকসমাগম হইত। সেইজন্য ঠাকুর তাঁহাকে ছুটির দিন ব্যতীত অন্যান্য দিনে আসিতে বলেন। এইরূপে হরিনাথ ঠাকুরের সহিত স্বাধীন ও ঘনিষ্ঠভাবে কথাবার্তা বলিবার ও মিশিবার সুবর্ণ সুযোগ পাইলেন। অদ্বৈত বেদান্তের গ্রন্থ 'রামগীতা' যুবক হরিনাথের প্রিয় পুস্তক জানিয়া ঠাকুর চমৎকৃত হইলেন। একদিন

কথাপ্রসঙ্গে হরিনাথ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, যখন আমি এখানে আসি অতিশয় উদ্দীপনা পাই। কিন্তু কলিকাতায় ফিরিয়া গেলে সে উদ্দীপনা আর থাকে না কেন?" তরুণ শিষ্যের প্রাণস্পর্শী প্রশ্নে গুরু উত্তর দিলেন, "তা কিরূপে হতে পারে? তুমি হরিদাস, হরির দাস। তোমার পক্ষে ঈশ্বরকে ভুলে থাকা কি সম্ভব?" হরিনাথ বাধা দিয়া বলিলেন, "আমি তো তা বুঝতে পারি না।" তাহাতে ঠাকুর প্রত্যুত্তর দিলেন, "কোন বস্তুর বা বিষয়ের সত্যতা কারও জানা বা না-জানার উপর নির্ভর করে না। তুমি জান আর নাই জান, তুমি হরির সেবক, হরির ভক্ত।"

গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ ক্রমশঃ প্রগাঢ় ও ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। ব্রহ্মচর্যব্রতী শিষ্য গুরুকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায়, কামটা একেবারে যায় কিরূপে?" উত্তর শুনিয়া গুরু স্তম্ভিত। ঠাকুর বলিলেন, "যাবে কেন রে? মোড় ফিরিয়ে দেনা?" শিষ্য ঠাকুরের সরল উপদেশে নূতন আলোক পাইলেন। কামজয়ের চেষ্টা না করিয়া মনকে ঈশ্বর-চিন্তায় মগ্ন করিলেই সাধক এই রিপুর আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারেন। ঠাকুরের নিকট হরিনাথ একান্তে অন্যের অগোচরে যাইয়া সাধন ভজনের উপদেশ লইতেন। ঠাকুরও তাঁহাকে সাধন-রহস্যের গূঢ় তত্ত্ব উপদেশ দিতেন, দিব্যভাব প্রদর্শন করিতেন, স্বীয় অনুভূতির কথা বলিতেন ও তাঁহার সেবা লইতেন। কাহার সহিত কিরূপভাবে মিশিতে হয়, ইত্যাদি ব্যবহারিক বিষয়েও ঠাকুর তাঁহাকে শিক্ষা দিতেন।

ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন, "হরিকে জিজ্ঞাসা করলাম। সেও বলে, 'মেয়ে মানুষের দিকে মন নাই।' "হরিনাথ বাল্যকাল হইতে আপনাকে নারীদের সংস্রব হইতে মুক্ত রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন।

সেইজন্য মাতৃতুল্য ভ্রাতৃজায়ার হস্তেও আহার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন। একদিন উক্ত বিষয়ে ঠাকুর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন, "উঃ! আমি তাদের হাওয়া সহ্য করতে পারি না!" তিরস্কারসূচক বাক্যে ঠাকুর উত্তর দিলেন, "তুই বোকার মত কথা বলছিস্! নারীদের অবজ্ঞার চোখে দেখার কারণ কি? তারা জগন্মাতার মানবীমূর্তি। তাদের জননীর মত দেখবি ও শ্রদ্ধা করবি। তাদের প্রভাব হতে মুক্ত হবার এই একমাত্র উপায়। যতই তাদের অবজ্ঞা করবি ততই তাদের ফাঁদে পড়বি।" ঠাকুরের এই জ্বলন্ত উপদেশ হরিনাথের মর্ম স্পর্শ করিল এবং নারীর প্রতি তাঁহার ভ্রান্ত ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটিল। মুক্তিকামী শিষ্যকে গুরু ধ্যান করিবার এক বিশিষ্ট প্রণালী শিক্ষা দেন—গভীর (মধ্যরাত্রে) বস্ত্রাদি সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহাকে ধ্যান করিতে বলেন। ঠাকুর ছিলেন উত্তম গুরু। তিনি কেবল উপদেশ দিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতেন, শিষ্য তাঁহার উপদেশ অনুযায়ী চলিতেছে কিনা। উক্ত উপদেশ দানের কিছুদিন পরেই ঠাকুর একদিন হরিনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে ন্যাংটো হয়ে ধ্যান করিস্ তো?" সাধনরত শিষ্য উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে হাঁ।" গুরু—"কেমন বোধ হয়?" শিষ্য "যেন সমস্ত বন্ধন চলে যায়।" গুরু—"হাঁ, ঐরূপ ধ্যান করবি, খুব উপকার পাবি।"

হরিনাথ তখন খুব বেদান্তের চর্চা করিতেন। এই সময় শিষ্যকে অনুকূল সাধনে উৎসাহিত করিবার জন্য ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "মন মুখ এক করাই হচ্ছে আসল সাধন। জগৎ মিথ্যা মুখে বললে কি হবে? ঐ নরেন ও-কথা বলতে পারে। ও যদি জগৎ মিথ্যা বলে তার কাছে জগৎ মিথ্যা হয়ে যায়। ও যদি কাঁটা গাছে হাত

দিয়ে বলে, 'কাঁটা নেই,' ওর কাছে কাঁটা 'নেই' হয়ে যায়। তোরা কাঁটায় হাত দে ত, কাঁটা অমনি হাতে প্যাঁট করে ফুটবে।"

স্বামী সারদানন্দ বলেন, "হরিনাথ এক সময়ে বেদান্তচর্চায় বিশেষ মনোনিবেশ করেন। ঠাকুর তখন বর্তমান এবং উঁহার আকুমার ব্রহ্মচর্য্য, ভক্তি, নিষ্ঠা প্রভৃতির জন্য উঁহাকে বিশেষ ভালবাসিতেন। বেদান্তচর্চা ও ধ্যান-ভজনাদিতে নিবিষ্ট হইয়া হরিনাথ পূর্বে পূর্বে যেমন ঠাকুরের নিকট ঘন ঘন যাতায়াত করিতেন সেরূপ কিছু দিন করেন নাই, বা করিতে পারেন নাই। ইহা কিন্তু ঠাকুরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। হরিনাথের সঙ্গে যাতায়াত করিত এমন এক ব্যক্তিকে দক্ষিণেশ্বরে একাকী দেখিয়া ঠাকুর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিরে তুই যে একলা, সে আসে নি?' জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বলিল, 'সে মশাই, আজকাল খুব বেদান্তচর্চায় মন দিয়েছে। রাতদিন পাঠ, বিচার, তর্ক নিয়ে আছে। তাই বোধ হয়, সময় নষ্ট হবে বলে আসে নি।' ঠাকুর শুনিয়া আর কিছু বলিলেন না। উহার কিছুদিন পরেই হরিনাথ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই ঠাকুর বলিলেন, 'কিগো, তুমি নাকি আজকাল খুব বেদান্তবিচার করছ? তা বেশ, বেশ। তা বিচার তো খালি এই গো—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। না আর কিছু?' হরিনাথ—'আজ্ঞা হাঁ। আর কি?' হরিনাথ বলেন, বাস্তবিকই ঠাকুর সেদিন ঐ কয়টি কথায় বেদান্ত সম্বন্ধে তাঁহার চক্ষু যেন সম্পূর্ণ খুলিয়া দিয়াছিলেন। কথাগুলি শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া ভাবিয়াছিলেন, এই কয়টি কথা হৃদয়ে ধারণা হইলে বেদান্তের সকল কথাই বুঝা হইল।" [১]

ঠাকুর হরিনাথকে সঙ্গে লইয়া পঞ্চবটীতলায় বেড়াইতে বেড়াইতে

১ স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ', ৩য় ভাগ, ৭৫—৭৬ পৃষ্ঠা

আরও বলিলেন, "শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন। 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'— আগে শুনলে। তারপর মনন—বিচার করে মনে মনে পাকা করলে। তারপর নিদিধ্যাসন—মিথ্যা বস্তু জগৎ হতে মন তুলে নিয়ে সদ্বস্তু ব্রহ্মের ধ্যানে লাগালে। কিন্তু তা না করে শুনলুম, বুঝলুম, কিন্তু যেটা মিথ্যা সেটাকে ছাড়তে চেষ্টা করলুম না; তাহলে কি হবে? সেটা হচ্ছে সংসারীদের জ্ঞানের মত। ওরকম জ্ঞানে বস্তুলাভ হয় না। ধারণা চাই, ত্যাগ চাই, তবে হবে। তা না হলে মুখে বলছ বটে 'কাঁটা নেই, খোঁচা নেই।' কিন্তু যেই হাত দিয়েছ অমনি প্যাঁট করে কাঁটা ফুটেছে, আর উঃ করে উঠেছ। মুখে বলছ, 'জগৎ নেই, অ-সৎ, একমাত্র ব্রহ্মই আছেন' ইত্যাদি। কিন্তু যেই জগতের রূপরসাদি সামনে এল অমনি সেগুলো সত্য বলে জ্ঞান হল আর বন্ধনে পড়লে! একবার পঞ্চবটীতে এক সাধু এল। সে লোকজনের সঙ্গে খুব বেদান্ত-টেদান্ত বলে। তারপর একদিন শুনলুম, একটা মাগীর সঙ্গে নটঘট হয়েছে। তারপর ওদিকে শৌচে গিয়েছি। দেখি, সে বসে আছে। বললুম, তুমি এত বেদান্ত-টেদান্ত বল, আবার এসব কি? সে বললে, 'তাতে কি? আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি তাতে দোষ নেই। যখন জগৎটাই তিন কালে মিথ্যা হলো তখন ঐটেই কি সত্য হবে? ওটাও মিথ্যা।' আমি শুনে বিরক্ত হয়ে বললুম, 'তোর অমন বেদান্তজ্ঞানে আমি মুতে দিই।' ওসব হচ্ছে সংসারী বিষয়জ্ঞানীর জ্ঞান। ও-জ্ঞান জ্ঞানই নয়।" সেদিন হরিনাথের সঙ্গে ঠাকুরের এই পর্যন্ত কথাই হইল। ইতঃপূর্বে হরিনাথের ধারণা ছিল উপনিষদ, পঞ্চদশী ইত্যাদি নানা জটিল গ্রন্থ না পড়িলে, সাংখ্য-ন্যায়াদি দর্শনে ব্যুৎপত্তি না হইলে বেদান্ত কখন বুঝা যাইবে না এবং মুক্তিলাভ সুদূরপরাহত থাকিবে। ঠাকুরের সেদিনকার কথাতেই হরিনাথ বুঝিলেন, বেদান্তের যত কিছু বিচার

সব ঐ ধারণাটি হৃদয়ে দৃঢ় করিবার জন্য। বহু দর্শনশাস্ত্র ও বিচারগ্রন্থ পড়িয়া যদি কাহারও মনে ব্রহ্মের সত্যত্ব ও জগতের মিথ্যাত্ব অনুভূত না হয় তবে ঐসকল পড়া না-পড়া উভয়ই সমান। হরিনাথ সেদিন ঠাকুরের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্বক কলিকাতায় ফিরিবার পথে স্থির সংকল্প করিলেন, তখন হইতে শাস্ত্রপাঠাদি অপেক্ষা সাধনভজনে অধিক মনোনিবেশ করিবেন। সংকল্প অনতিবিলম্বেই কার্যে পরিণত হইল। হরিনাথ সাধনসাগরে ঝাঁপ দিলেন।

উক্ত ঘটনার কিছুকাল পরে ঠাকুর একদিন বাগবাজারে বলরাম বসুর বাটীতে পদার্পণ করিলেন। তাঁহার আগমন-সংবাদ পাইয়া বাগবাজার অঞ্চলের গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি ভক্তগণ অনেকে উপস্থিত হইলেন। হরিনাথের গৃহ অতি নিকটেই ছিল। আসনগ্রহণান্তে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে ছেলেটি (হরি) কোথা গা ? তাকে একবার ডাক না।" জনৈক প্রতিবেশী যুবক যাইয়া তৎক্ষণাৎ হরিনাথকে ডাকিয়া আনিলেন। বলরাম বসুর বাটীর দ্বিতলস্থ প্রশস্ত বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়াই হরিনাথ ভক্তমণ্ডলী-পরিবৃত ঠাকুরকে দর্শন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রণামপূর্বক নিকটেই একপার্শ্বে বসিলেন। ঠাকুরও তাঁহাকে সহাস্যে কুশলপ্রশ্নমাত্র করিয়াই ঈশ্বরকৃপা সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন। ঠাকুরের দু-একটি কথার ভাবেই হরিনাথ বুঝিতে পারিলেন, তিনি উপস্থিত সকলকে বুঝাইতেছেন—জ্ঞান বল, ভক্তি বল, দর্শন বল, কিছুই ঈশ্বরকৃপা ভিন্ন হইবার নহে। শুনিতে শুনিতে তাঁহার মনে হইতে লাগিল, ঠাকুর তাঁহার মনের ভুল ধারণাটি দূর করিবার জন্যই উক্ত প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন। তাঁহার মনে হইল, ঠাকুর ঐ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিতেছেন সব তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া।

ঠাকুর বলিলেন, "কি জান! কামকাঞ্চনকে ঠিক ঠিক মিথ্যা বলে

বোধ হওয়া, জগৎটা তিন কালেই অ-সৎ বলে ঠিক ঠিক মনে প্রাণে ধারণা হওয়া কি কম কথা? তাঁর দেখা না হলে কি হয়? তিনি কৃপা করে ঐরূপ ধারণা যদি করিয়ে দেন তো হয়। নইলে মানুষ নিজে সাধন করে সেটা কি ধারণা করতে পারে? তার কতটুকু শক্তি? সেই শক্তি দিয়ে সে কতটুকু চেষ্টা করতে পারে?" এইরূপে ঈশ্বরকৃপার কথা বলিতে বলিতে ঠাকুরের সমাধি হইল। কিছুক্ষণ পরে অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "একটা ঠিক করতে পারে না, আবার আর একটা চায়!" ইহা বলিয়াই তিনি ভাবাবিষ্ট অবস্থায় গান ধরিলেন—

"ওরে কুশীলব, করিস্ কি গৌরব
ধরা না দিলে কি পারিস্ ধরিতে?"

কুশীলব যখন মহাবীরকে বাঁধিয়াছিলেন তখন মহাবীর এই গান গাহিয়াছিলেন। এই গানটি গাহিতে গাহিতে ঠাকুরের দুই চক্ষে এত প্রেমাশ্রু বহিতে লাগিল যে, বিছানার চাদরের খানিকটা ভিজিয়া গেল! হরিনাথও অপূর্ব ভক্তিভাবে দ্রবীভূত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে উভয়ে প্রকৃতিস্থ হইলেন। হরিনাথ বলেন, "সে শিক্ষা চিরকাল আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে! সেইদিন হইতেই বুঝিলাম, ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন কিছুই হইবার নহে।" তখন কঠোপনিষদের এই শ্লোকটি (১।২।২৩) তাঁহার মনে পড়িল—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥[১]

১ শাস্ত্রপাঠ, বা মেধাশক্তি বা বহু শাস্ত্রশ্রবণ দ্বারা আত্মাকে লাভ করা যায় না। এই আত্মা যাঁহাকে অনুগ্রহ করেন তিনিই ইঁহাকে প্রাপ্ত হন, তাঁহার নিকট এই আত্মা স্বীয় স্বরূপ ব্যক্ত করেন।

জীবন্মুক্তিলাভের বাসনা হরি মহারাজের মনে বাল্যকাল হইতেই জাগ্রত ছিল। তিনি আজন্ম মুমুক্ষু ছিলেন। ১৯১৬ খ্রীঃ ৮ই জুলাই তারিখে আলমোড়া রামকৃষ্ণ কুটীর হইতে একখানি পত্রে তিনি কোন ভক্তকে এই বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে ইহা স্পষ্টভাবে অনুমিত হয়। আবশ্যকীয় পত্রাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"জীবন্মুক্তিসুখপ্রাপ্তিহেতবে জন্মধারিতম্।
আত্মনা নিত্যমুক্তেন ন তু সংসারকাম্যয়া ॥ [১]

যখন শঙ্করাচার্যকৃত এই শ্লোকটি প্রথম পড়িয়াছিলাম, কি এক অদ্ভুত আনন্দ ও আলোকের অবতারণা তখন মনে হইয়াছিল তাহা আর আপনাকে কি জানাইব! যেন জীবনের ইতিকর্তব্যতা তখনই জাজ্জ্বল্যমান হইয়া উঠিল এবং সকল সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান আপনা হইতেই হইয়া গেল। তখন বুঝিলাম যে, মনুষ্যদেহধারণের উদ্দেশ্য আর কিছু নহে, জীবন্মুক্তিসুখপ্রাপ্তিই ইহার একমাত্র প্রয়োজন। বাস্তবিকই নিত্যমুক্ত আত্মা আর কোন কারণেই এই দেহধারণ করিতে পারেন না। দেহধারণ করিয়াও যে তিনি মুক্ত—এই ভাব লাভ করিবার জন্যই তাঁহার দেহধারণ।"

মুক্তি বা নির্বাণ-লাভকেই হরিনাথ জীবনের উদ্দেশ্য করিয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে একদিন ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "নির্বাণকে আদর্শ করেছ কেন? নির্বাণ অপেক্ষাও উচ্চতর অবস্থা আছে এবং তাহা লাভ করা যায়।" এই কথা তখন হরিনাথের ধারণার অতীত ছিল। তিনি প্রত্যক্ষ বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, তাহা কি সম্ভব? সাধক কি তাহা লাভ করতে পারে?" ঠাকুর গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন,

---

১ নিত্যমুক্ত আত্মার দেহধারণ জীবন্মুক্তিসুখলাভের জন্য, সংসারভোগের জন্য নহে।

হাঁ, এরূপ উচ্চাবস্থা আছে। জগদম্বার কৃপায় তাহা লাভ করা যায়।” হরিনাথ সিদ্ধাবস্থা সম্বন্ধে নূতন আলোক পাইলেন।

ঠাকুর হরিনাথকে এই সম্বন্ধে আরও বলিয়াছিলেন, “যারা নির্বাণ প্রার্থনা করে তারা হীনবুদ্ধি, ভয়-তরাসে। যেমন পাশাখেলায় কেবলই চিক খুঁজছে, কিসে ঘরে উঠে যায় সেই চেষ্টা। ঘুঁটি একবার পাকলে আর নামাতে চায় না। একে বলে কাঁচা খেলোয়াড়। আর পাকা খেলোয়াড় মার পেলে পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে মারে। আবার তখনই ‘কচে বারো’ বলে পাশা ফেললেই আবার উঠে গেল। তাদের পাশা হাতের বশ। যেমন বলে তেমনি পড়ে। সুতরাং ভয় নেই, নির্ভয়ে খেলে।” হরিনাথ বলিলেন, “এমন সত্যিই কি হয়।” ঠাকুর বলিলেন, “হয় বৈ কি। মার কৃপায় ঠিক হয়। যে খেলে মা তাকে ভালবাসেন। যেমন চোর-চোর খেলায়—যে দৌড়ে খেলে, বুড়ী তার উপর খুশী; হলো, কখন কখন তাকে হাতটা এগিয়ে দিলে। তাকে ছুঁলে আর চোর হয় না। কিন্তু যে কাছে কাছে থাকে, বুড়ী তার উপর তত খুশী নয়। সেইরূপ যারা নির্বাণ চায়, খেলা ভেঙ্গে দিতে চায়, মা তাদের উপর তত খুশী নন। মা খেলতে ভালবাসেন। তাই ভক্তরা নির্বাণ চায় না। তারা বলে, চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি।” [১]

হরিনাথ প্রতিবাদ করিলেন, “বুড়ী খেলতে ভালবাসে, তাতে আমার কি? আমি কেন খেলব?” ঠাকুর অমনি ধমক্ দিয়া শিষ্যকে বলিলেন, “সে কি রে? কি বলছিস্ তুই? ভারী স্বার্থপর কথা বলছিস্ যে! খেলেই ত সুখ। যে কেবল বুড়ীর কাছে কাছে ঘোরে তাকে বুড়ী

১ আলমোড়া হইতে ১৪।৮।১৫ তারিখে লিখিত একটি পত্রে উদ্ধৃত। পত্রখানি ‘স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র’-তে প্রকাশিত।

ভালবাসে না। যে কতক্ষণ খুব খেলে তাঁকে ছুঁতে আসে, তার জন্য যে সে হাত বাড়িয়ে দেয়। পাশা খেলায় দেখিস্ নি? পাকা খেলোয়াড় পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে খেলে। আবার যেই চায় অমনি দান ফেলে 'কচে বারো' বলে উঠে যায়।" হরিনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন কি হয়, মশায়?" ঠাকুর সস্নেহে উত্তর দিলেন, "হবে না কেন? হয় রে, অমনও হয়।"

স্বামী তুরীয়ানন্দ বেলুড় মঠের জনৈক প্রধান সাধুকে বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর আমাকে তিন বার চড় মারিয়াছিলেন।— (১) একবার অনেক দিন তাঁহার নিকট যাই নি। বেদান্তচর্চায় ব্যাপৃত থাকার জন্য তাঁহার নিকট যাইতে সময় করিতে পারি না, ইহা শুনিয়া তাঁহার নিকট ডাকাইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'বেদান্ত আর কি? ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। না আর কিছু?' সেদিন বেদান্তের মূলতত্ত্ব, অন্তর্নিহিত ভাব আমার বুদ্ধিগোচর হইল। আমার শাস্ত্রপাঠ সব ভুয়া বুঝিলাম। এই প্রথম চড় খাওয়া। (২) একদিন কলিকাতায় ভাবাবেশে ঠাকুর বলিতেছেন, 'ব্রহ্মজ্ঞান! থূঃ থূঃ থূঃ!!' দেখিলাম, মুখের থুতুতে হাতের উপরের ভাগটা একেবারে ভিজিয়া গেল। যে ব্রহ্মজ্ঞান জীবের শ্রেষ্ঠ পরমার্থ, তাহাও তুচ্ছ বুঝিলাম। তবে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরমার্থ কি তাহা অজ্ঞাত রহিল। সেদিন দ্বিতীয় চড় খাইলাম। (৩) দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর একদিন বলিলেন, 'পাকা খেলোয়াড় পাকা ঘুঁটি কাঁচাইয়া পুনরায় খেলে এবং 'কচে বারো' বলিয়া দান ফেলিবামাত্র সেরূপই পড়ে। কিন্তু কাঁচা খেলোয়াড় কোনরূপে উঠিয়া গেলে আর খেলিতে চাহে না। নির্বাণের চেয়েও অধিকতর কাম্য এইরূপ সিদ্ধ অবস্থা। ইহাই আমার তৃতীয় চড় খাওয়া।" স্বামী তুরীয়ানন্দ কেদার বাবাকে ইহাও বলিয়াছেন, "লীলায় ভগবানের সহিত শরীরধারণেও ভয় থাকে, পাছে

মায়ায় আবদ্ধ হইয়া পড়ে। এইজন্য নির্বাণ-মুক্তিই সাধারণের বাঞ্ছনীয় কারণ, শরীরধারণের বিড়ম্বনা অশেষ, বিপদ অসংখ্য।"

হরিনাথ একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে গিয়াছেন। আরও অনেকে আসিয়াছেন। তন্মধ্যে একজন বেদান্তে খুব পণ্ডিত ছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, কিছু বেদান্ত শোনাও। পণ্ডিত অতি শ্রদ্ধার সহিত প্রায় এক ঘণ্টাকাল ধরিয়া উত্তমরূপে বেদান্ত ব্যাখ্যা করিলেন। ঠাকুর শুনিয়া খুব প্রীত, সকলেই আশ্চর্যান্বিত। কিন্তু ঠাকুর তাঁহার খুব সুখ্যাতি করিয়া পরে বলিলেন, "আমার কিন্তু বাপু অতশত ভাল লাগে না। আমার মা আছেন, আমি আছি। তোমাদের ও বড় বড় জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা—ধ্যান, ধ্যেয়, ধ্যাতা ইত্যাদি ত্রিপুটী প্রভৃতি বেশ খুব ভাল। আমার হচ্ছে কিন্তু মা আর আমি, আর কিছুই নাই।" "মা আর আমি"—এই কয়টি কথা ঠাকুর এমনি ভাবে বলিলেন যে, সকলের হৃদয়ে অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য বিশেষ ভাবে বদ্ধ হইয়া গেল, এবং বেদান্তসিদ্ধান্ত সমস্ত অসার বোধ হইল। তখন বেদান্তের ঐসব ত্রিপুটী অপেক্ষা ঠাকুরের 'মা আর আমি' হরিনাথের নিকট অতি সরল, সহজ ও মনোজ্ঞ বলিয়া মনে হইল। সেই অবধি হরিনাথ বুঝিলেন, 'মা আর আমি'—ইহাই অবলম্বনীয়।[১]

শ্রীরামকৃষ্ণ হরিনাথের মহান্ আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতেন। একবার তিনি কিছুদিন আসিতে পারেন নাই। পরে যেদিন আসিলেন, ঠাকুর স্নেহসিক্ত স্বরে বলিলেন, "তুমি এখানে আস না কেন? তোমাদের খুব দেখতে ইচ্ছা হয়। কারণ, আমি জানি, তোমরা ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র। নচেৎ, তোমাদের কাছে আমি কি আশা

১ আলমোড়া হইতে ১২।৯।১৫ তারিখে লিখিত একটি পত্রে উল্লিখিত। পত্রখানি 'স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র'-তে প্রকাশিত।

করতে পারি? তোমরা আমাকে এক পয়সার কিছু দিতেও পার না এবং যখন আমি তোমাদের বাড়ী যাই, তখন তোমরা আমার জন্য ছেঁড়া মাদুরও পেতে দিতে পার না। তবুও আমি তোমাদের এত ভালবাসি। এখানে আসতে ভুলো না। কারণ, এখানে তোমরা ধর্মজীবনের সব কিছু পাবে। যদি অন্যত্র তোমরা ঈশ্বরদর্শনের সুযোগ পাও, তবে সেখানে নিশ্চয়ই যাবে। আমি এই চাই যে, তোমরা ঈশ্বর লাভ কর, জাগতিক দুঃখের অতীত হও এবং ভাগবত আনন্দ উপভোগ কর। যেরূপেই হোক, তাঁকে এই জীবনে লাভ কর। মা আমাকে বলেন—যদি তোমরা কেবলমাত্র এখানে আস, বিনা চেষ্টায় তোমাদের ঈশ্বরদর্শন হবে। তাই, তোমাদিগকে এখানে এত আসতে বলি।" এইসকল কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর ভাবাবেশে কাঁদিতে লাগিলেন।

এইরূপে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূতসঙ্গে হরিনাথের ধর্মজীবন দিন দিন উন্নত হইতে লাগিল। ইতোমধ্যে নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছিল। হরিনাথ নরেন্দ্রনাথকে অতিশয় ভালবাসিতেন। নরেন্দ্রনাথও চিরদিনই এই গুরুভ্রাতাকে গভীর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন এবং 'হরি ভাই' বলিয়া ডাকিতেন। উভয়ে কলিকাতা হইতে দক্ষিণেশ্বরে কখন হাঁটিয়া, কখন গাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। একদিন পদব্রজে বরাহনগর হইয়া কলিকাতা ফিরিবার পথে উভয়ের কথাবার্তা হইতেছিল। নরেন্দ্রনাথ হরিনাথকে বলিলেন, "মশায়, কিছু বলুন, শুনি।" হরিনাথ উত্তর দিলেন, "কি আর বলব!" পরে 'শিবমহিম্নঃ-স্তোত্র' হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি তিনি আবৃত্তি করিলেন—

অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্বী।

লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি ॥ [১]

ঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু বলিতে অনুরুদ্ধ হইয়া নরেন্দ্রনাথ সেদিন ওজস্বিনী ভাষায় অনর্গল নানাকথা বলিতে লাগিলেন। তিনি সেদিন বলিয়াছিলেন, "ওঁর কথা আর কি বলব? আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, তো বলি, উনি এল-ও-ভি-ই (love) personified (মূর্তিমান প্রেম)।" নরেন্দ্রনাথের বলিবার ধরন ও প্রবল ঐকান্তিকতা-দর্শনে হরিনাথ তাঁহার প্রতি আরও আকৃষ্ট হইলেন। তাঁহার আরও বোধ হইল, নরেন্দ্রনাথের মধ্যে যে বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তি বিদ্যমান, তিনি সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন।

স্বামীজী একদিন হরিনাথকে বলিয়াছিলেন, "হরি ভাই, ভগবান কি শাক মাছ যে, এত দাম দিয়া অর্থাৎ এত জপ, এইরূপ তপ করিয়া তাঁহাকে লাভ করিবে? তাঁহাকে লাভ করিতে কেবল তাঁহার কৃপা! 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।' তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥"[২]

শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত হরিনাথের দুইবার সাক্ষাতের বিস্তৃত বিবরণ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে'র পঞ্চম ও চতুর্থ ভাগে বিবৃত আছে। পঞ্চম ভাগে যে সাক্ষাতের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা ঘটিয়াছিল দক্ষিণেশ্বর

১ নীল পর্বত যদি কালী হয়, সাগর যদি মসীপাত্র হয়, দেববৃক্ষের শ্রেষ্ঠ শাখা যদি কলম হয়, পৃথিবী যদি লিখিবার কাগজ হয়, আর এইসমস্ত বস্তু লইয়া সরস্বতী যদি চিরকাল ধরিয়া লিখিতে থাকেন, তথাপি হে ঈশ্বর, তোমার গুণসমূহের ইতি করা যায় না।

২ কঠোপনিষদে (১।২।২৩) এবং মুণ্ডকোপনিষদে (৩।২।৩) এই শ্লোকার্ধ আছে। ইহার অর্থ—এই আত্মা যাঁহাকে বরণ করেন, ইনি তাঁহারই লভ্য। ইনি তাঁহার নিকট স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করেন।

কালীবাড়ীতে ১২৯১ সালে ১২ই জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ) শনিবার। 'কথামৃত'কার লিখিয়াছেন, "হরি তখন তাঁহার বাগবাজারের বাড়ীতে ভাইদের সঙ্গে থাকিতেন। জেনারেল এসেম্ব্লিতে প্রবেশিকা পর্যন্ত পড়িয়া আপাততঃ বাড়ীতে ঈশ্বরচিন্তা, শাস্ত্রপাঠ ও যোগাভ্যাস করিতেন। মাঝে মাঝে শ্রীরামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া দর্শন করিতেন। ঠাকুর বাগবাজারে বলরামের বাড়ীতে গমন করিলে তাঁহাকে কখনও কখনও ডাকিয়া পাঠাইতেন।" উপরোক্ত তারিখে ঠাকুরের সঙ্গে হরিনাথের নিম্নোক্ত কথোপকথন হয়[১]—

হরিনাথ—আচ্ছা, অনেকের তাঁকে লাভ করতে অত দেরী হয় কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি জান, ভোগ আর কর্ম শেষ না হলে ব্যাকুলতা আসে না। বৈদ্য বলে, দিন কাটুক তারপর সামান্য ওষুধে উপকার হবে। নারদ রামকে বললেন, 'রাম, তুমি অযোধ্যায় বসে রইলে, রাবণ বধ কেমন করে হবে? তুমি যে সেইজন্য অবতীর্ণ হয়েছ।' রাম বললেন—নারদ, সময় হউক, রাবণের কর্মক্ষয় হউক। পরে তার বধের উদ্যোগ হবে।[২]

হরিনাথ—আচ্ছা, সংসারে এত দুঃখ কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—এ সংসার তাঁর লীলা, খেলার মত। এই লীলায় সুখ-দুঃখ, পাপপুণ্য, জ্ঞান-অজ্ঞান, ভালমন্দ সব আছে। দুঃখ পাপ এসব গেলে লীলা চলে না। 'চোর চোর খেলা'য় বুড়ীকে ছুঁতে হয়। খেলার গোড়াতেই বুড়ী ছুঁলে বুড়ী সন্তুষ্ট হয় না। ঈশ্বরের (বুড়ীর) ইচ্ছা যে খেলা খানিকক্ষণ চলে। তারপর "ঘুড়ির লক্ষের দুটো-

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পঞ্চম ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৩৬, ১৪৫-১৪৬

২ অধ্যাত্ম রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে উপরোক্ত কথোপকথন আছে।

একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত চাপড়ি।” অর্থাৎ ঈশ্বরদর্শন করে দুই-এক জন মুক্ত হয়ে যায়, অনেক তপস্যার পর তাঁর কৃপায়। তখন মা আনন্দে হাততালি দেন।

হরিনাথ—খেলায় যে আমাদের প্রাণ যায়!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তুমি কে, বল দেখি? ঈশ্বরই সব হয়েছেন—মায়া, জীব, জগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব। ‘সাপ হয়ে খাই, আবার রোজা হয়ে ঝাড়ি!’ তিনি বিদ্যা অবিদ্যা দুই-ই হয়ে রয়েছেন। অবিদ্যা মায়ায় অজ্ঞান হয়ে রয়েছেন; বিদ্যা মায়ায় ও গুরুরূপে রোজা হয়ে ঝাড়ছেন। অজ্ঞান, জ্ঞান, বিজ্ঞান। জ্ঞানী দেখেন—তিনিই আছেন, তিনিই কর্তা, সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার কচ্ছেন। বিজ্ঞানী দেখেন—তিনি সব হয়ে রয়েছেন। মহাভাব, প্রেম হলে দেখে—তিনি ছাড়া আর কিছু নাই। ভাবের কাছে ভক্তি ফিকে, ভাব পাকলে মহাভাব, প্রেম।

‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে’র চতুর্থ ভাগে[১] ঠাকুরের সহিত হরিনাথের যে সাক্ষাতের বিবরণ পাওয়া যায় তাহা ঘটিয়াছিল ১৪ই জুলাই (১৮৮৫) মঙ্গলবার, রথযাত্রাদিবসে, বলরাম মন্দিরে। ‘কথামৃত’কার লিখিয়াছেন, “হরিনাথ একলা একলা থাকেন ও বেদান্তচর্চা করেন। বয়স তেইশ-চব্বিশ হইবে। বিবাহ করেন নাই। ঠাকুর তাঁহাকে বড় ভালবাসেন। সর্বদা তাঁহার কাছে যাইতে বলেন। তিনি একলা একলা থাকিতে চান বলিয়া হরিনাথ ঠাকুরের কাছে অধিক যাইতে পারেন না।”

বলরাম মন্দিরে হরিনাথ প্রভৃতি বহুভক্তপরিবৃত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বসিয়া আছেন। তিনি হরিনাথকে বলিলেন, “কিগো, তুমি অনেক দিন

১ তৃতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২৫৪-২৫৬

আস নাই। তিনি একরূপে নিত্য, একরূপে লীলা। বেদান্তে কি আছে?—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। কিন্তু যতক্ষণ 'ভক্তের আমি' রেখে দিয়েছেন, ততক্ষণ লীলাও সত্য। 'আমি' যখন তিনি পুছে ফেলবেন, তখন যা আছে তাই আছে। সে যে কি বস্তু তা মুখে বলা যায় না! যতক্ষণ 'আমি' রেখে দিয়েছেন, ততক্ষণ সবই নিতে হবে। কলাগাছের খোল ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে মাজ পাওয়া যায়। কিন্তু খোল থাকলেই মাজ আছে, মাজ থাকলেই খোল আছে। খোলেরই মাজ, মাজেরই খোল। নিত্য বললেই লীলা আছে বোঝায়। লীলা বললেই নিত্য আছে বোঝায়। তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। যখন নিষ্ক্রিয় তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি। যখন সৃষ্টি করছেন, পালন করছেন, সংহার করছেন, তখন তাঁকে শক্তি বলি। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ; জল স্থির থাকলেও জল, হেললে-দুললেও জল। 'আমি'-বোধ যায় না। যতক্ষণ 'আমি'-বোধ থাকে, ততক্ষণ জীবজগৎ মিথ্যা বলবার যো নাই। বেলের খোলটা আর বিচিগুলো ফেলে দিলে সমস্ত বেলটার ওজন পাওয়া যায় না। যে ইট, চূণসুরকি থেকে ছাদ, সেই ইট, চূণসুরকি থেকেই সিঁড়ি। যিনি ব্রহ্ম, তাঁর সত্তাতেই জীবজগৎ।

"ভক্তেরা—বিজ্ঞানীরা—নিরাকার সাকার দুই-ই লয়, অরূপ রূপ দুই-ই গ্রহণ করে। ভক্তিহিমে ঐ জলেরই খানিকটা বরফ হয়ে যায়। আবার জ্ঞান-সূর্য্য উদয় হলে ঐ বরফ গলে আবার যেমন জল তেমনি হয়। যতক্ষণ মনের দ্বারা বিচার ততক্ষণ নিত্যেতে পৌঁছান যায় না। মনের দ্বারা বিচার করতে গেলেই জগৎকে ছাড়বার যো নাই; রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—ইন্দ্রিয়ের এইসকল বিষয়কে ছাড়বার যো নাই। বিচার বন্ধ হলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান। এ মনের দ্বারা আত্মাকে জানা যায় না। আত্মার দ্বারাই আত্মাকে জানা যায়। শুদ্ধ মন,

শুদ্ধ বুদ্ধি, শুদ্ধ আত্মা একই। দেখ না, একটা জিনিস দেখতেই কতগুলো দরকার—চক্ষু দরকার, আলো দরকার, আবার মনের দরকার। এই তিনটার মধ্যে একটা বাদ দিলে তার দর্শন হয় না। এই মনের কাজ যতক্ষণ চলছে, ততক্ষণ কেমন করে বলবে যে, জগৎ নাই, কি আমি নাই? মনের নাশ হলে, সংকল্প-বিকল্প চলে গেলে সমাধি হয়—ব্রহ্মজ্ঞান হয়। কিন্তু সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি—নি-তে অনেকক্ষণ থাকা যায় না।"

একদিন দক্ষিণেশ্বরে মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় হরিনাথ ঠাকুরের কাছে বসিয়াছিলেন। ঠাকুরের জন্য থালায় অন্নব্যঞ্জনাদি আসিল। ঠাকুর আসনে আহারার্থ বসিলেন। তাঁহার সম্মুখে ভাতের থালা এবং উহার চারিদিকে নানাপ্রকার ব্যঞ্জনাদি ছোট ছোট বাটিতে পরিবেশিত। ঘরে আরও দুই-তিন জন লোক উপস্থিত ছিলেন। ঠাকুর আজন্ম অল্পাহারী। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজনের মনে হইয়াছিল, পরমহংসদেব রাজসিক আহার করেন। ঠাকুর সেই ব্যক্তির মনোভাব বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ হরিনাথকে বলিলেন, "মনটা সদাই অখণ্ডের দিকে ছুটে। তোমাদের সঙ্গে কথা কইব বলে মনটাকে নীচে নামিয়ে রাখবার জন্য এটা খাই, ওটা খাই, ভিন্ন ভিন্ন বাটি থেকে একটু করে জিভে দি।" সেদিন হরিনাথ বুঝিলেন, ঠাকুরের আহার-সংযম অসাধারণ।

ঠাকুর শেষ অসুখের সময় যখন কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে ছিলেন, তখন একদিন হরিনাথ ঠাকুরের কাছে গিয়াছেন। তিনি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছেন?" ঠাকুর উত্তর দিলেন, "বড় কষ্ট হচ্ছে, খেতে পারছি না, অসহ্য জ্বালা-যন্ত্রণা হচ্ছে।" ঠাকুরের দিব্য সান্নিধ্যে কিছুক্ষণ থাকিয়াই হরিনাথের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইল। তিনি

দেখিলেন, ঠাকুর আনন্দের সাগর এবং রোগ-যন্ত্রণার অতীত। কিন্তু ঠাকুর পূর্ববৎ স্বীয় রোগ-যন্ত্রণার কথা আবার হরিনাথকে বলিলেন। ইহা বলা সত্ত্বেও হরিনাথের একই অলৌকিক অনুভূতি হইতে লাগিল। তখন তিনি ঠাকুরকে বলিলেন, "আপনি যাহাই বলুন না কেন, আমি দেখছি আপনি অসীম আনন্দের সমুদ্র।" ইহা শুনিয়া ঠাকুর মৃদুহাস্যে স্বগত উক্তি করিলেন, "শালা ধরে ফেলেছে রে!" হরিনাথ দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে শ্রীরামকৃষ্ণরূপে সাক্ষাৎ ভগবান উপবিষ্ট। গুরু ইষ্টরূপে শিষ্যের নিকট প্রকাশিত হইলেন। ঠাকুর হরিনাথের নিকট দিব্যস্বরূপ প্রকটিত করিলেন।[১]

---

১ এই ঘটনাটি স্বামী নির্বেদানন্দ-কথিত।

তৃতীয় অধ্যায়

তীর্থভ্রমণ ও তপস্যা

ঠাকুরের দেহত্যাগের অল্পকাল পরে হরিনাথ প্রবল বৈরাগ্যের প্রভাবে একবস্ত্র হইয়া এবং একখানি লেপের ওয়াড় উত্তরীয়স্বরূপে লইয়া আসামের শিলং পর্যন্ত ঘুরিয়া আসেন এবং ফিরিয়া আসিয়াই কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে বরাহনগরে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। হরিনাথ চব্বিশ বৎসর বয়সে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধে উক্ত মঠে যোগদান করেন এবং সন্ন্যাসগ্রহণান্তে স্বামী তুরীয়ানন্দ নামে অভিহিত হন। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা উপেন্দ্রনাথ বলেন, "একদিন দেখি, এক অল্পবয়স্ক সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে এসে আমার কাছে দাঁড়াল। তার মাথা নেড়া, গেরুয়া পরা। চিন্‌লুম, হরি। বরাবরই সে একটু ভাবপ্রবণ। দেখলুম, তার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। জিজ্ঞাসা করলুম, 'কাঁদছ কেন? এই তো তুমি চাও।' হরি কাঁদতে কাঁদতে বল্‌লে, 'আপনাদের কাছে আমি অনেক প্রকারে ঋণী।' আমি বল্‌লুম, 'তা হোক্, বড় ভাইদের যা কর্তব্য তা আমরা করেছি। কিন্তু তুমি যখন সংসারী হলে না তখন এই পথই ভাল। আমি আশীর্বাদ করছি, তোমার সিদ্ধিলাভ হোক্।' আমার কথায় তার এত আনন্দ হল যে, কাঁদতে কাঁদতে সে হেসে উঠল। তখন তার বয়স অনুমান চব্বিশ বৎসর হবে।"

সন্ন্যাসগ্রহণ সম্পর্কে তুরীয়ানন্দজী পরবর্তী জীবনে বলিয়াছিলেন, "আমাদের সন্ন্যাসের পরদিন স্বামীজী বরানগর মঠে লতাপাতায় ঘেরা একটি কুঞ্জের মত জায়গায় নিয়ে গিয়ে বৃহদারণ্যক উপনিষদের অন্তর্যামী

ব্রাহ্মণ এবং মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণ পড়িয়াছিলেন।" সন্ন্যাসগ্রহণান্তে স্বামী তুরীয়ানন্দ বরাহনগর মঠে অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের সহিত কঠোর তপস্যায় ডুবিয়া গেলেন। কিন্তু অধিকদিন তিনি তথায় রহিলেন না। স্বাধীন এবং স্বচ্ছন্দ পরিব্রাজক-জীবন তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। ভর্তৃহরি এইরূপ জীবনের মাহাত্ম্য-কীর্তনে সত্যই বলিয়াছেন—

ভূঃ পর্যঙ্কো নিজভুজলতা কন্দুকং খং বিতানং
দীপশ্চন্দ্রো বিরতি-বনিতালব্ধ সঙ্গ প্রমোদঃ।
দিক্কান্তাভিঃ পবনচমরৈর্বীজ্যমানঃ সমন্তাৎ
ভিক্ষুঃ শেতে নৃপ ইব ভুবি ত্যক্তসর্বস্পৃহোঽপি॥ [১]

স্বামী তুরীয়ানন্দ তীর্থপর্যটন ও নিঃসঙ্গ তপস্যার জন্য বহির্গত হইলেন। ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরপূর্বক সন্ন্যাসী যখন বৃক্ষতল বা পর্বতগুহা আশ্রয় করেন, তখনই তাঁহার বিবেক-বৈরাগ্যের প্রকৃত পরীক্ষা শুরু হয়। স্বামী তুরীয়ানন্দ নিঃসম্বল পরিব্রাজকরূপে এক তীর্থ হইতে অন্য তীর্থে পদব্রজে ভ্রমণ ও তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার তপস্যা ও তীর্থপর্যটনের ধারাবাহিক কাহিনী বিবৃত করা অসম্ভব বলিলেই চলে। কারণ সন্ন্যাসীর স্বভাবসুলভ আত্মগোপনের ফলে সেই চমকপ্রদ ইতিহাসের অনেকগুলি পৃষ্ঠাই আজ বিলুপ্ত। তথাপি গুরুভ্রাতাদের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পত্রাবলী এবং জীবনকাহিনী-অবলম্বনে আমরা ঘটনাপরম্পরার সহিত যথাসম্ভব পরিচিত হইতে চেষ্টা করিব।

১ সকল স্পৃহা ত্যাগপূর্বক সন্ন্যাসী রাজার ন্যায় ভূমিতে শয়ন করেন। ভূমি তাঁহার খাট, স্ববাহু বালিশ, আকাশ চাঁদোয়া ও চন্দ্র প্রদীপ। তিনি বিরামরূপ পত্নীর সঙ্গে প্রমোদরত এবং দিক্‌রূপ প্রিয়াগণ একত্রে তাঁহাকে পবনরূপ চামর দ্বারা ব্যজনে নিযুক্ত।

সম্ভবতঃ ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী জ্ঞানানন্দ (দক্ষ মহারাজ) প্রভৃতি কেদারবদরী-দর্শনান্তে হৃষীকেশে ফিরিয়া দেখিলেন স্বামী সারদানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ ও বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল মহাশয় সেখানে তপস্যারত আছেন। অতঃপর ১৮৯০ খ্রীঃ গ্রীষ্মকালে স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতির সহিত গঙ্গোত্রী আদি তীর্থদর্শনে যাত্রা করেন। সেই বৎসর পাহাড়ে দুভিক্ষ হওয়ায় সরকার হইতে সাধারণ যাত্রীদের যাওয়া বন্ধ করা হইয়াছিল। কিন্তু স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রভৃতি ভাবিলেন যে, জীবনে তীর্থভ্রমণের সুযোগ বারংবার আসে না। সেইজন্য তাঁহারা আহারাদির অসুবিধা হইবে জানিয়াও স্বীয় সংকল্প হইতে বিচ্যুত হইলেন না। তাঁহারা দেরাদুন ও মুসুরী হইতে প্রথমে গঙ্গোত্রীতে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে কালীকমলীর ছত্রে তিন দিন অবস্থানান্তে কেদারনাথের পথে যাত্রা করিলেন। গঙ্গোত্রী হইতে কেদারনাথ পর্যন্ত কোন সরকারী রাস্তা ছিল না। তাঁহাদিগকে দুর্গম পাকদণ্ডী পথে অতি কষ্টে চলিতে হইল। চারিদিকে গগনস্পর্শী গিরিশৃঙ্গ-বেষ্টিত নিবিড় অরণ্য। তীর্থযাত্রী সন্ন্যাসিগণ মহারণ্যে পথ হারাইলেন এবং তিন দিন অনাহারে অনিদ্রায় অবিশ্রান্ত ভাবে চলিয়াও পথ পাইলেন না।

ভাটিয়ারী-অরণ্য সরকার বাহাদুরের 'বন্দ্ জঙ্গল' (Reserve forest)। তথায় মানুষের মুখ দেখার সম্ভাবনা নাই। সাধারণের উহাতে কাঠ কাটিবার অধিকার ছিল না। জনৈক পাহাড়ী গোপনে কুঠার হাতে কাঠ কাটিতে আসিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া পথভ্রষ্ট পথিকত্রয় দূর হইতে কুঠারধারীকে ডাকিলেন। সহসা মনুষ্যকণ্ঠ শুনিয়া ভয়ে লোকটির হাত হইতে কুঠার পড়িয়া গেল। সাধুদিগকে সরকারী চৌকিদার ভাবিয়া সে দ্রুতবেগে পলাইল। এই ঘটনার অল্পকাল পরে এক পশ্চিমদেশীয়

সাধুর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার সঙ্গে তাঁহারা একটি গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তথায় আসন লাগাইয়া তাঁহারা গ্রামের মধ্যে ভিক্ষায় গেলেন। কিন্তু গ্রামটি বড় গরীব, তাই ভিক্ষার কিছুই পাওয়া গেল না। শেষে পশ্চিমা সাধুটির সাহায্যে তাঁহারা যৎসামান্য খাদ্য সংগ্রহ করিয়া তিন দিন অনাহারের পর আহার করিলেন। এইস্থান হইতে স্বামী তুরীয়ানন্দ একাকী চলিয়া এবং আপন মনে তীর্থাদি দর্শন করিয়া মুসুরী পাহাড়ের পাদদেশ রাজপুরে আসিয়া তপস্যাদিতে নিমগ্ন হইলেন।

রাজপুর দেরাদুন হইতে মুসুরী পাহাড়ে যাইবার পথে অবস্থিত। দেরাদুনের একজন সি. আই. ডি. পুলিস তথায় স্বামী তুরীয়ানন্দকে অনুসরণ করে। জিজ্ঞাসিত হইয়া দুইবার তিনি উক্ত পুলিসটিকে স্বীয় নাম ও সংবাদ দিলেন। পুলিস যখন তৃতীয়বার তাঁহাকে অনুসরণ করিল, তখন তিনি বিরক্ত হইয়া তাহাকে পূর্বদত্ত বিবরণ দেখিতে বলিলেন। কিন্তু পুলিসটি তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিল না। ইহাতে বিরক্ত হইয়া তুরীয়ানন্দজী তাহাকে তীব্র তিরস্কার করিলেন। তিরস্কৃত হইয়া সে বলিল, "আপনি কি পুলিসকে ভয় করেন না?" এই কথা শুনিয়া হরি মহারাজ গর্জিয়া উঠিলেন, "আমি যমকেও ভয় করি না, পুলিসকে ত দূরের কথা!" পুলিসটি বুঝিল, সে কাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। তখন সে নরম হইয়া বলিল, "আপনি সাধু; আপনার ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নয়।" হরি মহারাজ উত্তর দিলেন, "আমার কর্তব্য আমি বেশ বুঝি। তুমি তোমার পথ দেখ।" পরে এই ব্যক্তি তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত হইয়াছিল।

দেরাদুনে এক অভিজ্ঞ জ্যোতির্বিৎ স্বামী তুরীয়ানন্দের নিকট ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন যে, তিনি শীঘ্রই তাঁহার এক প্রাণপ্রতিম প্রিয়

বন্ধুর সহিত মিলিত হইবেন। আশ্চর্যের বিষয়, কয়েকদিনের মধ্যেই স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী অখণ্ডানন্দের সহিত উত্তরাখণ্ড-পর্যটনে বাহির হইয়া সেপ্টেম্বর মাসে আলমোড়ায় স্বামী সারদানন্দের সহিত মিলিত হন। গুরুভ্রাতৃত্রয় আলমোড়া হইতে টিহিরী ঘুরিয়া উক্ত বৎসরের শেষে রাজপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পুনর্মিলনে গুরুভ্রাতা-চতুষ্টয়ের আনন্দের সীমা রহিল না।

রাজপুর হইতে স্বামী তুরীয়ানন্দ অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের সহিত হৃষীকেশে গেলেন। সেখানে স্বামী বিবেকানন্দ অসুস্থ হইয়া পড়েন। একদিন তাঁহার অবস্থা খুব খারাপ হওয়ায় সকলে কাতরভাবে ঠাকুরকে ডাকিতে লাগিলেন এবং স্বামী তুরীয়ানন্দ 'সংকটা-স্তোত্র' পাঠ করিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ সুস্থ হইলে সকলে মিলিয়া ১৮৯১ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে কনখলে তপস্যানিরত স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকট উপস্থিত হন।

ব্রহ্মানন্দজীকে সঙ্গে লইয়া সকলে সাহারাণপুরে যান এবং তথা হইতে মীরাটে যাইয়া স্বামীজীর স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য মার্চ মাস পর্যন্ত অবস্থান করেন। মীরাটে তাঁহারা সকলে সরকারী ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষের অতিথি হন। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী শিষ্যগণ যেখানে থাকিতেন সেইখানেই সাধনভজন ও শাস্ত্রচর্চার প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইত। মীরাটেও তদ্রূপ ভাবস্রোত বহিল। স্বামীজী সুস্থ হইয়া তথা হইতে একাকী দিল্লী যান। স্বামী তুরীয়ানন্দপ্রমুখ গুরুভ্রাতারা উদ্বিগ্ন হইয়া কয়েকদিন পরে দিল্লী যাইয়া তাঁহার সহিত পুনরায় মিলিত হন। দিল্লী হইতে স্বামীজী অন্যান্য গুরুভাইদের ফেলিয়া একাকী অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

তীর্থভ্রমণ ও তপস্যা

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দকে স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গ করিতে বলিয়াছিলেন। ঠাকুরের এই নির্দেশ যথা-সময়ে সত্য হইয়াছিল। গুরুভ্রাতৃদ্বয় প্রায় ছয় বৎসর একত্রে থাকিয়া নানা তীর্থ ভ্রমণ এবং তপস্যা করিয়াছিলেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে দিল্লীতে ব্রহ্মানন্দজী তুরীয়ানন্দজীকে বলিলেন, "জ্বালামুখী দেখতে ইচ্ছা হয়েছে। যদি আপনি যান তো যাই।" হরি মহারাজ সানন্দে সম্মত হওয়ায় উভয়ে জ্বালাজী যাত্রা করিলেন। জ্বালামুখী তীর্থ পাঞ্জাব প্রদেশের কাংড়া উপত্যকায় অবস্থিত। ইহা বাহান্ন দেবীপীঠের অন্যতম। প্রবাদ আছে, সতীর জিহ্বা তথায় পড়িয়াছিল। উক্ত তীর্থে কোন দেবীমূর্তি নাই। পাহাড়ের উপর একটি কুণ্ড আছে, উহার উপর মন্দির নির্মিত। কুণ্ডের মধ্যস্থল হইতে একটি বৃহৎ অগ্নিশিখা লক্ লক্ করিয়া জ্বলিতেছে। কুণ্ডের চারিপাশে ও দেওয়ালেব গাত্রে স্থানে স্থানে কতকগুলি ক্ষুদ্র অগ্নিশিখা জ্বলিতেছে। এই শিখাগুলি জ্বালামুখী দেবীর জিহ্বারূপে পূজিত! তন্মধ্যে প্রধান শিখাটিই সমধিক সমাদৃত। জ্বালাজীর পূজা তন্ত্রমতে হয়। পূজাকালে ভক্তগণ 'জয় মহামায়ী,' 'জয় মহামায়ী' ধ্বনি উচ্চারণ করেন। পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধুদেশের হিন্দুগণের ইহা প্রসিদ্ধ তীর্থ। শারদীয়া ও বাসন্তী নবরাত্রির সময় সহস্র সহস্র হিন্দু নরনারী দেবীদর্শনে উক্ত তীর্থে সমবেত হয়। তখন জলন্ধর স্টেশনে নামিয়া হোসিয়ারপুরের মধ্য দিয়া যাইয়া পাহাড়ে চড়াই উৎরাই করিয়া জ্বালামুখীতে যাইতে হইত। স্বামী তুরীয়ানন্দ ব্রহ্মানন্দজীর সহিত উক্ত পথে জ্বালামুখী যাইয়া তথায় কিছুকাল তপস্যা করেন। তাঁহাদের কঠোর তপস্যায় মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ও স্থানীয় কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছিলেন।

জ্বালামুখী হইতে তপস্বিদ্বয় সুরম্য কাংড়া উপত্যকার নানাস্থানে ভ্রমণ করেন ও তপস্যায় রত হন। উক্ত উপত্যকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোরম। যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর দেখা যায় পর্বতগাত্রে সবুজ গমের ক্ষেত ধাপে ধাপে উঠিয়াছে এবং তাহাদের পার্শ্ব দিয়া অসংখ্য ঝরণা সশব্দে নিম্নে পতিত হইতেছে। গমক্ষেত্রের পশ্চাতে দূরে অভ্রভেদী তুষার-ধবল পর্বতমালা। শোনা যায়, ইহাই পুরাকালের গন্ধর্বপুরী। কাংড়ায় কুলু নামক একটি সুন্দর স্বাস্থ্যকর সুভিক্ষ স্থান আছে। সেইজন্য বহু সাধু কুলুতে যাইয়া তপস্যারত হন। তথায় শাক্ত-সাধনার বিকৃতরূপ প্রচলিত ছিল। ভৈরব-ভৈরবীগণ চক্রে বসিয়া সাধনচ্ছলে মদ্যপানাদি করিতেন। উক্ত তান্ত্রিকদের সঙ্গে পড়িয়া অনেক তপস্বী সাধু যোগভ্রষ্ট হইতেন। উল্লিখিত কারণে পাঞ্জাবের সাধুমহলে এই প্রবাদ প্রচলিত আছে, "যে যায় কুলু, সে হয় উল্লু!" ভৈরবগণ কর্তৃক একবার চক্রাধিপতি হইবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াও হরি মহারাজ কখন চক্রে যান নাই। গুরুভ্রাতার সহিত তিনি নির্জনে তপস্যা করিতেন এবং ভিক্ষা করিয়া খাইতেন। তদ্দর্শনে কুলুর সাধু ভক্ত নরনারীগণ তাঁহাদের জন্য ফল-মিষ্টান্নাদি আনিতেন এবং ধূপ দীপ জ্বালিয়া তাঁহাদিগকে দেবতাজ্ঞানে পূজারাত্রিক করিতেন। চতুর্দিকে তাঁহাদের সুনাম প্রচারিত হওয়ায় বহু নরনারী তাঁহাদিগকে দর্শন-প্রণামার্থ আসিতে লাগিল। লোকসমাগমে তপস্যার বিঘ্ন হওয়ায় তাঁহারা একদিন ভোরে কুলু ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

বৈজনাথ কাংড়া উপত্যকার একটি সুন্দর স্থান। স্বামী তুরীয়ানন্দ গুরুভ্রাতার সহিত সম্ভবতঃ কুলু হইতে বৈজনাথে আসেন এবং পাহাড়ের শিখরে অবস্থিত শিবমন্দিরে থাকিয়া তপস্যা করেন। তখন পাহাড়ের চারিদিকের গ্রামসমূহে বৃষ্টির অভাবে ভয়ানক জলকষ্ট

হইতেছিল। উক্ত অঞ্চলে অনাবৃষ্টি হইলে গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে একটি দিন স্থির করিয়া কুণ্ড হইতে ঘটি ঘটি জল তুলিয়া শিবের মাথায় ঢালিত। কুণ্ডটি পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত ছিল। ইহার জলও খুব খারাপ হইয়া গিয়াছিল। সেই জলই ঘটি ঘটি আনিয়া একদিন পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামের ছোটবড় সকলে মিলিয়া শিবের মাথায় ঢালিতে এবং বলিতে লাগিল, "বাবা বর্ষাও, বাবা বর্ষাও।" জলঢালা আরম্ভ হইল ভোর-রাত্রি হইতে। স্বামী তুরীয়ানন্দ গ্রামবাসীদের শিবভক্তি দেখিয়া প্রীত হইলেন এবং গুরুভ্রাতার সহিত শিবমন্দিরের একপাশে বসিয়া জপ করিতে করিতে বৃষ্টির জন্য মহাদেবকে আকুল প্রার্থনা জানাইলেন। এত নরনারীর আন্তরিক নিবেদন এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ সন্ন্যাসিদ্বয়ের প্রার্থনায় আশুতোষ অচিরে সন্তুষ্ট হইলেন। সেদিন খুব রৌদ্রদীপ্ত এবং আকাশ মেঘমুক্ত ছিল। সুতরাং সেদিন বৃষ্টি হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু বৈকালে আকাশের এককোণে হঠাৎ একটু কালমেঘ দেখা দিল এবং অবিলম্বে প্রচুর বৃষ্টিপাত হইল। গ্রামবাসীরা বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে মহানন্দে স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া গেল। ইহা দেখিয়া সাধুদ্বয়ের আনন্দের সীমা রহিল না। সরল বিশ্বাসে ও কাতর প্রার্থনায় অসম্ভব সম্ভব হইল।

বৈজনাথ হইতে তপস্বিযুগল পাঠানকোট, লাহোর, গুজরাণওয়ালা, মূলতান প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া সিন্ধুদেশে যান এবং সক্করে সাধুবেলায় অবস্থান করেন। সাধুবেলা সিন্ধুনদীর মধ্যবর্তী একটি ক্ষুদ্র মঠ। উক্ত মঠ উদাসী সাধুগণ কর্তৃক অধ্যুষিত ও পরিচালিত। মঠের মোহান্ত তাঁহাদের সাধনানুরাগ ও বিবেকবৈরাগ্য দেখিয়া সন্তুষ্ট হন এবং তাঁহাদিগকে বিশেষ যত্ন করেন। সক্কর হইতে সাধুদ্বয় করাচীতে উপস্থিত হন। করাচী হইতে হিংলাজ যাইবার ইচ্ছা

হরি মহারাজের হৃদয়ে বলবতী ছিল। এক শেঠ তাঁহার হিঙ্গলাজ-যাত্রার সব বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মানন্দজীর শরীর খারাপ হওয়ায় তাঁহার হিঙ্গলাজে যাওয়া হইল না। গুরুভ্রাতা সুস্থ হইলে তাঁহাকে লইয়া করাচী হইতে তিনি জাহাজে বোম্বাই গমন করেন। তথায় অপ্রত্যাশিত ভাবে স্বামীজীর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। স্বামীজী তখন অজ্ঞাতভ্রমণ শেষ করিয়া চিকাগো ধর্মমহাসভায় যাইবার জন্য তথায় উপস্থিত। অনেকদিন পরে সাক্ষাৎ হওয়ায় গুরুভ্রাতারা পরম প্রীতিলাভ করিলেন। তিনি ঐ দেশীয় এক বড় পণ্ডিতের বাড়ীতে অতিথি ছিলেন। তথায় গুরুভ্রাতৃদ্বয় তাঁহার সহিত একদিন দেখা করিতে যান। স্বামীজী সাধারণ থেলো হুঁকো হাতে করিয়া তামাক খাইতেছিলেন। তিনি গুরুভ্রাতাদ্বয়কে দেখিয়া হুঁকোটি হাতে লইয়াই তাঁহাদের কাছে ছুটিয়া আসিলেন এবং মহানন্দে কথাবার্তা বলিলেন। স্বামীজী তাঁহাদিগকে দেখিয়া মুখে এই শ্লোকটি আওড়াইতে লাগিলেন—

অভিমানং সুরাপানং গৌরবং ঘোররৌরবম্।
প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা তস্মাৎ এতত্রয়ং ত্যজেৎ ॥[১]

একটু পরে বলিলেন, "হরি ভাই, এর বাড়ীতে আর থাকব না। এ তোমাদিগকে তত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখবে না। এ উপাধিধারী বড় পণ্ডিত। চল, অমুকের বাড়ীতে যাই। সে আমাদের সকলকেই খুব আদর করে রাখবে।" এই পণ্ডিতের অভিমান দেখিয়াই স্বামীজী উক্ত শ্লোকটি বলিয়াছিলেন। অনন্তর গুরুভ্রাতৃত্রয় কালীপদ ঘোষের

১ অহঙ্কার মদ্যপানবৎ, গৌরব রৌরব-নরকে বাসতুল্য এবং প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠার মত হেয়। সেইজন্য এই তিনটি ত্যাগ করা উচিত।

বাড়ীতে চলিয়া গেলেন এবং তথায় পরমানন্দে কয়েক দিন কাটাইলেন। কালীপদ বাবু ঠাকুরের পরম ভক্ত ছিলেন। তাঁহাকে সকলে 'কালীদাদা' বলিতেন। তিনি তখন চাকুরী লইয়া বোম্বাইতে অবস্থান করিতেন। তিনি সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাদিগকে মোটরে লইয়া শহর দেখাইয়াছিলেন। বোম্বাইতে স্বামীজী তুরীয়ানন্দজীকে বলিয়াছিলেন, "হরি ভাই, এত তপস্যাদি করলুম, তবু ধর্ম-টর্ম ত কিছুই বুঝতে পারলুম না। তবে দেখছি, ভারতভ্রমণ করে আমার heart (হৃদয়টা) খুব বেড়ে গেছে। দেশের দীন-দুঃখীদের জন্য প্রাণটা কাঁদছে। সকলের জন্য খুব feel (সমবেদনা অনুভব) করছি। তাই, আমেরিকায় যাচ্ছি। দেখি, এদের জন্য সেখানে কি করতে পারি।"

তখন ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগ। স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিতেন, "আমেরিকাযাত্রার পূর্বে স্বামীজীর ভাস্বর মুখমণ্ডল দেখিয়া মনে হইয়াছিল তিনি সাধনা শেষ করিয়াছেন এবং জগতের নিকট গুরুর বাণী প্রচার করিবার জন্য যাইতেছেন।" আর একদিন স্বামীজী তুরীয়ানন্দজীকে বলিয়াছিলেন, "হরি ভাই, আমেরিকা যাচ্ছি। ওখানে যা-কিছু হচ্ছে শুনছ, সব (নিজের বুক চাপড়াইয়া) এর জন্য। এর জন্যই সব হচ্ছে।" হরি মহারাজ তপঃসিদ্ধ গুরুভ্রাতার অন্তর্দৃষ্টি দেখিয়া অবাক হইলেন। বোম্বাই-এ অবস্থানকালে স্বামীজীর নিকট সন্ধ্যায় বহুলোকের সমাগম হইত। স্বামীজী তাঁহাদিগকে ধর্মপ্রসঙ্গ শুনাইতেন। একদিন স্বামীজীর শরীর অসুস্থ হওয়ায় তিনি তুরীয়ানন্দজীকে বলিলেন, "হরি ভাই, আমার শরীরটা তত ভাল নেই। আজ এদের তুমি কিছু বল, আমি শুয়ে শুয়ে শুনি।" অনিচ্ছা সত্ত্বেও হরি মহারাজ বাধ্য হইয়া সমবেত নরনারীদের নিকট ধর্মালোচনা করিলেন। বলিতে বলিতে তিনি উত্তেজিত হইয়া ত্যাগ-বৈরাগ্যের কথাই বেশী বলিয়া ফেলিলেন।

এই ধর্মপ্রসঙ্গ শুনিয়া স্বামীজী হরি মহারাজকে বলিলেন, "এই সংসারীদের কঠোর ত্যাগ ও তীব্র বৈরাগ্যের কথা শুনালে কেন? তুমি তপস্বী সন্ন্যাসী, কিন্তু এরা ত গৃহী। এদের উপযোগী তোমার কিছু বলা উচিত ছিল। এসব কথা শুনে এরা ঘাবড়ে যাবে, বিচলিত হবে। এরা যা ধরতে বুঝতে পারে তা বললে ভাল হতো।" এইসব বলিয়া স্বামীজী হরি মহারাজকে মৃদু ভর্ৎসনা করিলেন। তখন হরি মহারাজ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমার মাথায় ছিল যে আপনি রয়েছেন, আপনি শুনছেন। অতএব যা তা বলা চলে না। বেশী ভাল কথা বলতে গিয়ে এই গোল হয়ে গেল।

আমেরিকাযাত্রার পূর্বে স্বামীজীকে একবার রাজপুতানার অন্তর্গত খেতড়ী রাজ্যে যাইতে হইল মহারাজার সনির্বন্ধ অনুরোধে। বোম্বাই হইতে গুরুভ্রাতৃত্রয় ট্রেনে একত্রে আবু রোড স্টেশন পর্যন্ত আসিলেন। তথায় স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ নামিয়া আবু পাহাড়ে গেলেন এবং স্বামীজী খেতড়ী চলিলেন। কয়েকদিন পরে স্বামীজী খেতড়ী হইতে গুরুভ্রাতৃদ্বয়কে তার করিলেন আবু রোড ষ্টেশনে আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য। তাঁহারা তার পাইয়া নির্দিষ্ট দিবসে গরুর গাড়ী করিয়া স্টেশনে আসিলেন। স্বামীজী তাঁহাদিগকে দেখিয়া সানন্দে ট্রেন হইতে নামিয়া কথাবার্তা বলিলেন। তাঁহার সব দিকে নজর ছিল। কথায় কথায় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি গরুর গাড়ীতে এলে? গরুর গাড়ীতে খড়ের গদি দিয়েছিলে ত?" যখন তিনি শুনিলেন তাঁহারা গরুর গাড়ীতে খড়ের গদি দিয়া আসেন নাই বলিয়া ঝাঁকুনিতে তাঁহাদের গা ব্যথা হইয়াছে তখন বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "চার আনা পয়সা দিলেই গাড়োয়ান খড়ের গদি করে দিত, আর তোমরা আরামে আসতে পারতে। আমাদের এমন বদ্ অভ্যাস

যে, সামান্য জিনিস মাথায় খেলে না, সব বিষয়ে খেয়াল থাকে না।" ট্রেনে উঠিবার সময় স্বামীজী হরি মহারাজকে বলিলেন, "তুমি রাজাকে ছেড়ে দাও। সে একলা বেড়াক। তুমি মঠে ফিরে গিয়ে ঠাকুরের কাজ কিছু কর এবং মঠের উন্নতির চেষ্টা দেখ।"

আবু রোড স্টেশনে স্বামীজী গুরুভ্রাতৃদ্বয়কে সংঘবদ্ধ হইয়া ঠাকুরের অপূর্ব ভাব সাধন ও প্রচার করিবার জন্য বিশেষ নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা আরও কিছুকাল তীর্থভ্রমণ ও তপস্যা করেন। উভয়ে আবু পাহাড়ে ফিরিয়া যাইয়া পুনরায় তপস্যারত হইলেন। স্বামীজীর নির্দেশ পাইয়াও হরি মহারাজ ব্রহ্মানন্দজীকে একাকী ফেলিয়া যাইতে পারিলেন না। তিনি প্রিয় গুরুভ্রাতাকে ভিক্ষা করিয়া খাওয়াইতেন এবং অন্যান্য ভাবে তাঁহার সেবা করিতেন। কিছুদিন পরে উভয়ে আবু রোডে নামিয়া আসিলেন। সেখানে অখণ্ডানন্দজীর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। কয়েক দিবস তথায় কাটাইয়া তিনজনেই আজমীরে উপস্থিত হইলেন। আজমীর শহরের ৫।৬ মাইল দূরে পুষ্করতীর্থ। পুষ্করে তাঁহারা সাবিত্রী পাহাড় ও ব্রহ্মার মন্দিরাদি দর্শন করিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ তীর্থভ্রমণকালে অনেকবার চাতুর্মাস্য করিয়াছিলেন। সাধুরা বৎসরের আট মাস নানাতীর্থে ভ্রমণ এবং বর্ষার চারি মাস এক স্থানে থাকিয়া শাস্ত্রাদি পাঠে রত থাকেন। তুরীয়ানন্দজী দুষ্কর তীর্থ পুষ্করে একবার চাতুর্মাস্য করেন। সেই সম্বন্ধে পরে বলিয়াছিলেন, "'পুষ্করং দুষ্করং' তীর্থ। ভারি সুন্দর, খুব একান্ত। বড় আনন্দ হতো।" পুষ্কর হইতে সেবার ব্রহ্মানন্দজীর সহিত তিনি জয়পুরে গেলেন এবং তথায় সর্দার হরি সিং-এর গৃহে মাসাবধি কাটাইলেন। জয়পুর হইতে অখণ্ডানন্দজী খেতড়ীতে এবং হরি মহারাজ ব্রহ্মানন্দজীর সহিত বৃন্দাবনে যাত্রা করেন। বৃন্দাবনধামে আসিয়া তুরীয়ানন্দজী ভক্তিভাবে মাতোয়ারা

হইয়া ব্রহ্মানন্দজীকে বলিলেন, "আজ ভিক্ষায় যাব না। দেখি, রাধারাণী আমাদের খাওয়ান কি-না।" এই বলিয়া উভয়ে সাধনভজনে তন্ময় হইলেন। ক্ষুধাতৃষ্ণা অগ্রাহ্য করিয়া সমগ্র দিন ও রাত্রি জপ-ধ্যান-পাঠে কাটাইলেন। পরদিন বেলা নয়টার সময় জনৈক ভক্ত অযাচিতভাবে তাঁহাদের জন্য প্রচুর আহার্য আনিলেন। তখন উপবাসী সাধুদ্বয় রাধা-রাণীকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনান্তে আনীত আহার্য ভক্ষণ করিলেন।

সেইবার তাঁহারা বৃন্দাবনে প্রায় ছয় মাস ছিলেন। উভয়ে কঠোর তপস্থায় এত নিমগ্ন থাকিতেন যে, তাঁহাদের মধ্যে কয়েক দিন হয়ত আদৌ কথাবার্তা হইত না। তখন শীতকাল। হরি মহারাজের গায়ে সূতার কাপড় ও সূতার জামা ভিন্ন কোন গরম জামা-কাপড় ছিল না। কিন্তু তাঁহার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। গরম জামা-কাপড়ের অভাবে রাত্রে শীতের জন্য ভাল ঘুম হইত না, রাত দুই-তিনটার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। তখন উঠিয়া পাতকুয়ার জল তুলিয়া স্নান করিতেন। পাত-কুয়ার জল রাত্রে একটু গরম থাকে। তাই সেই জলে স্নান করিলে কিঞ্চিৎ আরাম বোধ হইত। তৎপরে তিনি ধ্যানে বসিতেন। ধ্যান জমিলে ঘাম বাহির হইয়া যাইত। কিন্তু অন্য সময় শীত শরীরের উপর তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে ছাড়িল না। শীতের প্রকোপে তাঁহার মুখ হাত পা এবং শরীরের কোন কোন স্থান ফাটিয়া রক্ত পড়িত।

একদিন এক বৃদ্ধ সাধু শয়নকালে একখানি কম্বল আনিয়া তাঁহার গায়ে জড়াইয়া দিয়া বলিলেন, "মহাত্মাজী, আপনাকে দয়া করে রাত্রে এই কম্বলটি গায়ে দিতে হবে। নচেৎ আপনার অসুখ হতে পারে। আমার আরও দুই-তিনটা কম্বল আছে, এখানি কাজে লাগে না।" "আমার প্রয়োজন নাই" বলিয়া প্রথমে হরি মহারাজ আপত্তি করিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ সাধুর আন্তরিকতা দেখিয়া তিনি প্রীতির উপহার প্রত্যাখ্যান

করিতে পারিলেন না। সাধুর নির্বন্ধাতিশয়ে কম্বলটি লইয়া ব্যবহার করিলেন এবং শীতের রাত্রে প্রচুর আরাম বোধ করিলেন। বৃদ্ধ সাধুটি খুব ত্যাগী ও প্রেমিক ছিলেন।

বৃন্দাবনে কিছুদিন বাস করিবার পর এই দুই গুরুভাই ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায় গিয়াছিলেন। উভয়ে পদব্রজে রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, নন্দগ্রাম, বর্ষাণা প্রভৃতি স্থান দেখিয়া কুসুমসরোবরে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহারা কিছুদিন তপস্যারত ছিলেন। বৃন্দাবনেও হরি মহারাজ স্বয়ং ভিক্ষা করিয়া ব্রহ্মানন্দজীকে খাওয়াইতেন। তিনি তাঁহার এই গুরু-ভ্রাতাকে কখনও ভিক্ষায় যাইতে দিতেন না। একদিন কুসুমসরোবরে তিনি ভিক্ষায় কয়েকখানি শুষ্ক রুটি পাইলেন, কোন তরকারি বা গুড় পাইলেন না। কোন কূপের পাশে উভয়ে বসিয়া সেই রুটি জলে ডুবাইয়া খাইতে লাগিলেন। খাইতে খাইতে হরি মহারাজ গুরুভ্রাতাকে বলিলেন, "মহারাজ, আপনাকে ঠাকুর কত স্নেহযত্ন করতেন এবং ক্ষীর সর ননি খাওয়াতেন। আর আজ আমি আপনাকে শুষ্ক রুটি খাওয়াচ্ছি।" ইহা বলিতে বলিতে তিনি ভাবাবেগে অশ্রুসিক্ত হইলেন। ব্রহ্মানন্দজীর ন্যায় তুরীয়ানন্দজীও ব্রজধামে ব্রজভাবে অহর্নিশ বিভোর থাকিতেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দ তীর্থভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর শাস্ত্রালোচনাও করিতেন। বৃন্দাবনে ভক্তিশাস্ত্র খুব পড়িয়াছিলেন। তথায় রঘুনাথজীর মন্দিরে এক বৈষ্ণব সাধক ছিলেন, তাঁহার সঙ্গে তিনি ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। ব্রজবাসিগণের ভক্তিভাবদর্শনে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বৃন্দাবনে কঠোর তপস্যার ফলে হরি মহারাজের যেসকল অলৌকিক দর্শনাদি হইয়াছিল তন্মধ্যে দুই-একটির বিষয় তিনি কথাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছিলেন। রাধারাণীর দর্শনমানসে তিনি মাঝে মাঝে ব্যাকুলহৃদয়ে নিধুবনে যাইতেন। এই সময় একদিন তমালবৃক্ষের শাখায়

তিনি শ্রীরাধার আলুলায়িত বেণী দর্শন করেন। প্রথমে ইহাকে ময়ূরপুচ্ছ বলিয়া তাঁহার ভ্রম হয়। কিন্তু মুহূর্তমধ্যে তিনি বুঝিতে পারিলেন, ইহা রাধারাণীর বেণী। এইরূপে তপস্বী সাধক শ্রীরাধার দর্শনলাভে ধন্য হন।

বৃন্দাবনে তপস্যাকালে স্বামী তুরীয়ানন্দ উদরপূর্তির জন্য মাধুকরীর উপর নির্ভর করিতেন। কিন্তু তখন উক্ত তীর্থে ভাল মাধুকরী পাওয়া যাইত না। ২৫।৩০ দ্বারে ঘুরিয়া যে ভিক্ষা মিলিত তাহা একবেলার পক্ষেও যথেষ্ট হইত না, কারণ লোকে টুক্‌রা টুক্‌রা রুটি ভিক্ষা দিত। একদিন সাধনভজনান্তে তিনি ভিক্ষায় বহির্গত হইয়া অনেক বাড়ীতে ঘুরিলেন এবং টুক্‌রা টুক্‌রা রুটি যাহা পাইলেন তাহা একবেলার পক্ষেও যথেষ্ট হইল না। তিনি আরও কয়েক বাড়ীতে গেলেন, কিন্তু সেদিন আবশ্যকীয় ভিক্ষা পাওয়া গেল না। তখন শরীরের উপর তাঁহার খুব ধিক্কার জন্মিল। ভিক্ষাসমাপনান্তে কুয়ার ধারে বসিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা রুটি জলে ভিজাইয়া মুখে দিবার সময় স্বীয় দেহকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "শালা শরীর! তোর জন্যেই ত আমার এত কষ্ট! এই খা।" আহারান্তে অতৃপ্ত ক্ষুধায় ও ভিক্ষাটনশ্রমে ক্লান্ত হইয়া কেশীঘাটে শুইয়া পড়িলেন এবং অচিরে নিদ্রাভিভূত হইলেন। নিদ্রিত অবস্থায় তাঁহার এই অলৌকিক অনুভূতি হইল—"আমি দেহ নহি। আমি দেহ হইতে স্বতন্ত্র ক্ষুধাতৃষ্ণারহিত আত্মা। দেহটা জীর্ণবস্ত্রবৎ আলাদা পড়ে আছে।" নিদ্রাভঙ্গের পর দেখিলেন, তাঁহার সকল ক্লান্তি তিরোহিত এবং দেহ এত হাল্‌কা যে, মনে হইল যেন শরীর নাই। তিনি আনন্দে ভরপুর হইলেন। তখন হইতে তাঁহার দেহবোধ খুব কমিয়া গেল।

মথুরায় এক সাধুভক্ত শেঠ ছিলেন। তথায় কোন নূতন সাধু গেলেই তিনি তাঁহাকে স্বগৃহে আনিয়া খাওয়াইতেন। তিনি সাধুকে যে

আহার্য দিতেন তাহা বাজার হইতে কিনিয়া আনিতেন, বাড়ীতে প্রস্তুত করিতেন না। স্বামী তুরীয়ানন্দ যখন মথুরাতে গেলেন তখন সাধুরা তাঁহাকে উক্ত সাধুভক্তের সন্ধান দিলেন। তিনি অন্যান্য সাধুদের সহিত তাঁহার বাড়ীতে গেলেন এবং ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন। সাধুদের সেবা শেষ হইলে শেঠজী সাধুসঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে স্বামী তুরীয়ানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, বৈরাগ্য হয় কিসে?" তুরীয়ানন্দজী ক্ষিপ্র উত্তর দিলেন, "আমার যদি বৈরাগ্য থাকত, তোমাকে বলতে পারতাম কিসে বৈরাগ্য হয়। বৈরাগ্য থাকলে কি আর তোমার এখানে খেতে আসি?" সমবেত সাধুগণ স্বামী তুরীয়ান্দের এই বৈরাগ্য-ব্যঞ্জক উত্তর শুনিয়া অতিশয় খুশী হইলেন এবং শেঠজী আর প্রশ্ন করিলেন না।

বৃন্দাবনে অবস্থানকালে ১৮৯৩ খ্রীঃ শেষভাগে আলমবাজার মঠ হইতে লিখিত এক পত্রে তিনি চিকাগোতে স্বামী বিবেকানন্দের অদ্ভুত সাফল্যের সংবাদ জানিতে পারিলেন। মঠে যাইয়া কাজ করিবার জন্য তাঁহার কাছে পুনঃ পুনঃ জরুরি পত্র আসিতে লাগিল। ১৮৯৪ খ্রীঃ প্রথমভাগে বৃন্দাবন হইতে গুরুভ্রাতৃদ্বয় লক্ষ্ণৌ গমন করেন এবং সেখান হইতে উভয়ে স্বামীজীকে আমেরিকায় পত্র দেন। সেই বৎসর গ্রীষ্মকালে সম্ভবতঃ জুন মাসে টিহিরী যাইবার পথে স্বামী শিবানন্দ লক্ষ্ণৌ-এ উপস্থিত হন। অনেকদিন পরে সাক্ষাৎ হওয়ায় গুরুভ্রাতাদের মধ্যে খুব কথাবার্তা হইতে লাগিল। যে বাড়ীতে তাঁহারা থাকিতেন উহার ছাদে বসিয়া গুরুভ্রাতৃত্রয় অনেক রাত্রি পর্যন্ত আলাপ করিতেন। একরাত্রে গল্প করিতে করিতে তিনটা বাজিয়া গিয়াছিল। স্বামী শিবানন্দ তাঁহাদিগকে আলমবাজার মঠে যাইতে অনুরোধ করায় হরি মহারাজ বলিলেন, "এখন যাব না।"

তখন স্বামী শিবানন্দ বলিলেন, "সেকি ? স্বামীজী লিখেছেন ; তোমরা যাবে না ?" তখন হরি মহারাজ উত্তর দিলেন, "আপনি তো এখন ওদিকে যাচ্ছেন। আপনি ওদিক থেকে ফিরে আসুন। তারপর দেখা যাবে।" স্বামী শিবানন্দ টিহিরী হইতে ফিরিয়া বর্ষাকালে ফৈজাবাদে আসেন। তথায় হরি মহারাজের সহিত তাঁহার পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। মহাপুরুষজীর অনুরোধে হরি মহারাজ আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসেন।

আমেরিকায় স্বামীজীর অপূর্ব সাফল্যের সংবাদ ভারতে প্রচারিত হইবার পর আলমবাজার মঠে লোক-সমাগম বাড়িতে লাগিল। দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ স্বামীজীর গুরুভ্রাতাদের অনুসন্ধান করিলেন। মঠে যাঁহারা আসিতেন তাঁহাদের সহিত হরি মহারাজ ধর্মপ্রসঙ্গ করিতেন এবং নবাগত ব্রহ্মচারীদের শাস্ত্রাদি পড়াইতেন। ব্যক্তিগত তপস্যা ও স্বাধ্যায় পূর্ববৎ অব্যাহত রহিল। ১৮৯৫ খ্রীঃ স্বামীজী আমেরিকা হইতে আলমবাজারে পত্রে লিখিয়াছিলেন, মঠে প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় হরি মহারাজ প্রভৃতি যেন শাস্ত্র পাঠ করেন। উক্ত বৎসর তিনি শশী মহারাজকে পত্রে লিখেন, "হরি ও রাখাল কেমন আছে ? উভয়কে আমার বিশেষ বিশেষ প্রণাম আলিঙ্গন জানাইবে এবং তাহাদের বিশেষ যত্ন করিবে।" ১৮৯৬ খ্রীঃ আবার তিনি ইংলণ্ড হইতে পত্রে নির্দেশ দিতেছেন, "হরি প্রভৃতি পর্যায়ক্রমে মঠে পড়াবার ও উপদেশ দিবার ভার লউক।" স্বামীজীর নির্দেশ-মত হরি মহারাজ কাজ করিতেন। এইরূপে আলমবাজার মঠ ধীরে ধীরে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

স্থানীয় লোকে আলমবাজার মঠের বাড়ীটিকে 'ভূতের বাড়ী' বলিতেন। ইহার কারণ, পূর্বে কেহ উক্ত বাড়ীতে আত্মহত্যা

করিয়াছিল। এক সন্ধ্যায় স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামীজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথের সহিত বেড়াইতে যাইবার জন্য সদর দরজার বাহিরে আসিলেন। তিনি বাহিরে আসিবামাত্র দেখিলেন, কে একজন মঠের ভিতরে ঢুকিয়া গেল। হরি মহারাজ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া মঠের মধ্যে গেলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন বুঝিলেন, তিনি ভূত দেখিয়াছেন এবং বাড়ীটিকে লোকে যে 'ভূতের বাড়ী' বলে তাহা মিথ্যা নয়।

স্বামী তুরীয়ানন্দ আর একটি সাধুর সঙ্গে নাগ মহাশয়কে দর্শন করিবার জন্য নারায়ণগঞ্জের সমীপে দেওভোগে গিয়াছিলেন। তখন বর্ষাকাল। গ্রামের মাঠ ও পথ জলে ডুবিয়া যাওয়ায় দেওভোগ গ্রাম এক বিশাল জলরাশিতে পরিণত। সাধুদ্বয় নৌকাযোগে একেবারে নাগ মহাশয়ের বাড়ীর মধ্যে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। নাগ মহাশয় সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাকে দেখিয়া 'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনি করিতে করিতে জলে লাফাইয়া পড়িলেন এবং সংজ্ঞাহীন হইলেন। সাধুযুগল সযত্নে তাঁহাকে জল হইতে তুলিলেন। দীর্ঘকাল পরে সাক্ষাৎ হওয়ায় হরি মহারাজ ও নাগ মহাশয় পরম প্রীতি লাভ করিলেন। নাগ মহাশয়ের পিতা পার্শ্বে একস্থানে বসিয়া জপ করিতেছিলেন। নাগ মহাশয় হাত জোড় করিয়া হরি মহারাজকে বলিলেন, "আশীর্বাদ করুন যেন বাবার ভক্তি হয়।" হরি মহারাজ উত্তর দিলেন, "ভক্তি তো তাঁর খুব আছে। সর্বদা ভগবানের নাম জপ কচ্ছেন; আর কি?" নাগ মহাশয় বলিলেন, "নোঙ্গর ফেলে দাঁড় টানলে হবে কি? উনি আমাকে বড় ভালবাসেন। জপ করলে কি হবে?" হরি মহারাজ বলিলেন, "আপনার মত ছেলেকে ভালবাসবেন না ত কাকে ভালবাসবেন?" নাগ মহাশয় উত্তর দিলেন, "ওকথা কেন বলেন?

ওকথা কেন বলেন? আমার উপর থেকে ভালবাসা যাতে যায় সেই আশীর্বাদ করুন।"

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্রাবলী হইতে জানা যায়, ১৮৯৬ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে আলমবাজার মঠে শশী মহারাজের অসুখ হওয়ায় তিনি ঠাকুরের পূজার ভার লইয়াছিলেন। সেবার তিনি পূর্ব বৎসরের ডিসেম্বর হইতে পরবর্তী বৎসরের প্রথম দুই-তিন মাস আলমবাজার মঠে ছিলেন। সেই বৎসর শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব দক্ষিণেশ্বরে অনুষ্ঠিত হয়। কোন ভক্তকে সে সম্বন্ধে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "উৎসব মহাসমারোহে ও নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। অন্যূন ত্রিশ হাজার নরনারী সমবেত হইয়া উৎসাহ ও ভক্তি-পূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার সংকীর্তন ও জয় ঘোষণা করিয়া দক্ষিণেশ্বর মন্দির আনন্দে প্লাবিত করিয়াছিল। এবারকার মহোৎসব অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা সর্বাংশেই উৎকৃষ্ট হইয়াছিল।" শশী মহারাজ ভাল হইবার পরে হরি মহারাজের আমাশয় হয়। সুস্থ হইয়া তিনি পুনরায় পরিব্রজ্যায় বাহির হইলেন এবং একাকী অনেক তীর্থ ভ্রমণ ও তপস্যা করিয়াছিলেন। উত্তর ভারতের তীব্র শীত তিনি একটি তুলার চাদরে কাটাইতেন এবং তীব্র গ্রীষ্মেও নগ্নপদে চলিতেন। একদা গ্রীষ্মকালের দ্বিপ্রহরে মাধুকরী করিয়া ফিরিয়া উত্তপ্ত শরীরে জল ঢালিয়া স্নান করেন। জল ঢালিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া যান। এলাহাবাদের নিকটবর্তী[১] কোন আম্রকাননে এই ঘটনা ঘটে। রাখাল বালকগণ গরুর গাড়ীতে করিয়া তাঁহাকে স্টেশনে লইয়া আসে। সৌভাগ্যক্রমে উক্ত প্রদেশের কোন সাধুভক্তের সেবাশুশ্রূষায় তিনি দুই দিনের মধ্যে সংজ্ঞালাভ

১ অন্য মতে চিত্রকূট পাহাড়ের অদূরে।

করেন। তিনি কখন কখন একবস্ত্রে থাকিতেন, কম্বলও সঙ্গে রাখিতেন না। এইরূপে উত্তর ভারতের প্রায় সমস্ত তীর্থ তিনি পর্যটন করেন।

এলাহাবাদ হইতে স্বামী তুরীয়ানন্দ পদব্রজে চিত্রকূট, রেওয়া, জব্বলপুর প্রভৃতি স্থান দেখিয়া নর্মদার দিকে গিয়াছিলেন। নর্মদা অঞ্চলে ঘুরিবার সময় একটি পয়সাও সঙ্গে রাখিতেন না, সম্পূর্ণ কপর্দকহীন থাকিতেন। ভ্রমণকালে তিনি একটি তীর্থ লক্ষ্য করিয়া চলিতেন। পথে পথচারীকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "অমুক তীর্থের রাস্তা কোন্‌টি ?" উজ্জয়িনীতে তিনি রাত্রে গাছতলায় শুইয়াছিলেন। ঝড়বৃষ্টি হইতেছিল, এমন সময় কে তাঁহার গায়ে হাত দিয়া ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিল। ঘুম হইতে উঠিবার পর গাছের ডালটা ভাঙ্গিয়া পড়িল। ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিলে তিনি শরণাগতকে এইভাবে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করেন। তপস্যা-প্রসঙ্গে স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিতেন, "আমরা তো ফকিরী করেছি, আমাদের তাতে শরীর খারাপ হয় নি। কেন না আমাদের সাধনভজন ছিল এবং তাতে খুব আনন্দ পেতাম।

স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বীয় মুখে বলিয়াছিলেন, তিনি যখন নিম্নোক্ত গান তিনটি গাহিতেন, তাঁহার চোখ দিয়া দরদরধারে জল পড়িত—

১। বিষয়-সুখে মন তৃপ্তি কি মানে।
তব চরণামৃতপানে পিপাসিত—
না চাহি ধনজনমানে॥

২। হৃদয়বল্লভ তুমি দীনশরণ।
প্রাণের প্রাণ তুমি প্রাণরমণ॥
সদানন্দ শিব তুমি সুন্দর শোভন।
সুন্দর যোগিজন-চিত্ত-বিমোহন॥

৩। হৃদয়নিকুঞ্জবনে বিহর মন দিবানিশি।
আমার হৃদয়মন আলো করে॥
প্রেম-তটিনীর তটে তব পদ নিকটে।
তুলি সুললিত তান, গাহিব তোমার গান॥
অমনি এসে সখা দিবে দেখা হৃদয়মাঝারে।

স্বামী তুরীয়ানন্দ সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত গীর্ণার পাহাড়েও কিছুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন। এই শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যবেষ্টিত পর্বতের এক গুহায় তিনি থাকিতেন। একবার গঙ্গাতীরে কোনও স্থানে তপস্যাকালে তাঁহার দেহ ব্যাধিগ্রস্ত হয় এবং সেজন্য তিনি ভীষণ কষ্ট পাইতে থাকেন। ব্যাধির উপশমের জন্য তিনি কোন বৈদ্যের নিকট যাইয়া চিকিৎসিত হইবার সঙ্কল্প করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বৈদ্যসমীপে যাইতেছিলেন। তখন তাঁহার মনে পড়িল, সাধুর 'ঔষধং জাহ্নবীতোয়ং বৈদ্যো নারায়ণো হরিঃ।' এই বৈরাগ্যোদ্দীপক শাস্ত্রবাক্য মনে পড়িবা-মাত্র তিনি আর অগ্রসর হইলেন না এবং গঙ্গাজল-ঔষধ ও হরি-বৈদ্য—ইহা স্মরণ করিতে করিতে তিনি কুঠিয়ায় ফিরিয়া আসিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, তিনি বিনা চিকিৎসায় সেবার অচিরে নিরাময় হইলেন।

উত্তরাখণ্ড যাইবার মানসে যখন হরি মহারাজ দিল্লীতে আসিয়াছিলেন তখন তথায় চান্দুলাল নামক কোন সাধুভক্ত শহরের বাহিরে যমুনাতীরে অবস্থিত উদ্যানবাটীতে তাঁহাকে রাখিয়া সেবা করেন। উক্ত ব্যক্তি বলেন, "স্বামী তুরীয়ানন্দের তেজঃপুঞ্জ কলেবর দেখিয়া মন স্বভাবতঃই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইত। প্রত্যহ স্নানাদি সমাপনান্তে প্রাতর্ভোজন করিয়া তিনি নিকটবর্তী গ্রন্থাগারে যাইতেন এবং মধ্যাহ্নের পূর্বে চান্দুলালের বাড়ীতে যাইয়া ভিক্ষা লইতেন। ভোজনান্তে কিছুক্ষণ

চান্দুলালের সহিত ধর্মপ্রসঙ্গ করিয়া আবার পূর্বোক্ত গ্রন্থালয়ে যাইতেন এবং তথায় সন্ধ্যা পর্যন্ত অধ্যয়নে নিমগ্ন থাকিয়া স্বীয় কুটীরে ফিরিতেন এবং জপধ্যানে বসিতেন। তিনি রাত্রে সামান্যই আহার করিতেন; রাত্রি তিনটা হইতে ভোর পর্যন্ত ধ্যানস্থ থাকিতেন। তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক কাজটি ঘড়ির কাঁটার মত চলিত।"

উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বার, হৃষীকেশ ও উত্তরকাশী প্রভৃতি স্থানে হরি মহারাজ দীর্ঘকাল তপস্যারত ছিলেন। হৃষীকেশে তিনি বহু তপস্যা করিয়াছিলেন। ১৮৮৯ খ্রীঃ যখন তিনি তথায় ছিলেন তখনকার কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ১৮৯১ খ্রীঃ তথায় অবস্থানকালে স্বামীজী অসুস্থ হন। তৎপরেও তিনি অনেকবার হৃষীকেশে তপস্যা করেন। ১৯১৪ খ্রীঃ তথায় ৫।৬ মাস ছিলেন। তিনি যখন হৃষীকেশে তপস্যা করিতেন তখন তথায় ছত্র ছিল না। তখন স্থানটি জনবিরল ছিল, কেবল তপস্বী সাধুরা তথায় থাকিতেন। একদিকে গঙ্গা, অন্যদিকে চন্দ্রভাগা, এবং আর একদিকে গঙ্গার খাড়ি। এইরূপ ত্রিকোণাকৃতি স্থানকে ঝারি বলা হয়। ইহা গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ এবং উচ্চ বৃক্ষে সমাকীর্ণ ছিল। সাধুগণ বৃক্ষ হইতে ডালপালা কাটিয়া, জংলী বাঁশের খুঁটি বসাইয়া, তাহার উপর ডালগুলি দোচালার আকারে বাঁধিয়া তদুপরি উলু ঘাসের ছাউনি দিয়া কুঠিয়া তৈয়ার করিতেন। গাছের ডালপালা ও পাতার বেড়া দিয়া কুঠিয়ার দেওয়াল হইত। উহাতে থাকিত ঝাঁপের দরজা। কুঠিয়ার মধ্যে একটি স্থান মাটি দিয়া উঁচু করিয়া উহার উপর খড় বিছাইয়া শয়নের স্থান করা হইত। এইরূপ পর্ণকুটীরে একটিমাত্র কম্বল, একজোড়া কৌপিন, একটি বহির্বাস ও একটি মাটির কলসী সম্বল করিয়া সাধুরা তপস্যা করিতেন, ভগবৎকৃপায় যাহা জুটিত তাহাই খাইতেন, ভিক্ষাটনে যাইতেন না।

সাধু ব্যতীত অন্য কেহ সেই ঝাড়িতে থাকিতে পারিতেন না। ভক্তগণ নির্দিষ্ট সময়ে যাইয়া সাধুদর্শন ও সেবা করিয়া চলিয়া আসিতেন। বর্ষাকালে গঙ্গার খাড়ি ও চন্দ্রভাগা জলপূর্ণ হইত। তখন ভক্তগণের তথায় যাওয়া বন্ধ হওয়ার জন্য সাধুদের আহারও অনিশ্চিত হইত; এইরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে সাধুগণ ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকিতেন এবং সর্বদা ধ্যানজপ, শাস্ত্রপাঠ ও তত্ত্বালোচনাদিতে কাটাইতেন। কঠোর ত্যাগ ও তীব্র বৈরাগ্য না থাকিলে এইরূপ অনিশ্চিত আহারে ও অত্যল্প আরামে কেহ তথায় টিকিতে পারিতেন না। স্বামী তুরীয়ানন্দ ঝাড়িতে স্বহস্তে উক্ত প্রকারে কুঠিয়া বাঁধিয়া তথায় দীর্ঘকাল উগ্র তপস্যা করেন। তাঁহার কঠোরতা, ধ্যানমগ্নতা, গভীর শাস্ত্রজ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি স্থানীয় সাধুবৃন্দকে অচিরে মুগ্ধ করিল। হৃষীকেশে তপস্যাকালে তিনি সাধুদের শাস্ত্রপাঠে একনিষ্ঠতা ও ইষ্টচিন্তায় অনুরাগ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। একবার দেখিলেন, কোন সাধু স্বীয় কুঠিয়ায় বসিয়া গীতার এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিতে করিতে স্বীয় পেটে হাত বুলাইতেছেন—

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্ ॥[১]

সাধুটির অজীর্ণ রোগ হইয়াছিল। উক্ত রোগ হইতে মুক্তিলাভের জন্য তিনি গীতোক্ত ভগবদ্বাক্যের অনুশীলন করিতেছিলেন। বলা বাহুল্য, ঈশ্বরে ও শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকায় তিনি এই উপায়ে অচিরে নিরাময় হইয়াছিলেন।

১ আমি উদরাগ্নিরূপে সকল প্রাণীর দেহে অবস্থানপূর্বক চারি প্রকার—চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়—ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ করি।

গাড়োয়ালে শ্রীনগর ঘাটে তপস্যার কথা তিনি পরে এইভাবে বলিতেন, "তখন মন নিরন্তর এক উচ্চ ভাবে আরূঢ় থাকত। তৈলধারাবৎ নিরবচ্ছিন্ন ভগবৎভাবস্রোত মনে প্রবাহিত হত। ভোরে উঠে বাহ্যে সেরে নেয়ে নিতাম ও তৎপরে ধ্যানে বসে যেতাম। ধ্যান থেকে উঠে শাস্ত্রাদি পাঠ করতাম। শাস্ত্রপাঠ সেরে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কিছু ভিক্ষা করে এনে খেতাম। একটু বিশ্রাম করে জপধ্যানে বসতাম গভীর রাত্রি পর্যন্ত। অন্য চিন্তা মনে আসতেই দিতাম না। সেখানে আমি (বড় বড় দুইখানা উপনিষদ্ ব্যতীত বাকী) আটখানা কণ্ঠস্থ করেছিলাম। উপনিষদ্ পড়তাম, আর ভাল ভাল শ্লোকগুলির উপর ধ্যান করতাম। সে যে কি বিপুল আনন্দ, কি বলব! শঙ্করভাষ্য ও আনন্দগিরির টীকাসহ উপনিষদ্ পড়তাম, আবার শ্লোকগুলির ধ্যান করে নূতন নূতন ভাবার্থ পেতাম।" গাড়োয়াল শ্রীনগরে থাকাকালীন স্বামী তুরীয়ানন্দ 'বিবেক-চূড়ামণি' নামক বেদান্ত গ্রন্থখানি উত্তমরূপে পড়িয়াছিলেন এবং উহার প্রত্যেকটি শ্লোকের উপর এত ধ্যান করিয়াছিলেন যে, বহু বৎসর পরেও গ্রন্থখানির অধিকাংশ অনর্গল আবৃত্তি করিতে পারিতেন।

টিহিরী গাড়োয়ালে তপস্যা করিবার সময় একটি ঘটনা ঘটে। তথায় তিনি জঙ্গলের পাশে একটি পোড়ো ঘরে থাকিতেন। বাঘ আসিলে গ্রামবাসী পাহাড়ীরা চীৎকার করিত ও টিন বাজাইত। একদিন রাত্রে বাঘ আসিয়াছে। গ্রামবাসীরা চীৎকার করিয়া মশাল জ্বালিয়া বাঘ তাড়াইতেছে। হরি মহারাজের পোড়ো ঘরটীর দরজা জানালা ভাঙ্গা ছিল। বাঘ আসিয়াছে শুনিয়া তিনি দরজার সম্মুখে দুই-তিন সারি ইট সাজাইলেন। তৎপরে ভাবিলেন, যাঁহার ইঙ্গিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে, যাঁহার ভয়ে 'মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ', তাঁহাকে স্মরণ না করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছি কেন?" ইহা ভাবিয়া সাজানো ইটের থাকটি তিনি

লাথি মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ধ্যানে বসিলেন এবং বহির্জগতের বিক্ষেপরাশি বিস্মৃত হইলেন। 'ধম্মপদে' মুমুক্ষু সাধুর প্রতি ভগবান বুদ্ধের এই অমৃত বাণী আছে—"বিনা পথে অগ্রসর হও। কোন কিছুকে ভয় করিও না, কোন কিছুর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিও না। গণ্ডারবৎ একাকী নির্ভয়ে বিচরণ কর। সিংহ যেমন কোন শব্দে কম্পিত হয় না, বায়ু যেমন কোন জালে আবদ্ধ হয় না, বা পদ্মপত্র যেমন জলে সিক্ত হয় না, তদ্রূপ হে ভিক্ষু, তুমি গণ্ডারবৎ নিঃসঙ্গভাবে ভ্রমণ কর।" এই বুদ্ধ-বাণী স্বামী তুরীয়ানন্দের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইয়াছিল।

অন্য সময় স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিয়াছিলেন, উপনিষদের মন্ত্রধ্যানকালে তাঁহার মন্ত্রদর্শন হইত এবং মন্ত্রের প্রতিপাদ্য তত্ত্বও প্রত্যক্ষ করিতেন। তিনি অনুভব করিয়াছিলেন, উপনিষদের মন্ত্রাবলী জীবন্ত এবং গভীর-তত্ত্বপূর্ণ। শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রতিও তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। যেরূপে তিনি উপনিষদ্ পাঠ করিয়াছিলেন, সেইরূপে ভাগবতও পাঠ এবং ধ্যান করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার ভাগবতোক্ত তত্ত্বও উপলব্ধ হইয়াছিল। শাস্ত্রাদি পড়িলেও শাস্ত্রজ্ঞান তাঁহার লক্ষ্য ছিল না, তত্ত্বোপলব্ধিই ছিল তাঁহার চরম উদ্দেশ্য। সেইজন্য তিনি জগন্মাতার নিকট সজলনয়নে প্রার্থনা করিতেন যেন সকল শাস্ত্রজ্ঞান মন হইতে মুছিয়া যায় এবং তত্ত্বজ্ঞান উদিত হয়। রামকৃষ্ণ সংঘের কোন প্রাচীন সাধুকে তিনি একবার বলিয়াছিলেন, "যখন ধ্যানে বসি, তখন সকল ইন্দ্রিয়দ্বার বন্ধ করি। তাহার পরে বহির্জগতের সহিত মনের সম্বন্ধ সংছিন্ন হয়। যখন ইন্দ্রিয়-দ্বারসমূহ মুক্ত করি, তখনই বহির্জগতের জ্ঞান আসে।" অন্য সময় বেলুড় মঠের এক তরুণ সন্ন্যাসীকে তিনি উপদেশ দিয়াছিলেন, "মনের দ্বারে বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া রাখ, 'প্রবেশ নিষেধ।' তাহা হইলে ধ্যানকালে বহির্জগৎ মনে ঢুকিয়া আর বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

তুমি বাহিরের বস্তুকে আসিতে দাও বলিয়াই তাহারা মনে ঢুকিয়া ধ্যানের বিঘ্ন সৃষ্টি করে।" হরি মহারাজ স্বামী শান্তানন্দকে বলিয়াছিলেন, "তপস্যাকালে আমি এক একটা ভাব নিয়ে পড়ে থাকতাম। 'আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী'—এই ভাবটি কিছুদিন খুব সাধন করেছিলাম। প্রত্যেক কার্য, প্রত্যেক চিন্তায় জাগ্রত থাকতাম, আর লক্ষ্য রাখতাম ঠিক ঠিক উক্ত ভাবটি মনে আরূঢ় আছে কি না। এইরূপে কিছুদিন গেল। আবার হয়ত 'আমিই ব্রহ্ম'—এই ভাবটি কিছুকাল অভ্যাস করলাম।"

স্বামী তুরীয়ানন্দ দুই-তিন বার উত্তরকাশীতে তপস্যা করিয়াছিলেন—প্রথমবার আমেরিকা যাইবার পূর্বে। তখন স্বামী সচ্চিদানন্দও (বুড়ো বাবা) তথায় তপস্যারত ছিলেন। বুড়ো বাবা বলিতেন, "ভোরে স্নান বা দুপুরে ভিক্ষার সময় প্রায়ই তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম। একবার দেখি, তিনি তিন-চার দিন ও রাত্রি একাসনে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন, স্নানেও যান না, ভিক্ষাতেও বাহির হন না! সমাধিবান যোগী পুরুষ ব্যতীত কেহ একাসনে অনাহারে অনিদ্রায় তিন-চার দিন ও রাত্রি ধ্যানমগ্ন থাকিতে পারে না।" উত্তর কাশীতে স্বামী তুরীয়ানন্দ যে কুঠিয়াতে ছিলেন উহার পাশেই একটি শ্মশান ও জঙ্গল ছিল। ভোর রাত্রে গঙ্গাস্নান করিতে যাইয়া একদিন তিনি দেখিলেন, শ্মশানে এক অর্ধদগ্ধ শবদেহকে একটি ব্যাঘ্র খাইতেছে। ক্ষণকালের জন্য তাঁহার মনে একটু চমক বা ভীতি আসিল। পরে ভাবিলেন, "বাঘ মৃতদেহ খাচ্ছে তো খাক্। এতে আমি বৃথা ভীত হই কেন?" এই ভাবিয়া তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে গঙ্গার দিকে চলিয়া গেলেন।

ভারতের নানা প্রদেশে ভ্রমণকালে স্বামী তুরীয়ানন্দ কতকগুলি প্রাদেশিক ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং ঐ ঐ ভাষার ধর্মগ্রন্থগুলিও পড়িতেন। পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে তিনি গুরুমুখী ভাষা আয়ত্ত

করিয়াছিলেন। গুরুমুখী শিখিয়া শিখ ধর্মশাস্ত্র 'আদিগ্রন্থসাহেব' তিনি উত্তমরূপে পড়িয়াছিলেন। তাঁহার উদার ও বিশাল মস্তিষ্ক সকল ধর্মের সারতত্ত্বসমূহে পরিপূর্ণ ছিল। তাঁহার সৎপ্রসঙ্গ নানা ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতিতে সমৃদ্ধ ও সারগর্ভ হইত। গভীর অন্তর্দৃষ্টির সহায়ে প্রষ্টার মনোগত ভাব ও সন্দেহ বুঝিয়া তিনি যে উত্তর দিতেন তাহাতে শ্রোতার সংশয় অপগত হইত। জীবকোটীর মন নির্বিকল্প সমাধিলাভের পর কিরূপে মায়ারাজ্যে ফিরিয়া আসে—এই বিষয়ে শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ একবার ঘণ্টাধিক কাল মাথা ঘামাইতেছিলেন। অতি কষ্টে অনেক দেরীতে তাঁহারা এক অসন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। হরি মহারাজকে এই প্রশ্ন করা মাত্রই তিনি বলিলেন, "ঈশ্বরেচ্ছায় তাহা সম্ভব হয়। তাঁহার ইচ্ছায় সাধক সমাধিস্থ হয় এবং তাঁহারই ইচ্ছায় সে সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হয় জগদ্ধিতায়। সমগ্র বিশ্ব ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন।"

স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিতেন, নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি বাল্যেই তাঁহার জীবনগতি পরিবর্তিত করিয়া দেয়:

যোগস্য প্রথমং দ্বারং বাঙ্‌নিরোধোঽপরিগ্রহঃ।
নিরাশা চ নিরীহা চ নিত্যমেকান্তশীলতা॥[১]

এই শ্লোক পড়িবার পূর্বে তিনি ধর্ম-সম্বন্ধীয় কথা বলিতে ভালবাসিতেন। ইহা পড়িয়া তাঁহার মনে হইল, যোগের প্রথম দ্বারেও তো তিনি প্রবেশ করেন নাই। তখন তিনি বাক্‌নিরোধের সংকল্প করিলেন। এই সংকল্পের পর তিনি কাহারও সহিত বেশী কথা বলিতেন না এবং সর্বদা ভগবৎভাবে বিভোর থাকিবার চেষ্টা করিতেন। তপস্বী জীবনে তিনি খুব

১ যোগের প্রথম দ্বার সর্বদা বাক্যসংযম, অপরিগ্রহ, আশাত্যাগ, নিশ্চেষ্টতা ও নির্জন বাস।

অল্পভাষী ছিলেন, কখন কখন মৌনী থাকিতেন। একবার নবরাত্রির সময় নয় দিন ও নয় রাত্রি তিনি মৌনী ছিলেন, একটিও কথা বলেন নাই। শুইয়া, বসিয়া, দাঁড়াইয়া, চলিয়া সর্বাবস্থায় ভগবদ্‌ভাবের নিরবচ্ছিন্ন স্রোত মনে প্রবাহিত রাখিয়াছিলেন।

উত্তরাখণ্ডে তপস্যাকালে স্বামী তুরীয়ানন্দ যেসকল তপস্বী সাধু দেখিয়াছিলেন তন্মধ্যে তিনজনের খুব প্রশংসা করিতেন। তাঁহাদের নাম রামাশ্রম, কেবলাশ্রম ও বিজ্ঞানানন্দ। টিহিরীতে অবস্থানকালে সম্ভবতঃ বিজ্ঞানানন্দজীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। আমেরিকা হইতে ফিরিবার পর যখন উত্তরকাশীতে যান তখন বিজ্ঞানানন্দজীর সহিত তিনি প্রায় একমাস বাস করিয়াছিলেন। হরি মহারাজ তাঁহার সম্বন্ধে বলিতেন, "বিজ্ঞানানন্দ কৌপীনমাত্র সম্বল করিয়া যথেচ্ছ বিচরণ করিতেন। ষড়্‌দর্শন তাঁহার সম্যক্ আয়ত্ত ছিল। উপনিষদাবলী, ব্রহ্মসূত্র ও গীতার শাঙ্করভাষ্য তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। এইসকল শাস্ত্র না দেখিয়াই তিনি অনর্গল বলিয়া যাইতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনর্গল সংস্কৃত বলিতে পারিতেন। ভ্রমণকালে যখন যেখানে থাকিতেন সাধুরা সমবেত হইয়া তাঁহাকে বিবিধ শাস্ত্রীয় প্রশ্ন করিতেন। তিনি টিহিরীরাজার গুরু ছিলেন। কিন্তু শিষ্যের বিশেষ প্রার্থনা সত্ত্বেও কোন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন নাই। তাঁহার মত শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত সাধু ভারতবর্ষে তখন কেহ ছিলেন কি-না, সন্দেহ।"

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে স্বামী বিবেকানন্দ সিংহল ও দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণান্তে কলিকাতায় আগমন করেন। তৎপূর্বেই স্বামী তুরীয়ানন্দ তীর্থভ্রমণাদি হইতে আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসেন। উক্ত বৎসর মার্চের শেষে তিনি স্বামীজীর সহিত দার্জিলিং গিয়া তথায় সরকারী উকিল মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে কিছুদিন ছিলেন।

দার্জিলিং-এ স্বামীজী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "নূতন ধরনের ব্রহ্মচর্য প্রবর্তন করব।" স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিতেন, "সন্ন্যাসের পুরান আদর্শকেই স্বামীজী যুগোপযোগী আকার দিলেন।" ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে আলমবাজার হইতে মঠ বেলুড় গ্রামে এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে উঠিয়া আসে। দার্জিলিং হইতে ফিরিয়া হরি মহারাজ আলমবাজারে ও পরে বেলুড় মঠে অবস্থান করেন। ১৮৯৯ খ্রীঃ ১১ই মে স্বামীজীর সহিত তিনি আলমোড়ায় গিয়াছিলেন এবং তথায় 'প্রবুদ্ধ ভারত' অফিসে বাস করেন। তথায় কয়েক মাস থাকিয়া বিজয়ার দিন তিনি আলমোড়া হইতে বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসেন। তখনও মঠ বেলুড়ে ভাড়াটিয়া বাড়ীতে অবস্থিত। সেই বৎসর ডিসেম্বর মাসে বর্তমান স্থায়ী গৃহে মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্বামীজী ১৮৯৭ খ্রীঃ জুলাই মাসে আলমোড়া হইতে স্বামী শুদ্ধানন্দকে লিখিতেছেন, "মঠে একসঙ্গে তিনজন করে মোহন্ত নির্বাচন করলে ভাল হয়। একজন বৈষয়িক বিষয় চালাবেন, একজন আধ্যাত্মিক দিক দেখবেন, আর একজন জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা করবেন। ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দ অনায়াসে শেষ দুইটি বিভাগের ভার নিতে পারেন!" এই বৎসর অক্টোবর মাসে স্বামীজী কাশ্মীর যাইবার পথে মারি হইতে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিতেছেন, "পত্রপাঠ উকিলের পরামর্শ নিয়ে এই মর্মে উইল রেজেষ্টি করে দাও যে, যদি আমি ও তুমি মরে যাই হরি ও শরৎ মঠের যা কিছু সব পাবে।" পরবর্ত্তী মাসে লাহোর হইতে তিনি উক্ত গুরুভ্রাতাকে লিখেন, "হরি ও শরতের নামে যে উইল করিবার জন্য লিখিয়াছিলাম তাহা বোধ হয় হইয়া গিয়াছে।" নভেম্বরের শেষে দিল্লী হইতে তিনি ব্রহ্মানন্দজীকে পত্রে জিজ্ঞাসা করিতেছেন সেই উইল করা হইল কি-না। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে ফেব্রুয়ারী স্বামীজী শশী মহারাজকে মাদ্রাজে লিখিয়াছিলেন, "হরিরও একটু ম্যালেরিয়া

হয়েছিল। আমরা এখানে নাচ আরম্ভ করেছি। হরি, সারদা ও আমাকে নৃত্য করতে দেখলে তুমি আনন্দে ভরপূর হইতে।" উদ্ধৃত পত্রোক্তিসমূহ হইতে বোঝা যায়, স্বামীজী তাঁহার প্রিয় গুরুভ্রাতা তুরীয়ানন্দজীর উপর কত বিশ্বাস করিতেন এবং কত সপ্রেম দৃষ্টি রাখিতেন!

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী স্বামীজী দেওঘর হইতে বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিয়া অর্থসংগ্রহ ও বেদান্তপ্রচারের জন্য স্বামী তুরীয়ানন্দ ও সারদানন্দকে গুজরাট যাইতে বলেন। ৭ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার পাঞ্জাব মেলে উভয়ে যাত্রা করিলেন এবং ৮ই ফেব্রুয়ারী বুধবার কানপুরে উপস্থিত হইলেন। তথায় একটি সামান্য পান্থশালায় উভয়ে কষ্টে রাত্রিযাপন করেন। সরাই-এ অসুবিধা হওয়ায় তাঁহারা নৃত্যগোপাল বাবুর বাড়ীতে যান ও তথায় থাকিয়া শহর পরিদর্শন করেন। কানপুর হইতে আগ্রা হইয়া তাঁহারা জয়পুর যান। জয়পুরে তাঁহারা সর্দার হরি সিং-এর অতিথি ছিলেন এবং উষ্ট্রবাহনে রাম-নিবাস দর্শন করেন। জয়পুরে খেতড়ীর রাজার সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। সেখানে তাঁহারা আমেরে যাইয়া মন্দির দর্শন করেন। জয়পুরের গোপীনাথজী ও গোবিন্দজীর মন্দিরও তাঁহারা দর্শন করিয়াছিলেন। জয়পুর হইতে তাঁহারা আবুরোড হইয়া আমেদাবাদে যান। আমেদাবাদ হইতে তাঁহারা কচ্ছে লিম্‌ডিতে গমন করেন। ১৪ই মার্চ লাথিরাজের সহিত রাজোদ্যানে সাক্ষাৎ এবং রামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়। লিম্‌ডি হইতে গোণ্ডাল হইয়া উভয়ে যখন মোর্ভীতে উপস্থিত হন তখন ভগিনী নিবেদিতার পত্রে জানিতে পারেন, গত ২৮শে মার্চ স্বামী যোগানন্দ দেহত্যাগ করিয়াছেন। তথা হইতে তাঁহারা ভাবনগরে উপনীত হইলেন। তথায় কলিকাতা ফিরিবার

জন্য তাঁহারা স্বামীজীর তার পাইলেন। তদনুযায়ী ওরা মে উভয়ে বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসেন।

এইরূপে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধে বরাহনগর মঠে যোগদান ও সন্ন্যাসগ্রহণের পর হইতে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে আমেরিকা যাইবার পূর্ব পর্যন্ত প্রায় দ্বাদশবর্ষ স্বামী তুরীয়ানন্দ বরাহনগর, আলমবাজার ও বেলুড় মঠে মাঝে মাঝে থাকিলেও প্রধানতঃ তীর্থভ্রমণ ও তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

আমেরিকায় তিন বৎসর

নিউইয়র্কে

বেলুড় মঠ-প্রতিষ্ঠার পর স্বামী বিবেকানন্দের শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধে তিনি বরাহনগরবাসী মহানন্দ কবিরাজের চিকিৎসাধীন রহিলেন। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় স্বামীজী একটু সুস্থ বোধ করিলেন। তখন কবিরাজ মহাশয় পরামর্শ দিলেন, "সুদীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় স্বামীজীর শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হবার সম্ভাবনা। মাল-বোঝাই জাহাজে গেলে সমুদ্রযাত্রা সুদীর্ঘ হবে।" কবিরাজের পরামর্শে এবং গুরুভ্রাতাদিগের অনুরোধে স্বামীজী সমুদ্রযাত্রা করিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু স্বামী তুরীয়ানন্দকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলেন। কারণ একদা তিনি তাঁহার আমেরিকাবাসী শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন, "আমার মধ্যে তোমরা ক্ষাত্র শক্তির বিকাশ দেখেছ। আমি তোমাদিগকে এমন এক গুরুভাইকে পাঠাবো, যিনি ব্রাহ্মণ-সুলভ গুণরাজির মূর্ত বিগ্রহ। তিনি আদর্শ ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ। মানবজীবনে উচ্চতম আধ্যাত্মিকতার বিকাশ কিরূপে হয়, তা তাঁকে দেখলে বুঝতে পারবে।"

স্বাধ্যায় ও তপস্যা ছাড়িয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ বিদেশে যাইতে প্রথমে আদৌ স্বীকৃত হন নাই। গুরুভ্রাতারা অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অবশেষে যখন স্বামীজী তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া সাশ্রুলোচনে বলিলেন, "হরি ভাই, আমি ঠাকুরের কাজের জন্য বুকের রক্ত বিন্দু বিন্দু পাত ক'রে মৃতপ্রায় হয়েছি। তোমরা কি আমাকে এ কাজে সাহায্য করবে না?" স্বামীজীর ভাবাবেগে হরি

মহারাজ অভিভূত হইলেন এবং সাত সমুদ্রের পারে সুদূর আমেরিকায় যাইবার সম্মতি জানাইলেন। স্বামীজীর আমেরিকা-যাত্রার সকল ব্যবস্থা হইল। ১৮৯৯ খ্রীঃ ২০শে জুন স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতাকে লইয়া তিনি কলিকাতায় মালবোঝাই জাহাজে উঠিলেন। জাহাজে স্বামীজী গুরুভ্রাতা তুরীয়ানন্দজীকে বলিলেন, "আমি নিয়মিত-ভাবে ব্যায়াম করবো স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য। আমি যদি ভুলে যাই বা অনিয়ম করি, তুমি আমায় একটু মনে করে দিও।" স্বামী তুরীয়ানন্দ উহা স্বামীজীকে স্মরণ করাইয়া দিতে অঙ্গীকার করিলেন। প্রথমে স্বামীজী দুই-চার দিন স্বীয় সংকল্প অনুসারে ব্যায়াম করিলেন। কিন্তু তৎপরে দেখা গেল, তিনি ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে এমন তন্ময় হইয়া আলাপ করিতে লাগিলেন যে, ব্যায়ামের কথা তাঁহার আর মনে রহিল না। ভগিনী নিবেদিতাও তাঁহাকে কিছু বলিতে সাহস করিতেন না। হরি মহারাজ গুরু-শিষ্যা-সংবাদে বাধা দিয়া স্বামীজীকে ব্যায়ামের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেন। তখন স্বামীজী বলিতেন, "হরি ভাই, আজ থাক। জাহাজে বেশ ভালই আছি। আর দেখ, নিবেদিতার সঙ্গে একটু কথা বলছি। নিবেদিতা বিদেশী মেয়ে, সব ছেড়ে ছুড়ে আমার কাছে এসেছে এসব কথা শুনবার জন্য। বেশ ভাল মেয়ে, খুব সমঝ্‌দার। এর সঙ্গে কথা কয়ে খুব আনন্দ হচ্ছে।" হরি মহারাজ স্বামীজীকে আর বিরক্ত না করিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। ভগিনী নিবেদিতা ষোল-আনা মন দিয়া স্বামীজীর কথা শুনিতেন ও লিখিয়া রাখিতেন। তিনি রোজ পাঁচ-ছয় ঘণ্টা স্বামীজীর কথা শুনিয়া ও লিখিয়া কাটাইতেন। হরি মহারাজের সঙ্গেও স্বামীজীর বহু কথা হইত। অবশ্য স্বামীজী সে যাত্রায় সত্যসত্যই সারিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার শরীর ভাল হইতে লাগিল।

মাদ্রাজ বন্দরে জাহাজ লাগিল। তখন কলিকাতায় প্লেগ মহামারী চলিতেছিল। কোয়ার‍্যাণ্টাইন নিয়মানুসারে যাত্রীদিগকে নামিতে বা দর্শকদিগকে উঠিতে দেওয়া হইল না। মাদ্রাজ মঠ হইতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও ভক্তগণ এবং অসংখ্য দর্শক নৌকায় করিয়া জাহাজের কাছে আসিলেন। স্বামীজী ও হরি মহারাজ ডেকে দাঁড়াইয়া নৌকাস্থিত দর্শকদের সহিত কথাবার্তা বলিলেন। স্বামীজীকে নামিতে দেওয়া হইল না বলিয়া তিনি উত্তেজিত হইয়া সিংহনাদে বলিতে লাগিলেন, "মা, আমায় ধরে না কেন? মারে না কেন? অত্যাচার করে না কেন? তাকি এরা করবে? এরা সব চালাক লোক।" বার বার এইরূপ বলাতে হরি মহারাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাকে ধরলে বা অত্যাচার করলে কি হবে?" স্বামীজী গুরুভ্রাতাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "এটা আর বুঝতে পাচ্ছ না, হরি ভাই? দেশটা তাহলে জেগে উঠবে এবং হাউইয়ের মত উঠে যাবে। তা কি আর মা করবেন?" মাদ্রাজে সমুদ্রতীরে এত লোক স্বামীজীকে দেখিতে আসিয়াছিল যে, হরি মহারাজ তাহা দেখিয়া মনে করিলেন যেন জন-সমুদ্র। যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর কেবল মানুষের মাথা দেখা যাইতেছিল। যতক্ষণ জাহাজ বন্দরে রহিল ততক্ষণ বিশাল জনতা সমুদ্রস্থ বহু নৌকায় এবং সমুদ্রতীরে থাকিয়া স্বামীজীকে দেখিতে লাগিলেন। যখন জাহাজ ছাড়িয়া দিল তখন স্বামীজী দর্শকমণ্ডলীকে অভিবাদন জানাইলেন। ইহা দেখিয়া হরি মহারাজ অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং ভাবিলেন, "স্বামীজীর ওপর এদের কি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা! কি অদ্ভুত লোকই না জন্মেছেন!" স্বামীজী পূর্ববৎ উত্তেজিতভাবে ডেকের উপর পায়চারি করিতে লাগিলেন। তাঁহার উত্তেজিত ভাব দেখিয়া হরি মহারাজ বিস্মিত হইলেন।

জাহাজ মাদ্রাজ হইতে কলম্বো বন্দরে আসিল এবং এডেন, নেপল্‌স ও মার্সেলিস বন্দরে দাঁড়াইল। স্বামী তুরীয়ানন্দ গুরুভ্রাতার সহিত ৩১শে জুলাই লণ্ডনে পৌঁছিলেন। জাহাজে একদিন হরি মহারাজ ভগিনী নিবেদিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "সেখানে কি রকম চলতে হবে?" তদুত্তরে নিবেদিতা একটা ছুরির অগ্রভাগ নিজ হাতে ধরিয়া এবং হাতাটা হরি মহারাজের দিকে বাড়াইয়া বলিলেন, "স্বামিন্, লোককে কিছু দিতে হলে এরূপভাবে দেওয়া চাই। অর্থাৎ সর্ব বিষয়ে অসুবিধা ও বিপদের ভাগটা নিজে নিয়ে সুবিধার ভাগটা অন্যকে দিতে হবে।" ১৬ই আগস্ট গ্লাসগো হইতে তাঁহারা জাহাজে উঠিলেন এবং উক্ত মাসের শেষে নিউইয়র্কে পৌঁছিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রথমে নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতি ভবনে কিছুদিন বাস করেন। তখন উক্ত সমিতি ১০২ ইস্ট ৫৮ সংখ্যক বাড়ীতে অবস্থিত ছিল। স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামী অভেদানন্দের সহকারিরূপে সমিতিতে কার্য করিতে আরম্ভ করেন। বেদান্ত সমিতিতে কিছুদিন থাকিবার পর তিনি স্বামীজীর সঙ্গে সমিতির প্রথম প্রেসিডেণ্ট মিঃ লেগেটের রিজলি মেনরস্থ গ্রাম্য ভবনে যাইয়া কিছুকাল বিশ্রাম করেন। মিসেস্ লেগেট ছিলেন স্বামীজীর শিষ্যা, কুমারী ম্যাকলাউডের সহোদরা। লেগেট-দম্পতীর পল্লী গৃহে কিছুকাল বিশ্রামের পর স্বামী তুরীয়ানন্দ নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতিতে ফিরিয়া আসেন। হরি মহারাজ বেদান্ত সমিতিতে যেসকল ধর্মপ্রসঙ্গ করিতেন সেগুলি বেশ পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইত ও লোকের হৃদয়ে ধর্মভাব জাগ্রত করিত। ইহা দেখিয়া স্বামী অভেদানন্দ তাঁহাকে একদিন বলিলেন, "হরি ভাই, সব কথা একদিনে বলে ফেলো না। এর পরে কি বলবে?" হরি মহারাজ উত্তর দিয়াছিলেন, "ঠাকুর রাশ ঠেলে দেবেন। তিনি বলতেন, 'মা রাশ ঠেলে দেন।' "

স্বামীজীর সঙ্গসুখ-লাভই ছিল স্বামী তুরীয়ানন্দের আমেরিকাযাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি ভাবিয়াছিলেন, তিনি প্রিয় গুরুভ্রাতার সঙ্গে থাকিবেন, নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইবেন এবং তাঁহার সঙ্গেই ভারতে ফিরিয়া আসিবেন। তিনি স্বামীজীর সঙ্গলাভকে সৌভাগ্য জ্ঞান করিতেন। সেইজন্য জাহাজে প্রায় দুই মাস পরমানন্দে কাটিল। আমেরিকাতেও হরি মহারাজ স্বামীজীর সঙ্গে বহু স্থানে বেড়াইলেন এবং অনেক বন্ধুর সহিত পরিচিত হইলেন। পরিচিত বন্ধুদের মধ্যে মণ্ট ক্লেয়ারের মিসেস্ এফ. হুইলার অন্যতমা ছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে থাকিয়া স্বামী সারদানন্দ বেদান্ত প্রচার করিতেন। তিনি হরি মহারাজকে বলিলেন, "আমার বাড়ীটি আপনারই বাড়ী মনে করিবেন এবং যখন ইচ্ছা গিয়ে থাকবেন। আমাদের ওখানে আপনি থাকলে আমরা খুব আনন্দিত হব।"

স্বামীজীর সঙ্গে দুই মাস কাটাইবার পর হঠাৎ একদিন স্বামীজী তাঁহাকে বলিলেন, "হরি ভাই, আমার তো আর টাকাপয়সা নেই, সব ফুরিয়ে গেছে। তোমাকে আর খাওয়াতে পারব না, তুমি তোমার পথ দেখ।" এই কথা শুনিয়া হরি মহারাজ চমকিত হইলেন; স্বামীজীর সঙ্গে থাকিবার তাঁহার যে ইচ্ছা ছিল তাহা চূর্ণ হইয়া গেল। তিনি গম্ভীর হইয়া গেলেন ও চুপ করিয়া রহিলেন; কি বলিবেন বা করিবেন কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। হরি মহারাজকে নির্বাক ও গম্ভীর দেখিয়া স্বামীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হরি ভাই, তাহলে কি করবে?" হরি মহারাজ উত্তর দিলেন, "হাঁ, আপনি যা বলেছেন তাই হবে।" তিনি তখন আদৌ বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহাকে কাজে নামাইবার জন্য স্বামীজী এই কৌশল অবলম্বন করিলেন। সেইজন্য তিনি মনে মনে খুব চটিয়া গেলেন এবং

প্রস্তরবৎ বসিয়া রহিলেন। তখন হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল মণ্ট ক্লেয়ারের সেই স্ত্রীভক্তটির অনুরোধ। তিনি মনে মনে সেই স্থানে যাওয়া স্থির করিলেন। ইহাতে তাঁহার মনটা কিঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইল।

পরদিন স্বামীজী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হরি ভাই, কি ঠিক করলে?" হরি মহারাজ স্বীয় সঙ্কল্পের কথা স্বামীজীকে জানাইলেন। ইহা শুনিয়া স্বামীজী খুশী হইয়া বলিলেন, "বেশ, বেশ, খুব ভাল। সেখানেই থাকবে এবং মাঝে মাঝে একটু ক্লাশ-লেকচার করবে।" ক্লাশ ও লেকচারের কথা শুনিয়া হরি মহারাজ চটিয়া গেলেন এবং বলিয়া ফেলিলেন, "আমি ওসব করতে পারব না। আমার দ্বারা ওসব হবে না।" স্বামীজী তখন তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিলেন, "তোমাকে তো আর আলাদা ক্লাশ বা লেকচার করতে হবে না; তুমি মুখে যা বলবে তাই হবে উপদেশ। তাতেই লোকের কল্যাণ হবে।" হরি মহারাজ স্বামীজীর কথা শুনিয়া নীরব রহিলেন এবং অবিলম্বে মণ্ট ক্লেয়ারে মিসেস্ হুইলারকে লিখিলেন। মিসেস্ হুইলার তাঁহাকে সশ্রদ্ধ আমন্ত্রণ জানাইয়া উত্তর দিলেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে তিনি তথায় যাইয়া মিসেস্ হুইলারের বাড়ীতে উঠিলেন। যখন মিসেস্ হুইলারের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হইল তখন তিনি সন্ন্যাসী অতিথির হাত দুইখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "আমি আপনার বোন। আমার এ বাড়ী আপনার বাড়ী বলে জানবেন। কেমন, বোন বলে দেখতে পারবেন ত?" স্বামী তুরীয়ানন্দ উত্তর দিলেন, "নিশ্চয়ই।" হুইলার-দম্পতী তাঁহাকে একখানি ঘর ছাড়িয়া দিলেন এবং সযত্নে রাখিলেন। বাড়ীর সকলেই তাঁহাকে এত আপনার করিয়া লইলেন যে, ছেলেমেয়েরাও তাঁহার খুব আত্মীয় বলিয়া মনে হইল। তথায় হরি মহারাজ ঠাকুর-স্বামীজীর আলোচনা

করিয়া আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিলেন। স্বামীজীর কথাই সত্য হইল। কারণ, হরি মহারাজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বতঃই ক্লাশ-লেকচার আরম্ভ হইয়া গেল।

কিছুদিন পরে স্বামীজী একবার সেই বাড়ীতে গেলেন এবং হরি মহারাজের কাজ দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। তখন স্বামীজী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "দেখ, হরি ভাই, তোমাকে কাজে নামাবার জন্যই কড়া কথা বলেছিলাম। এরা আদর্শ সন্ন্যাসীর জীবন কখন দেখে নি, আমার কাছে শুনেছে মাত্র। তোমাকে ভারত থেকে আমেরিকায় নিয়ে এসেছি এইজন্য যে তোমার জীবন দেখে এরা বুঝবে আদর্শ হিন্দু সন্ন্যাসী কিরূপ। শুধু শোনা কথায় তো আর বিশ্বাস হয় না। তোমরা ঠাকুরের সন্তান। তোমাদের দেখলে মানুষের মনে ধর্মভাব জেগে উঠবে। Live the life (আদর্শ জীবন যাপন কর)। Forget India (ভারতকে ভুলে যাও), বাকী জীবনটা এদেশেই কাটিয়ে দাও।" স্বামীজীর কথাগুলি হরি মহারাজের কাছে দেবাদেশতুল্য পালনীয় মনে হইল। স্বামীজী হরি মহারাজকে আরও বলিলেন, "দেখ, হরি ভাই, এরা আমাকে দেখে কিছু বুঝতে পারে না। আমি এখন একরকম বলছি, তারপর আর একরকম। কাজেও আমার কিছু ঠিক নাই—এখন একরকম করছি, পরে অন্য রকম। আমরা world-teacher (জগদ্‌গুরু)। তাই যখন যেমন তখন তেমন করি, যেখানে যেমন সেখানে তেমন থাকি। নিয়মিত বিধিবদ্ধভাবে কিছু না বললে বা করলে সাধারণলোক ধরতে পারে না। আমাকে দেখে এরা চমৎকৃত হয়ে যায়, স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। তাই আমাকে এরা খুব ভালবাসে এবং প্রশংসা করে, কিন্তু বুঝতে পারে না। তোমার নৈষ্ঠিক জীবনের সংস্পর্শে এসে এরা বুঝবে খাঁটি হিন্দু সন্ন্যাসীর

জীবন কিরূপ। আর দেখ, আমি যা-তা খাই; আমার খাওয়ার কোন বাচবিচার নাই। আর আমি যা খুশী করি, নিয়মকানুন বিশেষ কিছু মানি না। তা সত্ত্বেও আমার প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা ও প্রীতি থাকায় আমার সবটাই এরা ভাল ভাবে নেয়। এদের কাছে আমার সাত খুন মাপ। এরা গুণের এত আদর করে যে, আমার দোষ দেখলেও কিছু মনে করে না। এইজন্য জাহাজে উঠেই তোমাকে বলেছিলাম vegetarian (নিরামিষাশী) হতে। কারণ এরা vegetarian (নিরামিষাশী)-দের ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। ধর্ম-প্রচারক নিরামিষাশী হলে এদেশে খুব শ্রদ্ধার্হ হয়। অবশ্য এদের নিরামিষ আহার মানে ডিম পর্যন্ত খাওয়া চলে। কেবল মাছ-মাংসটা বাদ।"

স্বামীজীর কথায় হরি মহারাজ বুঝিতে পারিলেন, কেন তিনি আমেরিকায় আনীত হইয়াছেন। তৎপূর্বে তিনি ইহা ভালরূপে বুঝিতে পারেন নাই। প্রিয়তম গুরুভ্রাতার নির্দেশে তিনি বেদান্ত-প্রচারে মনোনিবেশ করিলেন। মণ্ট ক্লেয়ারে ও নিউইয়র্কে প্রচারকার্য আরম্ভ হইল। সম্ভবতঃ ডিসেম্বর মাসের প্রথমভাগে অনবধানতাবশতঃ পড়িয়া যাইয়া তাঁহার পা ভাঙ্গিয়া যায়। ২২শে ডিসেম্বর স্বামীজী মিসেস্ ওলিবুলকে লিখিতেছেন, "আশাকরি তুরীয়ানন্দ এখন সম্পূর্ণ সেরে উঠেছে এবং কাজে লেগে গেছে। বেচারার ভাগ্যে কেবল দুর্ভোগ!" সেই সময় স্বামীজী হরি মহারাজকেও লিখিয়াছিলেন, "হরি ভাই, তোমার ঠ্যাং জোড়া লেগেছে শুনে খুশী আছি এবং বেশ কাজ করছ তাও শুনছি।" স্বামীজী লস্ এঞ্জেলস্ হইতে ২৭শে ডিসেম্বর ধীরামাতাকে লিখিয়াছিলেন, "মিস্ গ্রানস্ট্রাইডেল তুরীয়ানন্দ সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। তুরীয়ানন্দকে আমার ভালবাসা জানাবেন। আমার বিশ্বাস, সে চমৎকার কাজ করবে। তার সাহস ও স্থৈর্য

আছে। আমি কালিফোর্ণিয়া ছেড়ে যাবার সময় তুরীয়ানন্দকে ডেকে পাঠাব এবং তাকে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে কাজে লাগাব। আমার নিশ্চিত ধারণা, এটা একটা বড় কার্যক্ষেত্র।"

স্বামীজী কর্তৃক লস্ এঞ্জেলস হইতে ১৯০০ খ্রীঃ ১৫ই ফেব্রুয়ারী ধীরামাতাকে লিখিত পত্রে আছে, "বেচারা তুরীয়ানন্দ কতই না ভুগেছে, কিন্তু আমাকে জানায় নি! সে বড় সরলচিত্ত ও ভাল মানুষ।" উক্ত বৎসর ৩০শে মার্চ সানফ্রান্সিস্কো হইতে স্বামীজী মিস্ জোসেফাইন ম্যাকলাউডকে লিখিয়াছিলেন, "তুরীয়ানন্দের পা কি ভাল হয় নি?" সেই মাসে একই স্থান হইতে স্বামীজী হরি মহারাজকে লিখিয়াছিলেন, "হরি ভাই, আমি আসছে সপ্তাহে এস্থান ছেড়ে চিকাগোয় যাব, তারপর নিউইয়র্কে।" উদ্ধৃত পত্রাংশগুলি হইতে জানা যায়, স্বামীজী যতদিন আমেরিকায় ছিলেন ততদিন হরি মহারাজের খবর রাখিতেন এবং তাঁহাকে কর্মে নিযুক্ত করিবার জন্য চেষ্টিত ছিলেন।

তুরীয়ানন্দ যখন নিউইয়র্কে পদার্পণ করেন, তখন স্বামীজীর প্রেরণায় এবং স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দের প্রচেষ্টায় বেদান্ত আন্দোলন নিউইয়র্কে বিস্তারলাভ করিয়াছে। ইতঃপূর্বে বেদান্ত সম্বন্ধে যথেষ্ট বক্তৃতাদি হইয়াছিল। অনুরাগী ছাত্রছাত্রীগণ এখন বেদান্তসাধনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। তাঁহারা এখন পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্ন সাধু চান না, তাঁহারা চান সরল ধ্যাননিষ্ঠ সাধনশীল ভারতীয়ভাবাপন্ন সাধু। ভারত হইতে নবাগত স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহাদের মনোমত হইলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দের দেহ অদীর্ঘ হইলেও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সৌষ্ঠবসম্পন্ন ছিল। তাঁহার আচার-ব্যবহার মনোহর, চাল-চলন সাদাসিদে। তরুণদের মত তাঁহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল ও উন্মুক্ত। অনেক সময় তাঁহার মুখটি অনেকটা সুখী, সুশ্রী, বুদ্ধিমান্ ও চিন্তাশীল তরুণের মত দেখাইত। আবার তাঁহার মুখের ভাব

মনের ভাবের সঙ্গে খুব পরিবর্তিত হইত। কোন মার্কিন ভক্ত বলেন, উক্ত পরিবর্তন এত পরিস্ফুট হইত যে, এইরূপ অন্য কাহার মুখে তিনি দেখেন নাই। কখন তাঁহার মুখে বিপুল শক্তি এবং অসীম উৎসাহ প্রকটিত হইত। অন্যান্য সময় তাঁহার চক্ষে অন্যমনস্কতা ফুটিয়া উঠিত। তখন মনে হইত, তাঁহার মন বহির্জগৎ হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া কোন সুদূর ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেছে। কখন তাঁহাকে নম্রতার চিত্র মনে হইত, কখনও বা তাঁহার মুখে শিশুসুলভ সরলতা ও পবিত্রতা মূর্ত হইয়া উঠিত। পূর্ব হইতে স্থানীয় বেদান্ত সমিতির সভ্যগণ তাঁহার কথা শুনিয়াছিলেন। এখন তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহাদের চক্ষুকর্ণের বিবাদ মিটিল।

সমিতিতে বৈঠক খানার পার্শ্বে একটি ঘর ছিল। ইহাতে কোন কোন সন্ধ্যায় সভাদি হইত; কেবল তখনই তথায় আলো জ্বলিত। অন্য সময়ে উহা অন্ধকার থাকিত। উক্ত ঘরে স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রথমতঃ থাকিতেন। তাঁহার দর্শনমানসে অনুরক্ত জনৈক ভক্ত এক সন্ধ্যায় সেই অন্ধকার ঘরে উঁকি মারিয়া দেখিলেন, তুরীয়ানন্দজী ধ্যানমগ্ন। ভক্তটির চক্ষে ইহা অদ্ভুত ঠেকিল। তিনি স্বামীর ধ্যানে বাধা না দিয়া বৈঠকখানায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। একটু পরে তুরীয়ানন্দজী অন্ধকার ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া হাসিমুখে দর্শককক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার আচরণ অতি সহজ ও স্বাভাবিক ছিল। অপেক্ষারত ভক্তটি নিঃসঙ্কোচে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। প্রথম হইতেই ভক্তটি তাঁহাকে পূর্বপরিচিত মিত্রবৎ মনে করিলেন। সেইজন্য তাঁহাকে পাইয়া তাঁহারা পরম সুখী হইলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "ও! তুমি এসেছ। আমি তোমার কথা শুনেছি।" ভক্তটি প্রীতিভরে বলিলেন, "দেখুন স্বামীজী, আমরা ভারতকে ভালবাসি। সেই পুণ্যভূমি থেকে যে বস্তু বা ব্যক্তি আসেন তাঁহাকে আমরা হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন করি।" স্বামী তুরীয়ানন্দের

মুখে মৃদু হাস্যের বিদ্যুৎ খেলিল। তিনি বলিলেন, "তা বেশ। যদিও আমি এদেশে বেশীদিন আসি নাই তথাপি এদেশটিকে স্বদেশের মতই মনে হচ্ছে। এদেশটিকে যত অদ্ভুত ভেবেছিলাম, তত অদ্ভুত এখন মনে হচ্ছে না। দেখছি, মানব-চরিত্র সর্বত্র সমান। মনে হচ্ছে, আমি বন্ধুদের মধ্যেই এসেছি।" ভক্তটি বলিলেন, "তা সত্যই স্বামীজী।" স্বামী তুরীয়ানন্দ সহাস্যে উত্তর দিলেন, "বেশ বেশ। হাঁ, তোমরা সকলেই ৺মায়ের সন্তান এবং আমি জানি যে, তোমরা ভারতকে ভালবাস।" এইরূপে ভক্তটির সঙ্গে স্বামী তুরীয়ানন্দ আলাপ পরিচয় করিলেন। তাঁহার সমুদ্রযাত্রায় কোন অসুবিধা বা অসুস্থতা হইয়াছিল কিনা সেইসকল কথাও ভক্তটি জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ ভক্তটিকে বলিলেন, "দেখ, মিঃ কে— একটু সংস্কৃত জানে।" উক্ত ভক্তটি বলিলেন, "আমি সংস্কৃত অক্ষরও চিনি না।"

স্বামী তুরীয়ানন্দ— তাতে কি যায় আসে? তুমি সংস্কৃত শিখিয়া কি করিবে? সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করিতে সমগ্র জীবন কাটিয়া যায়। তুমি উৎকৃষ্টতর ভাবে জীবনের সদ্ব্যবহার করিতে পার। মায়ের সন্তান হও এবং সর্বদা তাঁর চিন্তা কর। কিন্তু মিঃ কে— লোকটি ভাল। তার মধ্য-বয়স অতিক্রান্ত। কিন্তু সে এখনও অবিবাহিত। তা কি চমৎকার নহে?

ভক্তটি— হাঁ স্বামীজী। তিনি বেদান্ত সমিতির এক পুরাতন সভ্য এবং উত্তম সুহৃদ্।

স্বামী— তা জেনে আমি বিশেষ আনন্দিত। তুমিও সময়ে স্বামী বিবেকানন্দকে জানবে।

ভক্ত— মিঃ কে— কি আপনাকে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করে শুনিয়েছে?

স্বামী— না। সে কেবল আমাকে বলেছিল যে, সে সংস্কৃত শিখছে।

ভক্তটির অনুরোধে মিঃ কে— আসিয়া গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের "বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় ···।" শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ উহার শ্লোকাবৃত্তি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন, "বা! বেশ বেশ। মিঃ কে—, আরও আবৃত্তি কর। এ খুব ভাল।" মিঃ কে— স্বামীজীর প্রশংসাবাদে পরম প্রীতি লাভ করিলেন। আলাপকারী ভক্তটি অবিবাহিত জানিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ সুখী হইলেন। উক্ত ভক্তটির নাম গুরুদাস ব্রহ্মচারী। তিনি কিছু পূর্বে স্বামী অভেদানন্দের নিকট ব্রহ্মচর্য-ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং সকল নারীকে জননীজ্ঞানে দেখিবার চেষ্টা করেন। তাহা শুনিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "হাঁ, হাঁ। শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের এই শিক্ষাই দিয়াছেন। ইহাই নিরাপদ পথ। যে ব্রতে দীক্ষিত হয়েছ, তা সর্বদা স্মরণ রাখবে ও অভ্যাস করবে। আমাদের ঠাকুর প্রত্যক্ষ অনুভব করেছিলেন যে, প্রত্যেক নারীমূর্তিই জগন্মাতার জীবন্ত বিগ্রহ। তিনি সৎ ও অসৎ ব্যক্তির ভিতরেও জগন্মাতাকে দেখেছিলেন। শিব! শিব! ইংলণ্ডে এবং এখানে আমি অনেক ভাল ভাল লোক দেখেছি।" গুরুদাস মহারাজ বলিলেন, "কিন্তু স্বামীজী, আমরা অত্যন্ত কর্মপ্রবণ ও জড়বাদী। পাশ্চাত্ত্য জীবনের কর্মব্যস্ততা ও কোলাহলে আপনি বিরক্ত হন নাই কি?"

স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "হাঁ, জাতি হিসাবে তোমরা খুব জড়বাদী; কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রম সর্বত্র দেখা যায়। কর্মতৎপরতা মন্দ নহে; আমি তোমাদের উদ্যমশীলতা পছন্দ করি, তোমরা খুব কর্মঠ। আমি এদেশে কোথাও জড়তা ও অলসতা দেখি না। কেবল তোমাদের এই শক্তিকে সংযত করতে হবে। এই বহির্মুখী শক্তিকে অন্তর্মুখী করতে

হবে। 'অকর্মে কর্ম দর্শন' চাই, কিন্তু আলস্য নয়। তোমরা তরুণ জাতি, তোমাদের কিছু ভোগও দরকার। আমরা ভারতে জীবনকে উপভোগ করতে জানি না, আমরা তা ভুলে গেছি। তোমরা ক্রমশঃ জীবনের আধ্যাত্মিক দিকটায় অধিক মনোযোগ দাও। আর আমাদের আবশ্যক কিছু ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। দুই দেশে এ দুটি যত বাড়বে, ততই প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের মিলন হবে। উভয় দেশকেই শিখতে হবে পরস্পরের কাছ থেকে। কিন্তু ভারত উচ্চতম আদর্শকে আবহমান কাল থেকে ধরে আছে। পাশ্চাত্ত্য এখনও সে আদর্শ গ্রহণ করে নাই, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে করবে। হরি ওঁ তৎ সৎ।" তারপর স্বামী তুরীয়ানন্দ অতি অনুচ্চ স্বরে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন, "ওঁ ওঁ ওঁ, হরি ওঁ।" ভক্তগণের সহিত আলাপ করিতে করিতে মধ্যরাত্রি আগত হইল। কক্ষকর্ত্রী আসিয়া তাঁহাদিগকে বিশ্রাম করিতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "আমি সময়ের কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তোমাদের সঙ্গে আলাপ করে আমি বিশেষ প্রীত হয়েছি।" তখন ভক্তগণ স্বামীজীকে অভিবাদনপূর্বক বিদায় লইলেন। এইরূপে নিউইয়র্কে প্রত্যহ স্বামী তুরীয়ানন্দের নিকট ভক্তগণের সমাগম বাড়িতে লাগিল। ভক্তগণ তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া পরম প্রীতি ও প্রেরণা লাভ করিলেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দের সংস্কৃত শ্লোকের আবৃত্তি বা 'হরি ওঁ' প্রভৃতির উচ্চারণ অতি সুমিষ্ট ও ভাবোদ্দীপক ছিল। ভক্তগণ এগুলি খুব পছন্দ করিতেন। তাঁহার এই বিশেষত্বটি কেহ কেহ অচিরে লক্ষ্য করিলেন। কখনও কখনও হরি মহারাজ এরূপ উচ্চারণ ঘণ্টার পর ঘণ্টা করিতেন। কাহারও সঙ্গে কথা বলিতে বলিতেও তিনি মাঝে মাঝে এরূপ উচ্চারণে নিমগ্ন হইতেন। কাহাকেও কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসান্তে উত্তর শুনিবার

কালেও এরূপ করিতে তাঁহাকে দেখা যাইত। ভ্রমণে, উপবেশনে, আলাপে, সাধারণের সমক্ষে বা একাকী অবস্থানকালে তাঁহার মুখে এরূপ মধুর ধ্বনি উচ্চারিত হইত। লৌকিকতাবহুল পাশ্চাত্ত্যজীবনে এরূপ কার্য অনেকের নিকট প্রথম প্রথম কৌতুকজনক মনে হইত। জনাকীর্ণ পথে চলিতে চলিতে তিনি পরিবেষ্টনীর কথা বিস্মৃত হইয়া পথিমধ্যে উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান হইয়া এইরূপ উচ্চারণ করিয়া পথচারিগণের বিস্ময় উৎপাদন করিতেন। কৌতূহলী পথিকগণের কেহ কেহ তাঁহার দিকে হাস্যমুখে তাকাইতেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপও ছিল না।

বেদান্ত সমিতিতে ধ্যানের পূর্বে ও পরে এইরূপ উচ্চারণ করিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ ভক্তগণকে ধ্যানপ্রবণ করিতেন। রোমান ক্যাথলিক গীর্জাতে ধূপ জ্বালান হইলে যে সুগন্ধ বিচ্ছুরিত হইয়া প্রার্থনারত নরনারীগণকে অন্তর্মুখীন করে, সেইরূপ স্বামী তুরীয়ানন্দের প্রণবাদি-উচ্চারণ উত্তম আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি করিত। তাঁহার উচ্চারণ কখন উচ্চ কখন অনুচ্চ হইলেও সব সময়ই এক ললিত-গম্ভীর কম্পন-প্রবাহে পার্শ্ববর্তীদের আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত। স্বরের সঙ্গে সঙ্গে ভাবেরও পরিবর্তন দেখা যাইত। যতদিন আমেরিকায় ছিলেন, ততদিন তিনি উক্ত অভ্যাস ত্যাগ করেন নাই। উহা তাঁহার স্বভাবগত ছিল। ইহার দ্বারা তিনি মনে আধ্যাত্মিক চিন্তার নিরবচ্ছিন্ন ধারা রক্ষা করিতেন। যখন তিনি 'শান্তি আশ্রমে' ছিলেন তখনও এইরূপ করিতেন। যখন আশ্রমবাসীরা দুই-চারি জনে মিলিয়া বৃথা আলাপে বা গল্পগুজবে মত্ত হইতেন তখন হঠাৎ তাঁহারা শুনিতেন, দূর হইতে 'হরি ওঁ' ধ্বনি ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। উক্ত ধ্বনি অশরীরী বাণীর ন্যায় আশ্রমবাসীদিগকে তাঁহাদের জীবনোদ্দেশ্য স্মরণ করাইয়া দিত এবং বৃথা বাক্যব্যয় হইতে নিবৃত্ত করিত।

কাহারও সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে স্বামী তুরীয়ানন্দ ঐরূপ সুমধুর উচ্চারণ করিতে করিতে প্রায়ই সুদূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন, যেন তিনি অর্ধমনে সেখানে বর্তমান থাকিয়া কথাবার্তা শুনিতেছেন, আর মনের অপরার্ধ অন্য কার্যে ব্যাপৃত। নবাগতগণ প্রথমতঃ তাঁহার এই অন্তর্মুখীনভাব ধরিতে পারিত না। কিন্তু কয়েকদিন পরেই তাঁহারা বুঝিল যে, তাঁহার সমগ্র মনকে তিনি কখনও বহির্মুখী হইতে দিতেন না, কতক অংশকে তিনি সর্বদা ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন রাখিতেন—ইহা আলোচ্য বিষয়ে অন্যমনস্ক হওয়া নহে, ইহা অন্তর্মুখীনতা। সেইজন্য প্রশ্নোত্তরের সূত্রটি তিনি ভুলিতেন না এবং তাঁহার উত্তরগুলি যথাযথ হইত। একদা ব্রহ্মচারী গুরুদাস তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, "কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দুইটি প্রণালী আছে। একটিতে উত্তর বুদ্ধি হইতে আসে, অপরটিতে অন্তর হইতে। আমি অন্তর হইতে উত্তর দিই।" তাঁহার উত্তর অন্তর হইতে আসিত বলিয়া অল্প কথায় অধিক ভাব তিনি ব্যক্ত করিতে পারিতেন এবং তাঁহার দুই-চারিটি কথায় প্রষ্টার সংশয় দূর হইত। বুদ্ধিপ্রসূত উত্তর প্রষ্টার অন্তর স্পর্শ করিতে অসমর্থ। অন্তর্দৃষ্টিজাত উত্তরে সংশয় অনায়াসে নিরাকৃত হয়। স্বামী তুরীয়ানন্দ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি অন্তর্দৃষ্টিসহায়ে প্রষ্টার মনোভাব বুঝিয়া উত্তর দিতেন। সেইজন্য তিনি উত্তর দিতে কিঞ্চিৎ মন্থর ছিলেন। মনোভাব অনুযায়ী উত্তর দিতেন বলিয়া একই প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন প্রষ্টাকে বিভিন্ন প্রকারে দিতেন। সমবেত নরনারীগণের মধ্যে কেহ কেহ স্ব স্ব সংশয় প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন। অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহাদের মনোগত সংশয় বুঝিতে পারিয়া অযাচিত ভাবে উক্ত বিষয় উত্থাপন ও আলোচনা করিয়া অব্যক্ত সংশয়-সমূহের নিরাকরণ করিতেন। তাহা দেখিয়া ভক্তগণ চমৎকৃত হইতেন।

আধ্যাত্মিক প্রশ্নোত্তরীর ইহাই শাশ্বতী ধারা, যাহার পূর্ণ বিকাশ শিষ্যগণ শ্রীরামকৃষ্ণে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

নিউইয়র্কের জনৈক বন্ধু ১৮৯৯ খ্রীঃ ৮ই ডিসেম্বর তারিখে লিখিত একটি পত্রে[১] জানাইয়াছিলেন, "স্বামী তুরীয়ানন্দ এখন মাসাচুসেট্সের অতঃপাতী কেম্ব্রিজে আছেন। কেম্ব্রিজ সভাসমূহ এবং ব্রুকলিন নৈতিক সমিতির সভাপতি ডক্টর লুইস্ জেন্সের আমন্ত্রণে তিনি তথায় গিয়াছেন শঙ্করাচার্য সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিবার জন্য। গত রবিবার তাঁহার বক্তৃতা হইয়াছে। সেদিন তৎপ্রদত্ত বক্তৃতা সম্বন্ধে যে আলোচনা হয় তাহাতেও তিনি যোগদান করেন।"[২] সম্ভবতঃ কেম্ব্রিজ হইতেই তিনি বোষ্টনে যান।

মাদ্রাজের 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকায় ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী সংখ্যায় জনৈকা আমেরিকাবাসিনী ব্রহ্মচারিণী লিখিয়াছেন, "যাঁহারা স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত পরিচিত হন তাঁহারাই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হন। তিনি যেখানেই যান সেখানেই তিনি তাঁহার স্বল্পভাষিত্ব ও সুশান্ত স্বভাবের গুণে বহু অনুরাগী বন্ধু ও ছাত্র লাভ করেন।" উক্ত পত্রিকায় সেই বৎসরের ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় একই লেখিকা লিখিয়াছেন, "নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতির একটি নূতন কার্যের ভার নিয়েছেন স্বামী তুরীয়ানন্দ। সেটি হচ্ছে শিশুদের ক্লাশ; উহা শনিবার বৈকালে বসে। এতে হিতোপদেশ এবং অন্যান্য ভারতীয় গ্রন্থের গল্পগুলি সরল ইংরেজীতে বর্ণনা করে শিশুদিগকে নীতিশিক্ষা দেওয়া হয়। মৌমাছিরা যেমন

১ পত্রখানা ১৯০০ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসের 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত এবং উক্ত ইংরেজী মাসিকের সম্পাদককে লিখিত।

২ স্বামী তুরীয়ানন্দ তথায় একটি লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন। উহা 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় ১৯১৩ ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত এবং উহার অনুবাদ পরিশিষ্টে প্রদত্ত হয়।

সুগন্ধি ফুলের চারদিকে ঘিরে বসে, তদ্রূপ শিশুরা স্বামী তুরীয়ানন্দের মিষ্ট বাক্য ও মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তাঁর চারদিকে ভিড় করে বসে। ইহা অত্যন্ত চিত্তরঞ্জক দৃশ্য। যেদিন শিশুদের ক্লাশ আরম্ভ হয় সেদিন স্বামী তুরীয়ানন্দ যে বক্তৃতা দেন তাহাই আমেরিকায় তাঁর প্রথম বক্তৃতা সাধারণের সমক্ষে। সেদিন তিনি যিশুখ্রীষ্ট সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প বলেন এপোক্রাইফা (বাইবেলধৃত অপ্রামাণিক পুস্তকাবলী) হতে। এই খ্রীষ্টান দেশে উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের নিকট গল্পটি নূতন। শিশুদের ক্লাশ শেষ হলে স্বামী তুরীয়ানন্দ অনুরাগী ছাত্রছাত্রীগণকে নিয়ে ধ্যানাভ্যাস শিক্ষা দেন। ধ্যানের ক্লাশে লোকসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে।" 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকার ১৯০০ খ্রীঃ মার্চ সংখ্যায় উপরোক্ত ব্রহ্মচারিণী লিখিয়াছেন, "স্বামী তুরীয়ানন্দ শিশুদের জন্য যে ক্লাশ করছেন তা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক। শিশুরা তাঁর গল্প শুনতে খুব মনোযোগী ও আগ্রহান্বিত। ব্যক্তিগত নীতিশিক্ষা এবং অভিনব শিক্ষাপ্রণালীর জন্য অনেক বয়স্থ নরনারীও ক্লাশে যোগ দিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, কোন দর্শক উপস্থিত না হলে শিশুরা স্বাধীনভাবে সমগ্র মনোযোগ শিক্ষণীয় বিষয়ে দিয়া থাকে। সেজন্য বয়স্কগণকে উক্ত ক্লাশে যেতে দেওয়া হয় না।" স্বামী তুরীয়ানন্দ যখন মণ্ট ক্লেয়ারে ছিলেন তখনও তিনি প্রত্যেক শনিবার নিউইয়র্কে আসিয়া শিশুদের ক্লাশটি করিতেন।

'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকায় ১৯০০ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে প্রকাশিত এবং নিউইয়র্ক হইতে প্রেরিত সংবাদে জানা যায়, উক্ত বৎসর প্রায় সারা গ্রীষ্মকালটা স্বামী তুরীয়ানন্দ নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতিতে ছিলেন এবং স্বামী অভেদানন্দের অনুপস্থিতিতে সমিতির কার্য চালাইতেন। সমগ্র এপ্রিল ও মে মাসে তিনি সমিতিতে ক্লাশ ও বক্তৃতা করেন। তিনি

প্রত্যেক বিষয়ে প্রথম হইতে সুযোগ্য ধর্মশিক্ষকরূপে পরিচিত হইলেন তাঁহার শিক্ষাপদ্ধতি অপূর্ব সাফল্য ও সুখ্যাতি অর্জন করিল। ইতোমধ্যেই তাঁহার অনেক বন্ধু ও ভক্ত হইল। 'নিউইয়র্ক কমার্শ্যাল এড্‌ভার্টাইজার' পত্রে ১৯০০ খ্রীঃ এই সংবাদ[১] প্রকাশিত হয়। তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, স্বামী অভেদানন্দের অনুপস্থিতিতে এপ্রিল, মে এবং জুনের কিয়দংশে স্বামী তুরীয়ানন্দ নিউইয়র্ক কেন্দ্রের অধ্যক্ষতা করিতেছেন ও তাঁহার সাপ্তাহিক গীতা ক্লাশ বেশ জমিয়া আসিতেছে।

স্বামী তুরীয়ানন্দ নিউইয়র্কে প্রায় এক বৎসর ছিলেন। কিন্তু এই এক বৎসরেও তিনি দীর্ঘকাল স্থায়িভাবে নিউইয়র্কে থাকিতে পারেন নাই। স্বামী সারদানন্দ মণ্ট ক্লেয়ার নামক স্থানে বেদান্তপ্রচারে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। মণ্ট ক্লেয়ার নিউইয়র্ক হইতে বিশ মাইল দূরে নিউজার্সিতে অবস্থিত এবং মাত্র এক ঘণ্টার পথ। স্বামী সারদানন্দ ভারতে প্রত্যাগমন করিলে স্বামী তুরীয়ানন্দ মণ্ট ক্লেয়ারের বন্ধুগণের অনুরোধে তথায় কার্য আরম্ভ করেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ যখন মণ্টক্লেয়ার যাইতে সম্মত হন, তখন স্বামী অভেদানন্দ নিউইয়র্কে ছিলেন না। সেইজন্য তিনি এই সর্তে সম্মতি দেন যে, তিনি নিউইয়র্কের কাজও চালাইবেন। তিনি মণ্ট ক্লেয়ারে থাকিতেন, কিন্তু নিউইয়র্ক শহরে প্রত্যেক শনিবার আসিয়া রবিবার থাকিতেন এবং ক্লাশ বক্তৃতাদি করিতেন। নিউইয়র্কের ভক্তগণ তাঁহাকে সপ্তাহে দুই দিন পাইতেন।[২]

নিউইয়র্কের ন্যায় মণ্ট ক্লেয়ারেও স্বামী তুরীয়ানন্দ অল্পকালের মধ্যে বেদান্তানুরাগিগণের প্রিয় হইয়া উঠিলেন। মণ্ট ক্লেয়ারে স্বামী

১ 'ব্রহ্মবাদিন্' (অক্টোবর, ১৯০০) পত্রিকার উদ্ধৃত।

২ কলিকাতা অদ্বৈত আশ্রম হইতে প্রকাশিত 'With the Swamis in America' নামক পুস্তকের ৬০-৬১ পৃষ্ঠা দেখুন।

সারদানন্দের এক অনুরক্ত ভক্তের গৃহে তিনি বাস করিতেন। উক্ত গৃহ শিষ্টতা, নৈতিকতা, অমায়িকতা ও ভদ্রতার আকর ছিল। স্বামী তুরীয়ানন্দ গৃহটির পরিবেশ পছন্দ করিতেন এবং গৃহের প্রত্যেকেই তাঁহাকে গুরুবৎ শ্রদ্ধাভক্তি করিত। মার্কিন পারিবারিক জীবনের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তিনি উক্ত গৃহে দেখিতে পান। গৃহকর্তা ছিলেন ক্রীশ্চান সায়েন্টিষ্ট এবং গৃহকর্ত্রী ছিলেন ভক্তশ্রেণীর গোঁড়া বৈদান্তিক। স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রায়ই বলিতেন যে, গৃহকর্ত্রী মিসেস্ হুইলার অসাধারণ আধ্যাত্মিক ভাবের অধিকারিণী। তিনি বলিতেন, "স্ত্রীভক্তটি খুব সাত্ত্বিক, দৃঢ়চেতা ও প্রশান্ত। বিনা আপত্তিতে সে ঠিক কাজটি যথাসময়ে করিয়া থাকে।" বিবাহের পূর্বে যৌবনে উক্ত মহিলা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শনলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "উক্ত দর্শনে আমি এত অভিভূত ও মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে, আজীবন উক্ত মহাপুরুষের চিত্র আমার মানসপটে অঙ্কিত ছিল।" বহু বৎসর পরে স্বামী সারদানন্দের নিকট একটি ছবি দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারেন ইনি শ্রীরামকৃষ্ণ। উক্ত দর্শনলাভের পর হইতেই হিন্দু সাধুদিগকে অতি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। এই গৃহে থাকিবার কালে স্বামী তুরীয়ানন্দ ভারত হইতে একটি পত্র পান। উক্ত পত্রে এই দুঃসংবাদ ছিল যে, বাংলার এক অংশ দুর্ভিক্ষের করাল কবলে পতিত। গৃহকর্ত্রী দেখিলেন, পত্রপাঠে স্বামী তুরীয়ানন্দ মর্মাহত হইলেন। তিনি তুরীয়ানন্দ স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোন দুঃসংবাদ পেয়েছেন কি?" অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহাকে বাংলায় দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাবের কথা বলিলেন। গৃহকর্ত্রীর মুখ হইতে আর একটি কথাও নিঃসৃত হইল না। তুরীয়ানন্দ স্বামীর অজ্ঞাতসারে গোপনে তিনি বন্ধুদের নিকট হইতে কয়েক দিনের মধ্যে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া উহা দুর্ভিক্ষপীড়িতদের নিকট

প্রেরণার্থ তাঁহার হাতে দিলেন। এমনি দয়াশীলা ও উচ্চমনা তিনি ছিলেন।

নিউইয়র্কের ভক্তগণ শীঘ্রই পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারিলেন যে, স্বামী তুরীয়ানন্দ বহুলোকের সমাগমে প্রতিষ্ঠান-গঠনাদি অপেক্ষা মুষ্টিমেয় লোকের ব্যক্তিগত জীবনগঠনের অধিক পক্ষপাতী। তিনি বলিতেন, "বক্তৃতাবলী জনসাধারণকে আকৃষ্ট করবার জন্য। কিন্তু প্রকৃত কাজ হয় কেবলমাত্র ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সংস্পর্শ দ্বারা। উভয়ই আবশ্যক। প্রত্যেকের কর্মধারা পৃথক্। আমাদের প্রত্যেকের স্ব স্ব প্রণালী অনুসরণ করতে হবে। স্বামী অভেদানন্দ বক্তৃতাবলীর দ্বারা বহু লোককে আকৃষ্ট করবেন। কিন্তু সে পথ আমার নহে। আমি স্বামীজীর বিশেষ নির্দেশ পেয়েছি। আমি খুব বক্তৃতাদি দিই এটা স্বামীজী চান না। এখানে পাঠাবার পূর্বে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার মত কি তুমি বক্তৃতাদি দিতে পারবে?' আমি বলিলাম, 'নিশ্চয় না, স্বামীজী। আপনি কি বলছেন?' তিনি বললেন, 'বেশ। তা'হলে বক্তৃতাদির জন্য ব্যস্ত হয়ো না। তুমি ওখানে আদর্শ সন্ন্যাসীর জীবন যাপন কর। তাদের জীবন্ত উদাহরণ দেখাও। তারা দেখুক, সন্ন্যাসীরা কেমন জীবন যাপন করে।' সুতরাং দেখ, আমি কেবল স্বামীজীর নির্দেশ পালন করছি।"

কিন্তু স্বামী তুরীয়ানন্দ বক্তৃতা একেবারে এড়াইতে পারেন নাই। স্বামী অভেদানন্দের অনুপস্থিতিতে নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতির সম্পূর্ণ ভার তাঁহার উপর পড়িত। তখন তাঁহাকে বক্তৃতা দিতে হইত। সাধারণতঃ তাঁহার বক্তৃতাবলী সংক্ষিপ্ত অথচ সারবান হইত। বেদান্ত সমিতিতে ক্ষুদ্র শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে তাঁহাকে বক্তৃতা দিতে হইত বলিয়া তিনি স্বীয় প্রণালী অনুসরণ করিতে পারিতেন। প্রথমে

তিনি শ্রোতৃবর্গকে কিছুক্ষণ ধ্যান করিতে বলিতেন এবং ধ্যানের পরই তাঁহার প্রবচন আরম্ভ হইত। সেইগুলিতে তিনি ধর্মের সাধনার দিকটায় বিশেষভাবে জোর দিতেন এবং মূল বিষয়গুলিকে পুরাণ ও অন্যান্য শাস্ত্র হইতে আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়া উদাহরণ দিয়া বুঝাইতেন। এইরূপে তাঁহার ভাষণগুলি বেদান্তানুরাগীদের ধর্মজীবনের বিশেষ সহায়ক হইত। বক্তৃতার পর প্রশ্নোত্তরকালে তাঁহার উত্তরগুলি খুব শিক্ষাপ্রদ হইত।

বক্তৃতাদি করিলেও স্বামী তুরীয়ানন্দ অনুরাগী ভক্তগণের আধ্যাত্মিক জীবনগঠনে অধিক মনোযোগ দিতেন। ভাস্কর যেমন খানিকটা কাদা লইয়া সুন্দর মূর্তি গঠন করেন, স্বামী তুরীয়ানন্দ তদ্রূপ তাঁহার অনুরাগী ছাত্রগণকে লইয়া তাহাদের ধর্মজীবনগঠনে ব্রতী হইলেন। এইরূপে লক্ষ্য স্থির করিয়া তিনি ঐ কর্মে প্রাণ ঢালিয়া দিলেন। ছাত্রছাত্রীগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া তাহাদের অজ্ঞাতসারে সকলের দৃষ্টিভঙ্গী বদলাইয়া দিতেন। উদ্দেশ্যের একতানতা, প্রণালীর স্বাভাবিকতা এবং হৃদয়ের একনিষ্ঠতাই ছিল তাঁহার বিশেষত্ব। তিনি তাহাদের সঙ্গে উচ্চ ধর্মজীবন সহজভাবে যাপন করিয়া যাইতেন এবং তন্মধ্যে নিহিত আধ্যাত্মিকতার অনন্ত প্রস্রবণ অগোচরে প্রবাহিত হইয়া নিকটবর্তী সকলকে দিব্যভাবে অনুপ্রাণিত করিত। তাঁহার ধর্মশিক্ষা স্বাভাবিক ছিল বলিয়া এত সফল, এত অমোঘ হইত। প্রাণহীন, প্রেরণারহিত হইলে ধর্মশিক্ষা কৃত্রিম ও কষ্টকর হয়। কিন্তু স্বামী তুরীয়ানন্দের প্রণালী ছিল প্রাণবন্ত ও প্রেরণাপূর্ণ। একত্র উপবেশন, ভ্রমণ বা আহারের সময়, অনর্গল তাঁহার আলোচনা চলিত। ভক্তগণ বুঝিতে পারিতেন না কিরূপে তিনি সর্বদা আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে সমর্থ হইতেন। গুরুদাস মহারাজ একদিন তাঁহাকে একবার

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "স্বামীজী, সর্বদা সৎপ্রসঙ্গ করা কিরূপে আপনার পক্ষে সম্ভব হয়? আপনার ভাণ্ডার কি নিঃশেষিত হয় না?" তিনি উত্তর দিলেন, "দেখ, আমি যৌবন থেকে এই জীবন যাপন করে আসছি। এটি আমার জীবনের অভিন্ন অংশস্বরূপ হয়ে গেছে। মনে মা ধর্মভাবের রাশ ঠেলে দেন। তাঁহার ভাণ্ডার অফুরন্ত। যা খরচ হয়ে যায় মা তৎক্ষণাৎ তা পূর্ণ করে দেন।" ইহা শুনিয়া গুরুদাস মহারাজ-প্রমুখ ভক্তগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

নিউইয়র্কে অবস্থানকালে স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রায়ই গুরুদাস মহারাজকে সঙ্গে লইয়া প্রাতে বা সন্ধ্যায় দীর্ঘ ভ্রমণে বাহির হইতেন। গুরুদাস মহারাজ আলাপপ্রিয় ছিলেন না, তিনি ছিলেন ধীর স্থির মনোযোগী শ্রোতা। সেইজন্য স্বামী তুরীয়ানন্দ একাই ভ্রমণের সব সময়টি সদালাপ করিতেন। তাঁহার কথায় উৎসাহ ও উদ্দীপনার স্ফুলিঙ্গ ছড়াইয়া পড়িত। সব কিছুর কথা তখন ভুলিয়া তিনি আলোচ্য বিষয়ে আত্মহারা হইতেন। যিনি তাঁহার কথা শুনিতেন তিনিই নবালোক পাইতেন। সকল শ্রেণীর লোকই তাঁহার কাছে যাইত। প্রত্যেকেই তাঁহার সৎসঙ্গকে মূল্যবান ও দুর্লভ জ্ঞান করিত। সৎপ্রসঙ্গকালে তাঁহার কেমন উন্মাদনা আসিত, সে সম্বন্ধে একটি ঘটনা গুরুদাস মহারাজ লিখিয়া রাখিয়াছেন। একদা উভয়ে নিউ-ইয়র্কের এক সম্ভ্রান্ত ও সুসজ্জিত রাস্তায় বেড়াইতেছিলেন। যতই স্বামী তুরীয়ানন্দ আলোচ্য বিষয়ে মগ্ন হইতেছিলেন ততই তিনি দ্রুতগতি ও উচ্চকণ্ঠ হইয়া উঠিতেছিলেন। পথিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইহাই যথেষ্ট ছিল। তদুপরি সুসভ্য নিউইয়র্কবাসিগণের বিস্ময় কল্পনা করুন, যখন হরি মহারাজ হঠাৎ রাস্তায় দাঁড়াইয়া শূন্যে হস্ত তুলিয়া এক প্রকার চীৎকার করিয়া বলিলেন, "গুরুদাস! সিংহতুল্য

হও, সিংহতুল্য হও, পিঞ্জর ভগ্ন করিয়া মুক্ত হও। একটা বড় লম্ফ দাও, এবং কাজ শেষ কর।"

বক্তব্য বিষয়টি বোধগম্য করিবার জন্য স্বামী তুরীয়ানন্দ অনেক উপাখ্যান বলিতেন। একবার তিনি বলিয়াছিলেন, "একজাতীয় সাপ আছে যারা ডিম পেড়ে ঐগুলির চারদিকে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে। ডিম থেকে ছানা বেরুলেই মা ছানাটিকে গিলে ফেলে। কিন্তু কতকগুলি নবজাত সর্প এত ক্ষিপ্র ও চতুর হয় যে, তারা তৎক্ষণাৎ লাফ দিয়ে মায়ের কুণ্ডলীর বাইরে পালায় এবং মৃত্যু হতে রক্ষা পায়। যারা আজন্মমুক্ত তারা তদ্রূপ। জন্ম থেকে তারা মুক্ত হওয়ায় মহামায়া তাদের আর ফাঁদে ফেলতে পারেন না।"

ব্রহ্মচারী গুরুদাস তখন জীবনের পথ পরিবর্তন করিবার জন্য সঙ্কল্প করিতেছিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ ক্ষণিক উদ্দীপনায় কার্য করিতে তাঁহাকে নিষেধ করিলেন এবং যাহা করিতে যাইতেছেন তাহার গুরুত্ব গভীরভাবে বিচার করিতে বলিলেন। এই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আখ্যায়িকাটি তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন: একদা একটি ব্যাধ সারাদিন জঙ্গলে কোন শিকার পায় নাই। বিষণ্ণ এবং শ্রান্ত হইয়া সে একটি গাছের তলায় বিশ্রাম করিতেছিল। তাহার শিকারের সঙ্গী একটি শ্যেনপাখী কাছে বসিয়াছিল। ব্যাধ অতিশয় পিপাসার্ত ছিল, কিন্তু জলের সন্ধান পায় নাই। তারপর সে লক্ষ্য করিল গাছ হইতে ধীরে ধীরে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতেছে। আনন্দিতচিত্তে সে দুষ্প্রাপ্য জল ধরিবার জন্য পেয়ালাটি যথাস্থানে রাখিল। পেয়ালাতে ফোঁটা ফোঁটা জল জমিয়া উহা পূর্ণ হইল। প্রলুব্ধভাবে ব্যাধ পেয়ালাটি ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল। এমন সময় উক্ত পাখী দ্রুতবেগে আসিয়া পেয়ালাটি উল্টাইয়া দিল। সব জল মাটিতে পড়িয়া গেল। ব্যাধ ভীষণ বিরক্ত হইয়া পাখীটিকে

ভৎর্সনা করিল এবং পেয়ালা পুনরায় যথাস্থানে স্থাপন করিল। পুনরায় পেয়ালাটি ধীরে ধীরে পূর্ণ হওয়া মাত্র ব্যাধ সানন্দে হাত বাড়াইল। উহা ধরিতে না ধরিতেই পাখীটি পূর্ববৎ পেয়ালা উল্টাইয়া দিল। ব্যাধ তখন ক্রোধে অভিভূত হইয়া পাখীটিকে এক মুষ্ট্যাঘাতে বধ করিল। পুনরায় সে পেয়ালাটি যথাস্থানে রাখিয়া নিশ্চিন্তমনে ভাবিতেছিল, সে এবার নিশ্চয়ই জল খাইতে পাইবে। জল কোথা হইতে পড়িতেছে দেখিবার জন্য যেই সে উর্ধ্বে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, অমনি সে দেখিতে পাইল গাছের এক উচ্চ শাখা হইতে এক মস্ত বড় সাপ নীচের দিকে মুখ করিয়া ঝুলিতেছে এবং তাহার ফণা বিস্তৃত থাকায় ফোঁটা ফোঁটা বিষ তাহার মুখ হইতে পড়িতেছে। পাখী দুবার তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছিল; আর তাকেই সে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়াছে! অবর্ণনীয় শোকে ব্যাধ তাহার পুরাতন বিশ্বস্ত বন্ধুর মৃতদেহটি কবর দিল। এই ক্ষুদ্র বন্ধুটি বহু বৎসর তাহার সেবা করিয়াছিল এবং শেষে তাহার জীবন রক্ষা করিল। সুতরাং দেখ, যাহা তোমার শ্রেষ্ঠ সুহৃদ হইতে পারে তাহাকে হঠাৎ ত্যাগ করিও না। সযত্নে বিবেচনা কর।

উপাখ্যানটি গুরুদাস মহারাজকে স্বীয় ভবিষ্যৎ বিচারে প্রণোদিত করিল।

স্বামী তুরীয়ানন্দের জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাগুলিও স্থানীয় ভক্তগণের শিক্ষাপ্রদ হইত। এক সন্ধ্যায় গুরুদাস মহারাজ বেদান্ত সমিতিতে আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "স্বামীজী, আজ রাত্রে খুব সুন্দর ঐক্যতান বাদ্য হবে। ইহা একটি গির্জার সঙ্গীত এবং নিশ্চয়ই আপনার খুব ভাল লাগবে। আপনি আমাদের পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত কখন শোনেন নাই। আমরা যাই, চলুন।" স্বামী তুরীয়ানন্দ উত্তেজিতস্বরে বলিলেন, "ঐসকল বিষয়ের দিকে কেন নজর দাও? তোমাদের ত ঐসকল

যথেষ্ট হয়েছে। এস, আমরা এখানে থেকে কোন ভাল বিষয় পড়ি বা আলোচনা করি। এখন ঐসকল আমোদপ্রমোদ ত্যাগ করতে হবে যদি আমরা মাকে পেতে চাই।" গুরুদাস মহারাজ বলিলেন, "নিশ্চয়ই, স্বামীজী। আমি সানন্দে আপনার পূতসঙ্গে এখানে থাকব। আমি ভেবেছিলাম, হয়তো আপনি যাবেন।" তখন উভয়ে সেই সন্ধ্যা উচ্চাঙ্গ আলোচনায় কাটাইলেন। সংসারসুখের প্রতি স্বামী তুরীয়ানন্দের আদৌ টান ছিল না। সাগরপারে নূতন সুসভ্য দেশে যাইয়াও দ্রষ্টব্য স্থান এবং বস্তু দেখিবার কৌতূহল তাঁহার মনে স্থান পাইল না। আত্মারাম পুরুষের মনে কৌতূহল প্রবেশ করিতে পারে না। ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গেই তিনি পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দ নিজস্ব সরলভাবে লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেন। তিনি গুরুদাস মহারাজের সঙ্গে নিরামিষ ভোজনের একটি ছোট দোকানে যাইতেন। দোকানটিতে লোকসমাগম অল্পই হইত। সেইজন্য তাঁহারা উভয়ে আহারান্তে স্বাধীনভাবে আলাপ করিতেন। ভোজনাগারের ভার ছিল একটি তরুণীর উপর। যে অল্পসংখ্যক অতিথি দোকানে আসিত তরুণীটি তাহাদের সৎকার করিত। তরুণীটি সরলহৃদয়া, স্বাধীনচেতা এবং নম্রস্বভাবা ছিল বলিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহাকে খুব পছন্দ করিতেন। একদা স্বামী তুরীয়ানন্দ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?" সে উত্তর দিল, "আমার নাম মেরী।" "আহা! তোমার নামটি কি মধুর ও সার্থক! যীশুর মা ছিলেন মেরী।" বালিকাটি অতিশয় আনন্দিতা হইয়া বলিল, "চমৎকার কথা, স্বামীজী। আমি আমার নামের এই অর্থ কখনও ভাবি নাই। এই অর্থ একটি স্বর্গীয় সংযোগসূত্র আমার মনে আনিয়া দিল। আপনি অনুগ্রহ করে এটি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন।" স্বামী

তুরীয়ানন্দ উত্তর দিলেন, "হাঁ। আমি তোমাকে এখন থেকে যীশু খৃষ্টের মা বলে মনে করব। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো। আমি যীশুকে ভক্তি করি। তিনিও একজন সন্ন্যাসী ছিলেন এবং পরার্থে প্রাণদান করেছিলেন।" এই সামান্য আলাপের পর হইতে বালিকাটি স্বামী তুরীয়ানন্দের প্রতি ভক্তিসম্পন্না হইল। তিনি দোকানে আসিলেই বালিকাটি খুব খুশী হইত। এইভাবে তাঁহার পুণ্যপ্রভাব বালিকার জীবনে স্থায়ী রেখাপাত করিল।

স্বামী তুরীয়ানন্দ ক্বচিৎ স্বীয় জীবন ও অনুভূতির কথা অপরকে বলিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের কথাই তাঁহার মুখে সর্বদা শুনা যাইত। তবে গুরুদাস মহারাজকে একাকী পাইলে কখন কখন তিনি স্বীয় জীবনের দুই-একটি ঘটনা বলিয়া ফেলিতেন। একদিন তিনি গুরুদাস মহারাজকে বুঝাইতেছিলেন, ধর্মসম্বন্ধে যাহা শুনা যায় তাহা অভ্যাস না করিলে শিক্ষা নিরর্থক। তিনি বলিলেন, "সর্বদা খাঁটি হও। ভাবের ঘরে যেন চুরি না হয়। সত্যসঙ্কল্প হও। অন্য কাজে জড়িয়ে পড়ো না। ঈশ্বরলাভের পথে সোজা চল। অসীম সাহসে বুক ভরে রাখ। যৌবনেই আমি বেদান্ত-অধ্যয়ন ও অভ্যাস আরম্ভ করেছিলাম। আমি সর্বদা চেষ্টা করতাম স্মরণ রাখতে যে, আমি শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মা।" এই বলিয়া গঙ্গায় কুম্ভীর দেখার ঘটনাটি বর্ণনা করিলেন। তাঁহার বর্ণনাভঙ্গী এত প্রাণস্পর্শী ছিল যে, লেখনীতে তাহা প্রকাশ করা যায় না। যে অসুখের যে ঔষধ তাহা যদি ঠিক সময়ে দেওয়া যায় তাহা হইলে রোগী অচিরে রোগমুক্ত হয়; স্বামী তুরীয়ানন্দ তেমনি উপযুক্ত সময়ে ঠিক কথাটি এমনভাবে বলিতেন যে, উহাতে শ্রোতার মনে গভীর রেখাপাত করিত।

একদা ব্রহ্মচারী গুরুদাস কিঞ্চিৎ বিষণ্নমনা হইয়াছিলেন। তাহা

দেখিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ নিম্নোক্ত ঘটনাটি তাঁহাকে বলেন, "বহু বৎসর পূর্বে আমরা যখন পুরাতন মঠে বাস করছিলাম, তখন একবার ঘটনাক্রমে আমি খুব বিষণ্ণ হয়েছিলাম। সেজন্য কিছুকাল আমি ধর্মপথে অগ্রসর হতে পারি নাই এবং প্রত্যেক জিনিস আমার কাছে অন্ধকারময় ঠেকত। একদিন মঠের খোলা ছাদে আমি পায়চারী করছিলাম। তখন সন্ধ্যাকাল এবং চন্দ্র মেঘাবৃত ছিল। আমার মন এত খারাপ ছিল যে, ঘুমের সম্ভাবনা কিছুই ছিল না। তখন হঠাৎ মেঘের আড়াল থেকে চন্দ্র বহির্গত হল এবং বিশ্ব সুন্দর ও উজ্জ্বল দেখাল। যখনই তা দেখলাম তখনই ভাবলাম, 'দেখ, চাঁদ সব সময় আকাশে ছিল; কিন্তু আমি তা দেখতে পাই নি। সেইরূপ আত্মা নিত্যবস্তু, অজর, অমর, দুঃখের অতীত, স্বমহিমায় সদা জ্যোতিষ্মান। কিন্তু আমি তা জানতে পারি নি। অজ্ঞানমেঘ আমার বুদ্ধি এবং আত্মার মধ্যে এক পর্দা সৃষ্টি করেছিল।' এইরূপ ভাবতে ভাবতে আমার সকল সংশয় নিবৃত্ত হল, বিষাদ চলে গেল, মনে জোর এল, চিত্ত আনন্দে ভরে উঠল।"

আর এক সময় স্বামী তুরীয়ানন্দ গুরুদাস মহারাজকে এই ঘটনাটি বলিয়াছিলেন। বহু বৎসর পূর্বে যখন তিনি পরিব্রাজকবেশে পদব্রজে ভারতের তীর্থগুলি ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন একদিন এক চিন্তা তাঁহার অন্তর্দাহ সৃষ্টি করিয়া বসিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "আমি ভবঘুরের জীবনযাপন করছি। এ জগতে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু কাজ করছে, কেবল আমিই নিষ্কর্মা। এ কি করছি?" এই মর্মন্তুদ দুশ্চিন্তার হাত হইতে তিনি নিজেকে মুক্ত করিতে পারিতেছিলেন না। নিজেকে এক ক্ষুদ্র নগণ্য নিষ্প্রয়োজন প্রাণিরূপে মনে হইত। বিষাদে মুহ্যমান হইয়া তিনি এক গাছের তলায় শুইয়া পড়িলেন। শ্রান্তি অচিরেই নিদ্রা আনয়ন করিল; তিনি এই অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলেন—

ভূমির উপরে তাঁহার দেহ শায়িত। উহা চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া বৃহদাকার ধারণ করিয়াছে। ক্রমে দেহ অসীমে মিশিয়া গেল। তখন তাঁহার অন্তর হইতে কে বলিয়া উঠিল, "দেখ, তুমি কত মহান, কত বিরাট! তুমি সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছ। কেন তুমি মনে কর তোমার জীবন ব্যর্থ? সত্যের একটি কণা সমগ্র মায়াময় জগৎকে আচ্ছন্ন করিতে পারে। উহাই মহত্তম উৎকৃষ্টতম জীবন।" তিনি জাগ্রত হইয়া এক লম্ফে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার সকল সংশয় তিরোহিত হইল।

সকলকে উৎসাহ দেওয়া ছিল স্বামী তুরীয়ানন্দের জীবনধর্ম। তিনি প্রত্যেককে বলিতেন, "লেগে থাক, লেগে থাক। মুষ্টি দৃঢ় করে বল, 'আমি সিদ্ধিলাভ করবই।' এখন না হলে কখনও হবে না. 'এই জীবনেই আমি ঈশ্বরদর্শন করব,' এই তোমার মন্ত্র হউক—এইটিই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। সাধনা কখনও শ্লথ বা বন্ধ করো না। যেটিকে তুমি সত্য বলে বোঝ, সেটিকে এইক্ষণেই সাধন কর, জীবনে রূপায়িত কর। সাবধান, যেন সুযোগ চলে না যায়। অন্যান্য বহু শুভেচ্ছায় মন বিক্ষিপ্ত হলে ঈশ্বরলাভে বিঘ্ন বা বিফলতা অপরিহার্য। মনে রেখো, বীরের জন্যই এই জীবন, আর অধ্যবসায়িগণ জীবনসংগ্রামে জয়ী হয়, দুর্বলেরাই বিফলমনোরথ হয়। জান, যিশু কি বলেছিলেন? —'যে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে সেই স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হয়।' সর্বদা সতর্ক থাকিবে। কখনো দুর্বলতার কাছে মাথা নীচু করো না। কখনো নিজেকে নিরাপদ ভেবো না। যতদিন শরীর থাকে, ততদিন প্রলোভন আসে।" এই প্রসঙ্গে তিনি নিম্নোক্ত গল্পটিও বলিতেন।

ভারতে একটি বৃদ্ধ সন্ন্যাসী কোন এক গ্রামের পাশে এক জঙ্গলে থাকিতেন। তাঁহার ক্ষুদ্র কুটীরের অধিক দূরে তিনি যাইতেন না

এবং সে পথে অতি অল্প লোকেই যাতায়াত করিত। গ্রামবাসিগণ মাঝে মাঝে সাধুর কাছে ধর্মশিক্ষার জন্য আসিত। তাহারা যখন আসিত, তখন সাধুটির জন্য কিছু ফলমূল ও চাউল প্রভৃতি আনিত। ইহাতেই সাধুর জীবনধারণ হইত। একদিন তিনি কুটীরে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় মেয়েদের পায়ের মলের শব্দ শুনিতে পাইলেন। কি করিতে যাইতেছেন তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্বেই তিনি আসন ছাড়িয়া কুটীরের বাহিরে পুত্তলিকাবৎ যাইয়া গম্যমান নারীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে চলিলেন। তিনি গত ত্রিশ বৎসর নারীমুখ দর্শন করেন নাই। বিবেক জাগ্রত হইয়া বাধা দিল। তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন, ভাবিলেন, "আমি কি করতে যাচ্ছি?" এই চিন্তা তাঁহার মনকে আলোড়িত করিল—"ত্রিশ বৎসর যা বিষবৎ পরিত্যাগ করেছি, তা আমাকে এই বৃদ্ধ বয়সে প্রলুব্ধ করছে? কুকুর যেমন মাংস দেখলে লোভে উহার দিকে ধাবিত হয়, আমিও তদ্রূপ যন্ত্রবৎ নারীর দিকে আকৃষ্ট হচ্ছি? ধিক্! শত ধিক্!! যে অধম পদদ্বয় আমাকে এতদূর টেনে এনেছে, আমি তাদের শাস্তি দেব। এই দেহকে আর কোথাও কখনো তোমরা বহন করতে পারবে না।" অনুতাপানলে জ্বলিতে জ্বলিতে চলচ্ছক্তিহীন হইয়া তিনি সেই স্থানেই বসিয়া পড়িলেন—একটি পদও অন্যস্থানে না যাইয়া তিনি তথায় কয়েক বৎসর পরে দেহরক্ষা করিলেন। উপসংহারে স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "ঈশ্বরলাভের পথে দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায় যেমন আছে, তেমনি অদম্য অধ্যবসায় ও ইচ্ছাশক্তি চাই।"

একদা নিউইয়র্কে ব্রহ্মচারী গুরুদাস কতিপয় দিবস নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় স্বামী তুরীয়ানন্দকে দেখিতে যাইতে পারেন নাই। অবশেষে এক বৈকালে অবসর হওয়ায় তিনি বেদান্ত সমিতিতে স্বামী

তুরীয়ানন্দের সঙ্গে দেখা করিতে যান। স্বাগত সম্ভাষণের পর স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এতদিন কোথায় ছিলে, গুরুদাস? এস, বেড়াতে যাই। বাড়িতে বসে কি হবে? এই কয়দিন বেড়াবার সঙ্গী পাই নি।" গুরুদাস মহারাজ উত্তরে বলিলেন, "স্বামীজী, বেড়ান আমিও ভালবাসি। আপনার ভারী কোটটা গায়ে দিন এবং বুটটা পায়ে পরুন। খুব শীত পড়েছে।" তখন শীতকাল। নিউইয়র্ক শহরের প্রশস্ত পরিষ্কার রাস্তাগুলি টাট্‌কা বরফে ঢাকা। যখন উভয়ে একটি বৃক্ষ-সমাকীর্ণ স্থানে আসিলেন তখন স্বামী তুরীয়ানন্দ বরফের দৃশ্য দেখিয়া বালকবৎ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গাছের প্রত্যেক শাখা শুদ্ধ শুভ্র সূর্য্যকরোজ্জ্বল বরফে আচ্ছাদিত। সেই মনোহর দৃশ্য দেখাইয়া তিনি উচ্ছ্বসিত আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, "দেখ, দেখ, কি চমৎকার দৃশ্য! আমি এ দেশের শীতকাল বড় ভালবাসি। কি প্রাণমাতান হাওয়া!" তাঁহারা একটি প্রকাণ্ড পুষ্করিণীর কাছে আসিয়া দেখিলেন বালক-বালিকারা জমাট জলের উপর স্কেট পরিয়া খেলা করিতেছে। পরিশ্রমে শ্বেতকায় বালক-বালিকাদের গণ্ডদেশ গোলাপফুলের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে। আনন্দে আত্মহারা হইয়া তাহারা ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি ছুটাছুটি করিতেছে। স্বামী তুরীয়ানন্দ ছেলেমেয়েদের আনন্দময় খেলা দেখিয়া আহ্লাদে গুরুদাস মহারাজকে বলিয়া উঠিলেন, "এইজন্যই তোমরা এত স্বচ্ছ, এত সবল। দেখ, মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে কেমন নিঃসঙ্কোচে খেলছে! কি স্বাধীনতা! কত সরল ও পবিত্র এরা! দেবভোগ্য এ দৃশ্য। আমাদের দেশে যদি এমন হ'ত! চল, একবার বরফের উপরে যাই। তুমি কি স্কেটিং জান?"

গুরুদাস মহারাজ সোৎসাহে বলিলেন, "আমি স্কেটিং খুব ভালবাসি।

হল্যাণ্ডে প্রত্যেকেই স্কেটিং করে।" বরফ পিচ্ছল থাকায় তুরীয়ানন্দ মহারাজের উহার উপর চলিতে কষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি বেশ আনন্দ লাভ করিলেন।

সমিতিতে ফিরিবার পথে স্বামী তুরীয়ানন্দ ভারতের দারিদ্র্য এবং ভারতীয় রমণীগণের সঙ্কীর্ণ কর্মজীবনের কথা তুলিলেন। ভারতের দুর্দশার কথা বলিতে বলিতে তাঁহার মুখমণ্ডলে বিষাদের ছায়া পড়িল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি গুরুদাস মহারাজকে বলিলেন, "তোমাদের মত আমরা কবে ধনী ও স্বাধীন হব?" গুরুদাস মহারাজ অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করায় হরি মহারাজ আবার প্রফুল্ল হইলেন। তিনি গুরুদাস মহারাজকে ভারতের প্রাচীন প্রথা, তীর্থপর্যটনকালে পরিদৃষ্ট বিভিন্ন প্রকৃতির লোক এবং তাহাদের জীবনযাত্রা, ভাষা ও পোষাক, বিভিন্ন তীর্থযাত্রী ও তীর্থস্থান এবং গঙ্গাতীরে ধ্যানরত সাধুদের কথা বলিলেন। ভারতপ্রসঙ্গ শুনিয়া গুরুদাস মহারাজ বলিলেন, "এটি যেন অন্য জগতের গল্পের মত শোনাচ্ছে। ভারত সত্যই পুণ্যভূমি। ও-দেশের লোকেরা আমাদের দেশের লোকদের চেয়ে নিশ্চয়ই ভাল।" গুরুদাস মহারাজের মন্তব্য শুনিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ হাসিয়া বলিলেন, "মানবচরিত্র সর্বত্র একই প্রকার। ভারতে পর্দাপ্রথা ব্যতীত অন্য সবই উন্মুক্ত ও অনাবৃত। আমরা আমাদের স্বভাবকেও গোপন রাখতে পারি না। কিরূপে তা করতে হয় তোমরা বেশ জান। তোমরা সকলে মুখোস পড়ে থাক। যখন তোমরা কষ্টভোগ কর, তখনও তোমরা হাস। যখন তোমরা গরীব হও, তখনও কয়েকটি সস্তা চাকচিক্যময় জিনিস কিনে ধনীর বেশে থাক। যখন তোমরা দুঃখে পড় তখনও বল—ভাল আছি। যখন তোমরা অসুস্থ হও তখনও বল—এর চেয়ে ভাল কখনও বোধ করি নি। আমরা তা করি না।" ইহা বলিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ উচ্চ হাস্য করিলেন।

গুরুদাস মহারাজ স্বামী তুরীয়ানন্দের মন্তব্য শুনিয়া বলিলেন, "আপনি জানেন, ইহার কারণ কি? আমরা কারও সহানুভূতি চাই না। সেইজন্যই এইরূপ করে থাকি।" স্বামী তুরীয়ানন্দ সহাস্যে প্রত্যুত্তর করিলেন, "ইহাই অহঙ্কার। তোমরা সহানুভূতি দিতে চাও, কিন্তু নিতে চাও না। তোমরা অপরের সহায়ক হতে চাও, কিন্তু অপরকে তোমাদের সহায়ক হতে দাও না। দিতে যেমন প্রস্তুত থাকবে, নিতেও তেমনি সমানভাবে প্রস্তুত থাক। আদান ও প্রদান দুয়েই অনাসক্ত হও। তা'হলে অহঙ্কার বা আত্মম্ভরিতা আসবে না। আমরা একলা এ জগতে থাকতে পারি না, আমরা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল।"

গুরুদাস মহারাজ বাধা দিয়া বলিলেন, "অবশ্যই। আমি নিরর্থক সহানুভূতির কথা বলছিলাম। প্রকৃত হিতকারকের সহানুভূতি আমরা সবাই চাই। কিন্তু অতীতে অর্থহীন, ভাবপ্রবণ সহানুভূতি আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে।" স্বামী তুরীয়ানন্দ পরিবর্তিত ভাবে সাগ্রহে ইহা স্বীকার করিয়া বলিলেন, "হাঁ, হাঁ। পাশ্চাত্ত্যের নব মনোবিজ্ঞান এই প্রতিক্রিয়াটি এনেছে। আমাদের ঋষিরা বহুযুগ পূর্বে যে চিন্তাশক্তি শিক্ষা দিয়েছিলেন, তার মূল্য তোমরা বুঝতে আরম্ভ করেছ। আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা যতই আমরা ভাবব, ততই আমাদের অশান্তি বাড়বে। তোমাদের ভাব হচ্ছে বিফলতাকে পদাঘাত করে সফলতার দিকে বাধাবিঘ্ন ঠেলে এগিয়ে যাওয়া। এ খুব প্রশংসনীয়। জীবনের প্রতি তোমাদের আশাপূর্ণ সদানন্দ দৃষ্টি আমি পছন্দ করি। বিফলতাকে তোমরা সফলতার সোপানরূপে ব্যবহার কর। তোমরা আজ পতিত, কাল উন্নত।"

তারপর গুরুদাস মহারাজের কাঁধের উপর হাত রাখিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "ইহাই পৌরুষ, ইহাই শৌর্য। আমাদের ইহাই

আবশ্যক।" একটু নীরব থাকিয়া তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, "কিন্তু আমি বলতে চেয়েছিলাম যে, আমরা ঘরের বাইরে থাকি। একটি ছাদযুক্ত চারিটি দেওয়ালের মধ্যে তোমরা যে জিনিসগুলি এত যত্ন করে লুকিয়ে রাখ, আমরা ইচ্ছা করলেও তা করতে পারতাম না। ভারতের অধিকাংশ লোকেই গরীব এবং পর্ণকুটীরে বাস করে। সেইজন্য তারা দিবারাত্রির বেশী সময় খোলা জায়গায় থাকে। যখন তোমরা একত্রে একটি কুঁড়েঘরে থাক, তখন বেশী কিছু লুকাতে পার না। আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান বলে আমাদের ভাল ভাল গৃহগুলিও অধিকতর উন্মুক্ত। এদেশের মত ওদেশে যতক্ষণ কেহ ঘণ্টার উত্তর না দেয়, দরজা না খোলে এবং প্রবেশ করতে না বলে, ততক্ষণ ঘরের বাইরে দাঁড়াতে হয়। আমরা উন্মুক্ত স্থানে স্নান, আহার, রন্ধনাদি সারি এবং নিদ্রা, উপাসনা এবং কাজকর্ম করি। আমাদের দোকানগুলিও খোলা এবং আমাদের দেহও প্রায় অনাবৃত। অন্যপক্ষে তোমরা শীতপ্রধান ধনসম্পদ্‌পূর্ণ দেশে থাক। সেইজন্য তোমরা প্রথমে তোমাদের দেহকে পোশাক-পরিচ্ছদে ঢাক, পোশাক-পরিহিত দেহকে চারি দেওয়ালের মধ্যে লুকাও এবং সেই চারি দেওয়ালের মধ্যে প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন কামরা থাকে, যেখানে দরজায় টোকা দিয়ে অনুমতি না পেলে প্রবেশ নিষিদ্ধ। সর্বশেষে তোমাদের বাড়িও একটি বাগানে ঘেরা এবং বাগান আবার পাঁচিলে বেষ্টিত। গোপনপ্রিয়তা তোমাদের আদর্শ। এটি তোমাদের স্বভাবেও প্রতিফলিত। আমাদের গোপনীয় কিছু নাই। আমাদের স্বভাব আমরা কেউ গোপন করি না; কিন্তু তোমরা তা সর্বাগ্রে কর।" তারপর স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং গুরুদাস মহারাজ হাসিতে লাগিলেন এবং প্রসঙ্গান্তরে মনোনিবেশ করিলেন।

সমিতিগৃহে পৌঁছিবার পূর্বে গুরুদাস মহারাজকে সতর্ক করিয়া

তিনি বলিলেন, "কখন ভেব না যে, সব হিন্দুই সাধু, ধার্মিক। কিন্তু আমরা তত মন্দ নই যতটা তোমাদের পাদ্রীরা আমাদের সম্বন্ধে বলে। ভিন্ন ভিন্ন পরিপার্শ্বিক অবস্থায় মানব-প্রকৃতি যেভাবে পরিবর্তিত হয় তাহাই দেশে দেশে বৈচিত্র্যরূপে দেখা দেয়। আমাদের কতকগুলি আচার-ব্যবহার তোমাদের কাছে অসভ্য মনে হয়, আর তোমাদের কতকগুলি রীতিনীতি আমাদের কাছে জঘন্য লাগে। অন্যান্য দেশ সম্বন্ধে বিচার ও অভিমত প্রকাশে আমরা অত্যন্ত ক্ষিপ্র। যদি আমরা ধীরভাবে তোমাদের দেশের কতকগুলি প্রথার কারণ অনুসন্ধান করি তা'হলে আমরা তোমাদের সম্বন্ধে আরও উদারভাব পোষণ করব। বেশ বেশ, হয়ত তুমি একদিন ভারতে যাবে। তখন তুমি স্বচক্ষে সব দেখবে।" গুরুদাস মহারাজ বলিলেন, "আমি নিশ্চয়ই ভারতে যাব। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ভারত কর্মভূমি। প্রত্যেক মানবাত্মাকে মুক্তিলাভের জন্য ভারতেই যেতে হবে।" ইহা শুনিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ হাসিলেন এবং সমিতি-গৃহে প্রবেশ করিয়া গুরুদাস মহারাজকে বলিলেন, "দেখা যাবে, দেখা যাবে।" স্বীয় কক্ষে উপবিষ্ট হইয়া গম্ভীরভাবে তিনি মৃদুস্বরে আবৃত্তি করিলেন, "শুদ্ধ শুভ্র পদ্মগুলি যেমন সকলের অলক্ষিতে ফুটিয়া ওঠে, ঈশ্বরের ইচ্ছাও তেমনি প্রকটিত হয়। কমল-কোরকের ঘনবদ্ধ কোমল পাতাগুলি টেনে ফোটান উচিত নয়; কালই হরিতবর্ণ পুষ্পকোষকে প্রকাশিত করবে।"[১] অস্তগত সূর্যের আরক্তিম আভা যেমন পর্বতশৃঙ্গকে আলোকিত করে, তেমনি বিদেহমুক্ত মহাপুরুষের বাক্য ও কার্য তাঁহার দেহরক্ষার পরেও জগতের কল্যাণসাধন করে।

১ ১৯২৭ খ্রীঃ নভেম্বর সংখ্যা 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রে স্বামী অতুলানন্দের 'স্বামী তুরীয়ানন্দ'-শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লিখিত।

স্বামী তুরীয়ানন্দ ভাবে ভাসিতেন—কখন শান্ত সৌম্য, কখন স্নেহবিগলিত এবং ক্বচিৎ বজ্রবৎ কঠোর। তাঁহার আধ্যাত্মিক ভাবগুলিরও পরিবর্তন ঘটিত। একদিন নিউইয়র্কে তিনি গোঁড়া খ্রীষ্টান শ্রোতৃমণ্ডলীকে অদ্বৈত বেদান্তের বীরত্বপূর্ণ বাণী শুনাইয়া স্তম্ভিত এবং মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিলেন। খুব জোরের সহিত তিনি বলিলেন, "একমাত্র ব্রহ্মই সত্য এবং জগৎ মিথ্যা। মানবাত্মা ব্রহ্মস্বরূপ। অদৃঢ় পিঞ্জরের মধ্যে থেকে সিংহ ভাবছে সে আবদ্ধ, বেরিয়ে আসা অসম্ভব। সে জানে না, তার একটা সবল পদাঘাতে পিঞ্জরটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে, সে বিমুক্ত হবে। অজ্ঞানের মোহে আমরা বদ্ধ। সেই মোহ ছিন্ন কর এবং মুক্ত হও। সকল শক্তি তোমার অন্তরে রয়েছে। তুমি সেই শক্তিমান আত্মা। জ্ঞানের শাণিত অসি দিয়ে মায়ার দুর্ভেদ্য আবরণ ছিন্ন করে তোমার ব্রহ্মত্ব প্রকাশ কর।"

শ্রোতাদের মধ্যে যাঁহারা সর্বাপেক্ষা গোঁড়া তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বামী তুরীয়ানন্দের এই বাণীকে ধর্মবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করিলেন। একটি ধর্মভীরু যুবতী বক্তৃতার পরে স্বামী তুরীয়ানন্দের কাছে আসিয়া বলিল যে, সে বুঝিতে পারে নাই আত্মা কিরূপে ঈশ্বর এবং জগৎ মিথ্যা। স্বামী তুরীয়ানন্দ মহিলার বক্তব্যে ধীরভাবে কর্ণপাত করিলেন। তৎপরে অতিশয় আগ্রহপূর্ণস্বরে তাহাকে সান্ত্বনা ও উৎসাহ দিয়া বলিলেন, "এটি অনুভব করতে আমার বহু বৎসর লেগেছে। কিন্তু একবার অনুভূত হলেই সব কাজ শেষ হয়।" তখন মহিলাটি খ্রীষ্টান ধর্মের সহজবোধ্যতার প্রশংসা করিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ তাহা স্বীকার করিয়া বলিলেন, "হাঁ, ঠিক। বেদান্ত সহজ সান্ত্বনাদায়ক নহে। সর্বোচ্চ সত্য সুলভ নহে। আমরা যতক্ষণ কাঁচের মালায় সন্তুষ্ট থাকি ততক্ষণ হীরার হার অন্বেষণ করি না। মাটি খুঁড়ে পৃথিবীর গর্ভে ঢুকে পাহাড় প্রস্তর ভেঙ্গে

মূল্যবান হীরকখণ্ড আবিষ্কার করতে হয়। ধর্মসমূহের মধ্যে বেদান্ত হীরকতুল্য।"

কখন বা স্বামী তুরীয়ানন্দ বেদান্তের দ্বৈতবাদের প্রসঙ্গ করিতেন এবং জগন্মাতার অসীম করুণার কথা গভীর ভক্তির আবেগে বলিতেন। তিনি বলিতেন, "মায়ের চরণে আত্মসমর্পণ কর। তিনিই তোমাকে ঠিক পথে চালিত করিবেন। কারণ তিনি তাঁহার সন্তানগণকে সাহায্য করিবার জন্য সদা প্রস্তুত।" যেসকল নরনারী তাঁহার নিকট ধর্মশিক্ষা করিতেন তাঁহাদের দোষ-ত্রুটিগুলি সংশোধন করিতে তিনি কখন ইতস্ততঃ করিতেন না। সাহসভরে খোলাখুলিভাবে তিনি তাহাদের সেগুলি দেখাইয়া দিতেন। কিন্তু অনেক সময় পাশ্চাত্ত্যের ছাত্রছাত্রীগণ ইহার জন্য প্রস্তুত থাকিত না। স্বামী তুরীয়ানন্দ তাহাদের কখন কখন ভর্ৎসনাও করিতেন। কোন কোন ছাত্র উক্ত আচরণকে অশিষ্ট অভদ্র ভাবিয়া ক্ষুণ্ণ ও বিরক্ত হইতেন। তিনি গোপনে বা সকলের সমক্ষে কাহার দুর্বলতাগুলি আলোচনা করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। কিন্তু ইহাতে আলোচনাধীন ব্যক্তি হৃদয়ে আঘাত পাইতেন। তখন তিনি তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিতেন, "হাঁ, পাশ্চাত্ত্যের লোকেরা সর্বদা তাদের দোষগুলি ঢেকে রাখতে চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যাণ্ডেজ না সরালে ক্ষতস্থানের চিকিৎসা কি করে হবে? তোমরা কোমল ভদ্র ব্যবহারে তোমাদের প্রকৃত চরিত্র ঢেকে রাখ। কিন্তু অন্তরে ক্ষত বাড়তে থাকে। গুরু ভবরোগের বৈদ্য। একবার রোগটি নির্ণীত হলে গুরু আবশ্যকমত অস্ত্রপ্রয়োগ করতে পশ্চাৎপদ হন না। কখন বা একটি গভীর দীর্ঘ অস্ত্রোপচারে ক্ষত সেরে যায়। তোমরা খুব ভাবপ্রবণ, দোষদর্শন বা ভর্ৎসনাকে তোমরা খুব ভয় কর। যখন আমি একটু মিষ্টকথা বলি, তখন তোমরা খুশী হয়ে বল, 'স্বামীজী কি চমৎকার!'

কিন্তু যখন একটু কটুকথা বলি তখন তোমরা পালাও।" কতকগুলি ছাত্র ভাবিতেন যে, স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহাদের জীবন-সমস্যা ধরিতে পারেন নাই। তাঁহাদের তিনি বলিতেন, "তোমাদের অপেক্ষা আমি তোমাদের মন বেশী জানি। কারণ আমি তোমাদের মনের গভীরতম প্রদেশটিও দেখতে পাই। যা তোমাদের নিকট অজ্ঞাত তা আমার নিকট বিদিত। সময়ে তোমরা বুঝিবে যে, আমি যা বলি তা সত্য।" কোন কোন ছাত্র কিছুকাল সাধনান্তে দেখিতেন, তাঁহাদের সুপ্ত সংস্কারগুলি মনের উপর ভাসিয়া উঠিতেছে। তখন তাঁহারা স্বামী তুরীয়ানন্দের বাক্যের সত্যতা অনুভব করিতেন।

একদা একটি যুবক তাঁহার নিকট ইহা স্বীকার করেন। তখন তিনি যুবকটিকে এই ব্যাখ্যা দেন—"দেখ, সাধারণতঃ আমরা আমাদের মনের ওপরকার তরঙ্গগুলিই জানি। কিন্তু যোগাভ্যাস দ্বারা আমরা মনের গভীরতর স্তরগুলিও জানতে পারি। নিজের মনকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করলে আমরা গভীর স্তরে ডুবতে পারি। তখন আমরা মনের সুপ্ত সংস্কারগুলি ধরতে পারি। অনেক সংস্কার মনের নিম্নদেশে সঞ্চিত আছে। সুযোগ পেলেই সেগুলি আত্মপ্রকাশ করে। মনের উপরিভাগে উঠবার পূর্বে আমরা ধ্যানের দ্বারা সেগুলি আবিষ্কার করতে পারি। এটি বিশেষ আবশ্যক। কোন চিন্তা একবার মনের উর্ধ্বতলে উঠলে তাকে আয়ত্ত করা অতি কঠিন। এটা পরিণত ও শক্তিশালী হবার পূর্বে বীজাবস্থায় আবিষ্কার করা যায়। একেই বলে বীজাকারে সংস্কার-দর্শন। বীজ সহজে বিনষ্ট হয়। কিন্তু যখন এটা অঙ্কুরিত হয়ে বৃক্ষে পরিণত, শাখাপ্রশাখায় বর্ধিত এবং পত্রপুষ্পে শোভিত হয়, তখন একে নষ্ট করতে বিপুল শক্তি ও চেষ্টার প্রয়োজন। সেইজন্য প্রাথমিক অবর্ধিত অবস্থায় বাসনাগুলি ধ্বংস করা চাই। যোগীরা এটা করতে পারেন।

মনে বিপরীত চিন্তাপ্রবাহ সৃষ্টি করে তাঁরা বীজাকারে অবস্থিত অবাঞ্ছনীয় চিন্তাগুলিকে বিনাশ করেন। যথা—প্রীতির দ্বারা হিংসা, দয়া দ্বারা ক্রোধজয় ইত্যাদি অসৎ সংস্কারগুলি হতে তাঁরা এইভাবে বিমুক্ত হন।”

একদিন নিউইয়র্কে প্রাতঃকালীন বক্তৃতার পর স্বামী তুরীয়ানন্দ গুরুদাস মহারাজকে একান্তে ডাকিয়া তাঁহার সঙ্গে বেড়াইতে যাইতে অনুরোধ করিলেন। তৎক্ষণাৎ গুরুদাস মহারাজ সম্মত হইলেন। সেদিনটি বেশ সুন্দর ও উজ্জ্বল ছিল। রাস্তায় বহির্গত হইয়া একটি আহারের দোকানে উভয়ে দ্বিপ্রহরের আহার সমাপ্ত করিয়া সেণ্ট্রাল পার্ক পর্যন্ত বেড়াইতে বেড়াইতে গেলেন। তথায় উভয়ে নির্জনে একটি বৃক্ষতলে ঘাসের উপর বসিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ বেশী কথা বলিলেন না। তিনি সেদিন গম্ভীরভাবে রহিলেন। তাঁহাকে সেদিন কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ দেখাইতেছিল। তিনি মনের কথা গুরুদাস মহারাজকে বলিতে চাহিতেছিলেন। কিন্তু গুরুদাস মহারাজ সেদিন তাঁহাকে শিবোপম গম্ভীর দেখিয়া সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইলেন না। শেষে স্বামী তুরীয়ানন্দ নিজেই বলিলেন, “দেখ গুরুদাস, আমি তোমাকে সব কথা বলে ফেলি। কেন না, আমি মনোভাব গোপন করতে পারি না। আমার কোন কোন ছাত্র মনে করে, আমি তাদের সমস্যা বুঝি না। ইহার কারণ, তারা নিজেদের মন বোঝে না। যেসকল সুপ্তভাব তাদিকে কার্যে প্রণোদিত করে, সেগুলি তাদের অবিদিত। উত্তেজনার বশে তারা কোন কোন কার্য করে এবং সেই প্রেরণাটিকে তাদের সুবিধামত ব্যাখ্যা করে। যে প্রকৃত বাসনাটি তাদিকে কার্যে লাগিয়ে দেয়, তারা সেটি দেখতে পায় না। আমি সেই সুপ্ত ভাবগুলি ধরতে পারি এবং যখন তাদের সেগুলি বলি তারা বিরক্ত হয় এবং বলে, ‘স্বামীজী আমাদের মন বোঝেন না।’ এদেশে প্রত্যেকেই মনে করে, সে নিঃস্বার্থ।

কিন্তু নিঃস্বার্থভাব সুদুর্লভ। অহমিকা দ্বারা আমরা স্ফীত হয়ে এরূপ ভ্রান্ত ধারণা করে থাকি। এজন্য হিন্দুশাস্ত্রগুলি গুরুর আবশ্যকতা অনুভব করেন। গুরু শিষ্যের মনের ভেতরটা দেখে তার সুপ্ত ভাবগুলি ধরতে পারেন এবং শিষ্যকে সেগুলি হতে সাবধান করে দেন। কিন্তু পাশ্চাত্ত্যের লোকেরা ইহা বোঝে না, তারা গুরুর আবশ্যতা স্বীকার করে না। পাশ্চাত্ত্য অহঙ্কারে উন্মত্ত।”[১]

যখন উভয়ে উঠিয়া বেদান্ত সমিতির দিকে চলিতে লাগিলেন তখন স্বামী তুরীয়ানন্দ গুরুদাস মহারাজকে বলিলেন, “আমার গুরুদেব ছিলেন সিদ্ধ যোগী। তাঁর কাছে কেহ স্বীয় মনোভাব গোপন করতে পারত না। তিনি আমাদের মন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানতেন। তাঁকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে হত না। তিনি আমাদের অজ্ঞাত মনোভাব ব্যক্ত করে দিতেন। আমরা বুঝতে পারতাম না যে, তিনি আমাদের মহাশিক্ষা দিচ্ছেন। কিন্তু তিনি সর্বদাই আমাদের দিকে লক্ষ্য রাখতেন। আমাদের কোন চিন্তা বা কার্য তাঁর দৃষ্টি এড়াত না। যেসকল বিঘ্ন বা বিপদ আমাদের সাধনপথে ছিল, সেগুলি হতে তিনি সন্তর্পণে আমাদিকে রক্ষা করতেন। তুমি কি দাবাখেলা দেখেছ? খেলোয়াড়রা কখন কখন একটি চাল ভুলে যায়। কারণ তখন তাদের লক্ষ্য থাকে খেলায় জয়লাভের দিকে। কিন্তু দর্শকরা সে চালটি অনায়াসে দেখতে পায়। তাদের মন শান্ত এবং জয়লাভের বাসনায় চঞ্চল নয়। উচ্চাকাঙ্ক্ষা আসলেই আমাদের দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুত ও চঞ্চল হয়ে পড়ে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাদিকে ঝড়ের বেগে টেনে নিয়ে যায়। তখন আমাদের সকল বিচারশক্তি ও দূরদৃষ্টি লোপ পায়। বাসনা আমাদিকে অন্ধ করে দেয়।”

১ ১৯২৭ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে ‘প্রবুদ্ধ ভারত’ পত্রিকায় স্বামী অতুলানন্দের ‘স্বামী তুরীয়ানন্দ’-শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লিখিত।

শরণাগতদের জীবন নির্দোষ, নির্মল এবং জ্ঞানোজ্জ্বল করিবার জন্য স্বামী তুরীয়ানন্দ সদা সচেষ্ট থাকিতেন। মাতার ন্যায় তাহাদের কল্যাণ-কামনায় তাহাদিগকে কখন শাসন, কখন বা স্নেহ করিতেন। তাঁহার প্রেরণায় বেদান্ত সমিতির সভ্যগণের মনোযোগ পড়িল ধর্মজীবনগঠনে। এইভাবে নিউইয়র্কে তাঁহার প্রায় এক বৎসর কাটিয়া গেল। ইতোমধ্যেই তিনি নিউইয়র্ক, মণ্ট ক্লেয়ার এবং অন্যান্য পার্শ্ববর্ত্তী শহরে আদর্শ বেদান্ত-শিক্ষকরূপে সুপরিচিত হইলেন। স্বামী বিবেকানন্দ তখন নানাস্থান ঘুরিয়া নিউইয়র্কে অবস্থান করিতেছিলেন। আমেরিকায় অবস্থানকালে কোন স্থানে স্বামী তুরীয়ানন্দের বিপুল ভবিষ্যৎ সাফল্য সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের অলৌকিক দর্শনাদি হয়। স্বামীজী তুরীয়ানন্দজীর নিকট উহা ব্যক্ত করাতে হরি মহারাজ পরিহাসপূর্বক মন্তব্য করিলেন, "আপনি ত দেখেছেন?" ইহাতে স্বামীজী গম্ভীরভাবে প্রত্যুত্তর দিলেন, "নিশ্চয়ই। দৈবাদেশের অর্থ তুমি কী জান? আমিই সেগুলির বিশদার্থ করতে পারি। তাহলেই তোমরা সেগুলির যথার্থ মর্ম বুঝতে পারবে।" স্বামীজীর এই তীব্র মন্তব্য অবশ্য স্বামী তুরীয়ানন্দকে নিরস্ত করিল।[১] কিন্তু পরবর্ত্তী ঘটনাবলীর দ্বারা স্বামীজীর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইয়াছিল। এই সময়ে স্বামীজীর এক পাশ্চাত্ত্য ভক্ত মহিলা আশ্রমস্থাপনার্থ কালিফোর্ণিয়ার পাহাড়ে বিস্তৃত ভূমি দান করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী তুরীয়ানন্দকে তথায় আশ্রমপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরণ করিতে মনস্থ করিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ গুরুভ্রাতার প্রস্তাবে সম্মত হলেন। ১৯০০ খ্রীঃ ৩রা জুলাই উভয়ে নিউইয়র্ক ত্যাগ করিলেন।[২] স্বামী বিবেকানন্দ পুরাতন বন্ধুদের সহিত সাক্ষাৎ ও বিশ্রামের জন্য

---

১ 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় (সেপ্টেম্বর, ১৯২২ সংখ্যায়) শ্রীম-লিখিত প্রবন্ধে উদ্ধৃত।

২ উক্ত সংবাদটি 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকায় ১৯০০ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে প্রকাশিত।

ডেট্রয়েটে গেলেন এবং স্বামী তুরীয়ানন্দ জগদ্বিখ্যাত লিক অবজার্ভেটারী হইতে বার মাইল দূরে সেণ্ট আন্তনিয়ো উপত্যকায় শান্তি আশ্রম স্থাপনের জন্য কালিফোর্ণিয়ায় যাত্রা করিলেন। ইহাই স্বামীজীর সঙ্গে হরি মহারাজের শেষ সাক্ষাৎ।

পঞ্চম অধ্যায়

আমেরিকায় তিন বৎসর

সানফ্রান্সিস্কোতে

সানফ্রান্সিস্কোতে স্বামী বিবেকানন্দের শেষ বক্তৃতাবলী ১৯০০ খ্রীঃ মে মাসে প্রদত্ত হয়। সানফ্রান্সিস্কো হইতে তিনি নিউইয়র্ক হইয়া প্যারিসে গমন করেন। সানফ্রান্সিস্কো ত্যাগের পূর্বে তিনি ভক্ত-বন্ধুদের নম্রভাবে বলিলেন, "আমি তোমাদের কাছে একটি গুরুভাইকে পাঠাবো যিনি আমার চেয়েও বেশী অনুষ্ঠানপরায়ণ। আমি যে তত্ত্ব ব্যাখ্যা করলাম তিনি তা জীবনে পরিণত করেছেন। আমি স্বামী তুরীয়ানন্দকে পাঠাব।"[১] স্থানীয় ভক্তবন্ধুগণ বিস্মিত চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন, সেই মহাপুরুষ কেমন যাঁহাকে স্বামী বিবেকানন্দ এত প্রশংসা করিলেন। সকলে সাগ্রহে স্বামী তুরীয়ানন্দের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। স্বামীজী নিউইয়র্ক যাইয়া স্বামী তুরীয়ানন্দকে সানফ্রান্সিস্কোতে পাঠাইলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ সানফ্রান্সিস্কোতে আসিলেন। তিনি আসিলেন শিশুসুলভ মধুরতা ও নম্রতায় শোভিত এবং আধ্যাত্মিক অগ্নিতে প্রদীপ্ত হইয়া, ঠাকুরের ভাষায় যিনি সদ্যঃপ্রস্ফুটিত পুষ্পবৎ বা প্রাতঃকালীন শিশির-বিন্দুবৎ বিমল। তিনি ভক্তগণের জীবনভূমিতে নামিয়া আসিয়া তাহাদিগকে প্রেমের, প্রেরণার পূত স্পর্শ দিলেন এবং আলোকময় অনন্তের পথে তাহাদিগকে চালিত করিলেন। জনৈক পাশ্চাত্ত্য ভক্ত বলেন,

১ 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় (মে, ১৯১৮) এফ. এস. রোডহামেল-লিখিত আশ্রমের দিনগুলি'-শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন।

"স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দের অলৌকিক আধ্যাত্মিকতার তীব্র জ্যোতিঃতে বহির্মুখ জড়বাদী পাশ্চাত্ত্যবাসীদিগের চক্ষু ঝলসিয়া গেল। স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তের সমগ্র ভূমির পরিচয় দিলেন। তাহাতে পাশ্চাত্ত্য মানবের নব জন্ম হইল, পাশ্চাত্ত্য মনের সুপ্ত সম্ভাবনারাশি জাগ্রত হইল। সংপ্রাপ্ত প্রেরণাকে জীবনে সজীব রাখিবার জন্য স্বামী তুরীয়ানন্দ পাশ্চাত্ত্য মনকে সুশিক্ষিত ও সঞ্চালিত করিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দের আগমনে 'শান্তি আশ্রম' জন্মলাভ করিল, সানফ্রান্সিস্কোতে নবস্থাপিত বেদান্ত সমিতির একটি নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। এই নূতন অধ্যায়ে পূর্বপ্রচারিত বেদান্ত-ভূমিকার বিভিন্ন দিক বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হয় নাই; ইহা ব্যক্তিগত সংস্পর্শকে সুস্পষ্ট করিয়া আত্মানুসন্ধানের শক্তি জাগ্রত করিল, আধ্যাত্মিক অনুরাগের মূল যে বিচারশক্তি ও হৃদয়াবেগ তাহাদিগকে সক্রিয় করিয়া তুলিল। আমাদের জীবন স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক যে ভাবধারার অভিমুখে সঞ্চালিত হইয়াছিল, আমাদের মানসিক শক্তিসমূহকে সেইভাবে শিক্ষিত করিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ।"

স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব ও প্রেরণায় আমেরিকার মনে যে প্রতিক্রিয়া হইল তাহাকে কি ভাবে স্থায়ী ও ব্যাপক করা যায়?—বেদান্তের অনুরাগীরা যখন উক্ত সমস্যার সমাধানে ব্যাকুল ঠিক এমন সময় স্বামী তুরীয়ানন্দ যাইয়া সমগ্র ভার গ্রহণপূর্বক তাঁহাদের প্রাণে আশার আলোক জ্বালিলেন। কেবল বক্তৃতাশ্রবণের দিন শেষ হইয়াছিল। তাঁহারা এখন স্বামী তুরীয়ানন্দের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়া বেদান্তসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দ নিউইয়র্ক হইতে যাত্রা করিয়া ১৯০০ খ্রীঃ ৮ই জুলাই কালিফোর্ণিয়ায় আলহাম্ব্রা নামক স্থানে উপনীত হইলেন।

স্বামীজী তাঁহার সঙ্গে নিউইয়র্ক হইতে আসিয়াছিলেন এবং চিকাগোর কাছে নামিয়া গেলেন। যাইবার সময় তিনি তাঁহার প্রিয় হরি ভাইকে 'নমো নমঃ' করিলেন। উভয় গুরুভ্রাতার মধ্যে ইহাই শেষ কথাবার্তা। আলহাম্ব্রা হইতে স্বামী তুরীয়ানন্দ লস্ এঞ্জেলিসে যাইয়া দুই সপ্তাহ বক্তৃতা ও ক্লাশ করেন। ২৪শে জুলাই লস্ এঞ্জেলিস ত্যাগ করিয়া ২৬শে তারিখে সানফ্রান্সিকো শহরে উপস্থিত হন। উক্ত শহরে ৬ গ্রেরি ষ্ট্রীটে ক্লাশ আরম্ভ করেন এবং ২৯শে জুলাই 'হোম অব ট্রুথ'-এ গীতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সানফ্রান্সিকোতে মিঃ প্যাটারসনের গৃহে প্রায় এক সপ্তাহকাল পূর্বাহ্নে দশটার সময় ধ্যান-শিক্ষা দিয়াছিলেন। ৩রা আগস্ট বারজন বেদান্তানুরাগী লইয়া 'শান্তি আশ্রম' স্থাপনার্থ সানফ্রান্সিস্কো ত্যাগ করেন।

২৫শে জুলাই স্বামী বিবেকানন্দ নিউইয়র্ক হইতে স্বামী তুরীয়ানন্দকে লিখিয়াছিলেন, "প্রিয় তুরীয়ানন্দ, হ্যান্সবার্গের একখানি পত্রে জানলাম যে, তুমি তাঁদের ওখানে গিয়েছিলে। তাঁরা তোমায় খুব পছন্দ করেন এবং আমার বিশ্বাস, তুমিও বুঝতে পেরেছ যে, তাঁদের বন্ধুত্ব কত অকৃত্রিম, পবিত্র ও স্বার্থলেশশূন্য। ··· আমার অসীম ভালবাসা জানবে।" ১৩ই আগস্ট প্যারিস হইতে স্বামী বিবেকানন্দ হরি মহারাজকে লিখিয়াছিলেন, "হরি ভাই, তোমার পত্র কালিফোর্নিয়া থেকে পেলুম। তিন জনের ভাব হতে লাগল, মন্দ কি? ওতেও অনেক কাজ হয়। শ্রীগুরু মহারাজ জানেন। যা হয় হতে দাও। তাঁর কাজ তিনি করবেন। তুমি আমি তাঁর চাকর বই তো নয়? ··· শীঘ্র ইংলণ্ড যাব। কাজ করে যাও ভায়া, মায়ের কৃপায়। মা জানেন, তুমি জান। আমি খালাস।" উক্ত মাসে স্বামী বিবেকানন্দ তুরীয়ানন্দজীকে একই শহর হইতে আবার লিখিয়াছিলেন, "হরি ভাই, আমার শরীর-মন

ভেঙে গেছে। ধর্মেতিহাস সম্মেলন হয়ে গেল।" ১লা সেপ্টেম্বর প্যারিস হইতে স্বামীজী হরি মহারাজকে যে দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে আছে, "প্রেমাস্পদেষু, তোমার পত্রে সমস্ত সমাচার অবগত হলাম। আমার দৃঢ় ধারণা, মা এখন আমা অপেক্ষা তোমাদের দ্বারা শতগুণ অধিক কাজ করাবেন।" অক্টোবর মাসে স্বামীজী আবার হরি মহারাজকে লিখিয়াছিলেন, "প্রিয় তুরীয়ানন্দ, এইমাত্র তোমার পত্র পেলাম। মায়ের ইচ্ছায় সমস্ত কাজ সুন্দরভাবে চলবে, ভয় পেও না। আমি কন্‌স্টান্টিনোপল দেশ ঘুরে বেড়াব। আমার ভালবাসা জানবে।"

স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণায় এবং স্বামী তুরীয়ানন্দের প্রচেষ্টায় ১৯০০ খ্রীঃ সানফ্রান্সিস্কো শহরে বেদান্ত সমিতি স্থাপিত হয়। শান্তি আশ্রম-প্রতিষ্ঠান্তে ফিরিয়া আসিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ ১৯০১ খ্রীঃ ১০ই জানুয়ারী হইতে পুনরায় সানফ্রান্সিস্কোতে কার্য্য আরম্ভ করেন। ৩১শে জানুয়ারী হইতে ২৬শে মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন পূর্বাহ্নে দশটার সময় ধ্যানের ক্লাশ হইত ৭৭০ ওক্‌ স্ট্রীটে। মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে গীতা ও রাজযোগ সম্বন্ধে বক্তৃতা চলিত। ধ্যানের ক্লাশ হইত মিঃ সি. এফ. পেটারসনের গৃহে এবং গীতা ও যোগের বক্তৃতা ২১৭৩ কালিফোর্নিয়া স্ট্রীটস্থ 'হোম অব ট্রুথ'-এ। বক্তৃতার পর তিনি শ্রোতৃবর্গকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে বলিতেন। জনৈক শ্রোতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আসক্তি কি?" স্বামী তুরীয়ানন্দ উত্তর দিলেন, "'আমি' ও 'আমার' ভাব।" আর একদিন অন্য শ্রোতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "শান্তি আশ্রমকে স্থায়ী করিবার জন্য আর কি কি প্রয়োজন?" স্বামী তুরীয়ানন্দ উত্তর দিলেন, "মুমুক্ষু মানুষ, নিবেদিত জীবন।" গীতাব্যাখ্যার সময় একদিন দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৭ শ্লোকটির অর্ধাংশ 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন' বারবার আবৃত্তি করিতে

করিতে বলিলেন, "আমরা সদা ফলের প্রত্যাশা করি, ভাবী ফলের অপেক্ষায় থাকি ; কিন্তু তাহা করিতে আমাদের অধিকার নাই।"[১]

উক্ত বৎসর স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহার কয়েকজন ভক্তের সহিত সিয়ারা নেভাদা পর্বতে অবস্থিত ডোনার হ্রদ দেখিতে যান। এই পর্বত সানফ্রান্সিস্কো হইতে ১৫০ মাইল দূরে বিদ্যমান। ডোনার হ্রদ দেখিয়া তিনি সানফ্রান্সিস্কোতে ফিরিয়া আসেন এবং ৩১শে ডিসেম্বর লস্ এঞ্জেলিসে যান এবং তথা হইতে ১৯০২ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে শান্তি আশ্রমে প্রত্যাগমন করেন। সানফ্রান্সিস্কোতে অবস্থান-কালে তাঁহার পেটে পাথুরী রোগ (gall-stone) হয়। ডাক্তারের 'অলিভ-তৈল' চিকিৎসায় সেবার তিনি সুস্থ হইয়া যান।

সানফ্রান্সিকোতে অবস্থানকালে একটি ভদ্রমহিলা স্বামী তুরীয়ানন্দের কাছে আসিতেন। পত্নীর উক্ত কার্যে স্বামীর সম্মতি ছিল না। সেইজন্য পতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে পত্নীকে বেদান্ত সমিতিতে স্বামী তুরীয়ানন্দের নিকটে আসিতে হইত। মহিলাটি একদিন এই অসুবিধার কথা তুরীয়ানন্দজীকে জানাইলেন। ইহাতে হরি মহারাজ বলিলেন, "পতির সেবা এবং আদেশপালন পত্নীর ধর্ম। তুমি এত ঘন ঘন না এসে মাঝে মাঝে এস। তাঁকে বোঝাও। ৺মার নিকট প্রার্থনা কর। সব ঠিক হয়ে যাবে।" কিন্তু ভদ্রলোকটি পত্নীর কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তখন আমেরিকানদের খারাপ ধারণা ছিল ভারতীয়দের সম্বন্ধে। হিন্দু সাধুদের সঙ্গে মেশা তখন আমেরিয়ায় সভ্যতাবিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইত। পতির মত পরিবর্তিত হইতেছে না দেখিয়া একদিন হরি মহারাজ মহিলাটিকে বলিলেন, "তোমার পতির সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

১ 'বেদান্ত কেশরী' পত্রিকার ১৯২৪ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত বিরজা দেবীর 'আমেরিকায় স্বামীদের সঙ্গে'-শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লিখিত।

মহিলাটি নিষেধসূচক বাক্যে বলিলেন, "আপনার না যাওয়াই ভাল। আমার পতি আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে পারেন।" হরি মহারাজ স্ত্রীলোকটির কথা না শুনিয়া তাঁহার বাড়ী যাইয়া ভদ্রলোকটির সহিত করমর্দন করিলেন। করমর্দনমাত্রই লোকটির পূর্ব বিরুদ্ধভাব অন্তর্হিত হইল এবং তিনি ভক্তবৎ আচরণ করিলেন। তখন হইতে মহিলার বেদান্ত সমিতিতে আসার বাধা বিদূরিত হইল।

সান্‌ফ্রান্সিস্কোতে স্বামী তুরীয়ানন্দ বক্তৃতাদি অপেক্ষা ধ্যান-ধারণার বৈঠক অধিক করিতেন এবং ভক্তগণকে যোগশিক্ষা দিতেন। ধ্যানাদি অভ্যাসের জন্য একটি সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিল। হরি মহারাজের অলৌকিক আধ্যাত্মিকতার বিকাশও তখন লক্ষিত হইত। একবার একটি সুন্দরী মহিলা তাঁহার নিকটে আসেন, সঙ্গে একটি পুরুষ। মহিলাকে দেখিয়াই হরি মহারাজ বুঝিলেন, সে স্বাভাবিক অবস্থায় নাই, যেন মোহাচ্ছন্ন ও কাহারো দ্বারা চালিত। অন্তর্দৃষ্টিসহায়ে তিনি বুঝিলেন, পুরুষটিই কোন যাদুবিদ্যার দ্বারা নারীটিকে সম্মোহিত করিয়াছে। ব্যাপারটি বুঝিয়া তিনি তিনবার 'ওঁ শান্তিঃ' মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। ইহাতেই মহিলার আচ্ছন্নভাব কাটিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে পুরুষটির সম্মোহনশক্তি অন্তর্হিত হওয়ায় সেও সরিয়া পড়িল। মহিলাটি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া হরি মহারাজের নিকট সাশ্রুনয়নে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। তিনি একজন ধনীর কন্যা ছিলেন। পুরুষটির যাদুবিদ্যার প্রভাব হইতে মুক্ত হইবার জন্য নানা ধর্মযাজকের উপদেশ অনুসারে চলিয়াও সফলকাম হন নাই। স্বামী তুরীয়ানন্দের কৃপায় এতকাল পরে তিনি পুরুষটির কবল হইতে মুক্ত হইয়া পরম শান্তি পাইলেন। যাহাতে তিনি যাদুবিদ্যার কবলে আর না পড়েন তজ্জন্য স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহাকে ধ্যানধারণাও শিক্ষা দিয়াছিলেন।

তদবধি মহিলাটি স্থানীয় বেদান্ত সমিতিতে নিয়মিতভাবে আসিতেন এবং স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন শান্তি।

একবার বোষ্টন শহরে কোন ধনী মহিলার বাড়ীতে স্বামী তুরীয়ানন্দ অতিথি হইয়াছিলেন। মহিলাটি অত্যন্ত প্রভুত্বপ্রিয়া ছিলেন এবং কোন বিষয়ে তুরীয়ানন্দজীর সহিত তাঁহার মতভেদ হওয়ায় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "যদি আপনি আমার মতানুবর্তী না হন তা'হলে আমি আপনাকে সকল সাহায্যদান বন্ধ করব।" ইহাতে স্বামী তুরীয়ানন্দ ধীরস্থিরভাবে উত্তর দিয়াছিলেন, "আমি সন্ন্যাসী। ঈশ্বর আমার সহায়। তুমি যদি আমাকে বোষ্টনের রাস্তায় ফেলে দাও, আমি চিন্তিত হব না।" অবশ্য মহিলা স্বামী তুরীয়ানন্দকে সাহায্যদান বন্ধ করেন নাই।

লস্ এঞ্জেলিস শহরের লঙ বীচ পল্লীতে সিগন্যাল হলে এক বৃদ্ধার গৃহে স্বামী তুরীয়ানন্দ অতিথি হন। বৃদ্ধা একটি বৃহৎ তেলের কলের স্বত্বাধিকারিণী ছিলেন। তিনি স্বামী তুরীয়ানন্দের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন। তুরীয়ানন্দজী ইহাতে বৃদ্ধাকে বলিয়াছিলেন, "আপনি আমাকে কয়েক ডলার দিয়ে সাহায্য করেছেন। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, আমি আপনার কাছে মাথা বিক্রয় করেছি।" এই ঘটনাদ্বয় হইতে বোঝা যায় স্বামী তুরীয়ানন্দ সন্ন্যাসীর আদর্শ সুদূর আমেরিকায়ও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন এবং সর্বদা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতেন, মানুষের দিকে তাকাইতেন না।

ওকল্যাণ্ডে[১]

কালিফর্নিয়ায় বেদান্তপ্রচারে স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের স্থান গ্রহণ করেন। স্বামী বিবেকানন্দের সাধারণ বক্তৃতা ও ক্লাশগুলির দ্বারা স্বামী তুরীয়ানন্দের আরও ব্যক্তিগত এবং ঘনিষ্ঠ শিক্ষাদানের পথ পরিষ্কৃত হয়। মহাজ্ঞানী স্বামীজী বিচক্ষণতার সহিত যেরূপ বৈদান্তিক ভাব ও আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছিলেন তদ্ব্যতীত সাধারণ লোক স্বামী তুরীয়ানন্দের একাগ্র ও একনিষ্ঠ জীবন বুঝিতে পারিত না। ঈশ্বর সম্বন্ধে শিক্ষার্থিগণের ধারণা যেরূপই হউক না কেন, যে-কোন প্রকারে ঈশ্বরের ধ্যান করিতে শিক্ষা দেওয়াই ছিল তাঁহার প্রধান কাজ। তাঁহার নিকট অন্য সব ছিল অসার বাগাড়ম্বর মাত্র।

পূর্ব ওকল্যাণ্ডে মিঃ এফ. এস্. রোডহ্যামেলের গৃহে সাত সপ্তাহ ধরিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ দুইটি সাপ্তাহিক ক্লাশ করিয়াছিলেন—শুক্রবার সন্ধ্যায় ও শনিবার সকালে। সেই সময় শুক্রবারের রাত্রিগুলি তিনি রোডহ্যামেলের বাড়ীতে অতিবাহিত করিতেন। সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন স্বামী তুরীয়ানন্দকে অতিথিরূপে পাইয়া মিঃ রোডহ্যামেল এবং তাঁহার পরিবারবর্গ তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। এই পরিচয়ের ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে গভীর প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহার দ্বারা মিঃ রোডহ্যামেলের গৃহে যে অদ্ভুত আবহাওয়া সৃষ্ট হয় তাহা বহু বৎসর যাবৎ প্রাণপ্রদ ও বাস্তব ছিল। মিঃ রোডহ্যামেল বলেন, "এইরূপ দিব্য আবহাওয়া বিরাট ব্যক্তিত্ব দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐসকল দিনের পুণ্যস্মৃতি বিশ-পঁচিশ বৎসর পরেও আমার মনে জাগরূক আছে।

---

১ 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রে (জুন, ১৯২৩) প্রকাশিত মিঃ এফ. এস. রোডহ্যামেলের প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত এবং 'উদ্বোধন' পত্রে (অগ্রহায়ণ, ১৩৫৫) প্রকাশিত।

তাহা কোন বিশেষ ঘটনার স্মৃতি নহে। যে স্বর্গীয় প্রভা মনকে পূর্ববৎ এখনও সংসারে অনাসক্ত করে ইহা যেন তাহারই স্মৃতি! ইহা বিস্মৃত হইবার নহে। আমার গৃহের একদিক হইতে অন্যদিক পর্যন্ত পায়চারি করিতে করিতে হরি মহারাজ 'হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ' উচ্চারণ করিতেন। ওঁ-এর ম শব্দটির উপর তিনি এমন টান দিতেন যাহাতে ইহা ধীরে ধীরে নিঃশেষিত হইত।”

মিঃ রোডহ্যামেলের গৃহস্থিত ভোজনালয়ের দক্ষিণ জানালাটি বিশেষভাবে স্বামী তুরীয়ানন্দের পুণ্যস্মৃতিমণ্ডিত। এই জানালার পার্শ্বে বসিয়া প্রত্যহ সকালে প্রাতরাশের আধঘণ্টা পূর্বে তিনি গীতার সংস্কৃত শ্লোকাবলী অধ্যায়ের পর অধ্যায় আবৃত্তি করিতেন। তাঁহার সুগভীর সুললিত কণ্ঠস্বরে সমগ্র গৃহ আন্দোলিত হইত। সেই মধুর ধ্বনিতে যে ছন্দ সৃষ্ট হইত তাহাতে গৃহের প্রত্যেকেই পুলকিত চিত্তে সাড়া দিত। তিনি একটি চেয়ারে মেরুদণ্ড খাড়া করিয়া বসিতেন, তাঁহার মস্তক উন্নত এবং একদিকে একটু হেলান থাকিত, চক্ষু অর্ধনিমীলিত এবং দৃষ্টি জানালার বাহিরে সুদূর দক্ষিণে প্রসারিত। আবৃত্তির সময় তাঁহার শরীর তালে তালে দুলিত। এইসকল সময়ে মিঃ রোডহ্যামেলের শিশুদ্বয় তাঁহার পদতলে বসিয়া শিশুসুলভ বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় অবাক হইয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিত। তাঁহার প্রেমপূর্ণ ও চুম্বকবৎ আকর্ষণকারী ব্যক্তিত্ব তাহাদিগকে বিমুগ্ধ করিত। মাঝে মাঝে তিনি শিশুদের প্রতি সহাস্যবদনে তাকাইতেন এবং নামিয়া তাহাদের মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইতেন। কিন্তু তাঁহার আবৃত্তি পূর্ববৎ চলিত, বন্ধ হইত না। কখন বা তিনি প্রাতরাশ প্রস্তুত হওয়া পর্যন্ত আবৃত্তি করিতেন, কখন বা উঠিয়া রান্নাঘরে যাইতেন এবং গৃহকর্ত্রী শ্রীমতী রোডহ্যামেলের কাছে দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রাতরাশ-পাকপ্রণালী

পর্যবেক্ষণ করিতেন। তিনি আমেরিকার পাকপ্রণালী দেখিতে পছন্দ করিতেন এবং কিভাবে ভারতে বিবিধ উপাদেয় আহার্য ও পানীয় প্রস্তুত হয় তাহা বিস্তৃতভাবে গৃহকর্ত্রীকে বলিতেন। যখন আহার প্রস্তুত হইত তখন রান্নাঘরকে তিনি প্রিয় জ্ঞান করিতেন। তিনি রান্নাঘরে পায়চারি করিতে করিতে কখন আবৃত্তি, কখন বা গল্প করিতেন, কদাচিৎ বালক-সুলভ ক্রীড়াপ্রিয়তার বশে থালাগুলিতে আহার্য সাজাইতেন। যখন সকলে টেবিলের পার্শ্বে বসিয়া প্রাতরাশ খাইতেন, তিনি কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক বলিয়া উহাদের অনুবাদ করিয়া বুঝাইতেন। নির্দোষ আমোদ এবং গল্প দ্বারা তিনি আহারের সময়টি আনন্দময় করিয়া তুলিতেন। তিনি বস্তুতঃ উক্ত পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিলেন।

সান্ধ্য ও প্রাতঃকালীন ক্লাশের প্রাক্‌কালে স্বামী তুরীয়ানন্দ পূর্ব-ওকল্যাণ্ডের রাস্তাগুলিতে দীর্ঘ ভ্রমণ করিতেন। মিঃ রোডহ্যামেল ভ্রমণকালে তাঁহার সঙ্গী হইতেন। মিঃ রোডহ্যামেল বলেন, "সেই ভ্রমণ সাধারণ নহে, বিস্মৃত হইবার নহে। তাহাতে পরিব্রাজক-জীবনের আস্বাদ পাইয়াছি। স্বামীজী যখন গল্প বলিতেন তখন এক নূতন জগতের চিত্র আমার মানসচক্ষে ভাসিয়া উঠিত। যে জড় জগতে আমরা ভ্রমণ আরম্ভ করিয়াছিলাম তাহা হইতে উপরোক্ত জগৎ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সুদূরে, যথায় চক্রবাল ভাবজগৎকে পর্দার মত আবৃত করে, যেন শুভ্র সুদীপ্ত মন্দির-চূড়া দেখা যাইত। একই যাদুপ্রভাবে গেরুয়াধারী বেদান্তচর্চারত সন্ন্যাসিগণ বনরাজিমূলে দৃষ্টিগোচর হইতেন এবং অসংখ্য-প্রকার রঙিন ফুলের বাগানে ফুলগাছের ফাঁকে ফাঁকে গেরুয়া রঙ উঁকি মারিত। শান্ত, সমীরণ-স্নিগ্ধ ও অরুণালোক-স্নাত প্রাতে বা অস্তগামী সূর্যের মৃদুকিরণোদ্‌ভাসিত সন্ধ্যায় স্বামীজীর পূতসঙ্গে যখন বেড়াইতাম তখন মনে হইত আমি যেন হিমালয়ের শীতল ছায়ায়, বা মন্দিরময়

তীর্থে বা আশ্রমে আছি। এইসকল আশ্রমের কথা ভাবিলে মন স্বতঃই অন্তর্মুখী ও ধ্যানপ্রবণ হইত। যদিও সান-আন্তনিও উপত্যকায় অবস্থিত শান্তি আশ্রমে স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে বাস করিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই, তথাপি তাঁহার এই অদীর্ঘ সৎসঙ্গেই সেই অভাব মিটিয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে সরল বন্ধুভাবে মিশিলেও আদর্শ আশ্রমের অভিজ্ঞতা উপলব্ধ হইত।"

ক্লাশেও তিনি আশ্রমের আবহাওয়া সৃষ্টি করিতেন। ক্লাশে ছাত্র সংখ্যা ২০ হইতে ৩০ পর্যন্ত হইত। শাস্ত্রব্যাখ্যা আরম্ভ করিবার পূর্বে তিনি সমাগত নরনারীগণের কুশলসংবাদ-গ্রহণান্তে একটি বড় আরাম-কেদারাতে বসিতেন। কখনও বা তিনি স্বীয় কক্ষে উপবিষ্ট থাকিতেন যতক্ষণ না ছাত্রছাত্রীগণ সমবেত হইয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেন। তারপর তিনি সংযত ও সমাহিত চিত্তে আবৃত্তি করিতে করিতে পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া বসিতেন এবং ধর্মপ্রসঙ্গ আরম্ভ করিবার একটা স্বতঃস্ফূর্ত ভাব না আসা পর্যন্ত আবৃত্তিরত থাকিতেন। শ্লোকাদি-আবৃত্তির দ্বারা ক্লাশের উদ্বোধন ও সমাপ্তি হইত। তিনি সাধারণতঃ অন্তর্মুখী হইয়া ওঙ্কার উচ্চারণ করিতেন। ছাত্রছাত্রীগণও তৎশ্রবণে অনুরূপ উচ্চারণ শিখিয়াছিলেন। কখনও বা তিনি 'হরি' বা 'তৎ সৎ'-এর সহিত ওঙ্কার সংযোগপূর্বক উচ্চারণ করিতেন। ক্লাশের সময় তাঁহার পার্শ্বে বেতের টেবিলের উপর বৃহৎ সংস্কৃত গীতাখানি থাকিত। কিন্তু তিনি কখনও তাহা ক্লাশের সময় খুলিতেন না।

ক্লাশের পরে শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁহাকে ঘিরিয়া নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসাপূর্বক তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিবার চেষ্টা করিতেন। ছাত্রগণ চলিয়া গেলে মিঃ রোডহ্যামেলের পরিবারবর্গ এবং দুই-এক জন অতিথি তাঁহার কাছে বসিয়া গল্প শুনিতেন। তাঁহার গল্প-ভাণ্ডারটি ছিল বিশাল ও বিচিত্র

গল্প বলিবার সময় তাঁহার সহজ ও শ্রেষ্ঠ ভাবটি প্রকাশ পাইত। এই সময় তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া জগন্মাতার কথা বলিতেন। যিনি জগন্মাতাকে সাক্ষাৎভাবে ঘনিষ্ঠভাবে জানেন, তাঁহার পক্ষেই এইরূপ প্রাণমাতান প্রসঙ্গ করা সম্ভব। দার্শনিক চিন্তার নিছক মানসিক পরিতৃপ্তি হইতে তিনি তাঁহার ছাত্রগণকে প্রত্যক্ষ অনুভূতির পথে পরিচালিত করিতেন। তিনি পুনঃ পুনঃ বলিতেন, "দর্শনশাস্ত্র বা গীতা-পাঠই প্রগাঢ় ধর্মসাধন নহে। জগন্মাতাকে জানাই মুখ্য উদ্দেশ্য। উহাই ধর্মের সার ও শেষ কথা। অন্য সকল বিষয় অবান্তর।" তিনি আবার বলিতেন, "তোমার সকল দুঃখকষ্টের কথা মাকে জানাও। তিনিই সব দুঃখ দূর করিবেন।" একজন প্রশ্ন করিলেন, "স্বামীজী, কিরূপে তিনি সকল দুঃখ দূর করিবেন?" স্বামী তুরীয়ানন্দ উত্তর দিলেন, "তোমাকে তাঁহার কাছে টানিয়া লইয়া। যখন তুমি মাকে জানিবে তখন কোন কিছুতেই লাভক্ষতি হইবে না।"

আর একজন—"মা কি সত্যই কাহারো জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন?" স্বামী—"নিশ্চয়ই। কেন নয়?" প্রশ্ন—"কিরূপে?" উত্তর—"বোধশক্তি বা বিবেকদানে। যখন সব কিছুই তাঁহাকে নিবেদন করা হয় তখন প্রত্যেক বস্তুকে নূতন আলোকে দেখা যায়; তখন তুমি জানিবে এই জীবন কত অনিত্য, কত অসার!"

স্বামী তুরীয়ানন্দ আমেরিকার ধর্মশিক্ষার্থিগণের আধ্যাত্মিক অক্ষমতা ও সম্ভাবনাসমূহ উত্তমরূপে বুঝিতেন এবং সমস্যাগুলির সমাধান করিয়া নানাভাবে তাঁহাদের ধর্মজীবন গভীর ও পরিপুষ্ট করিতেন। তিনি শুধু ধর্মোপদেষ্টা ছিলেন না, তিনি উচ্চশ্রেণীর ধর্মাচার্যও ছিলেন। তাঁহার উপদেশ ও উদাহরণ লোকের মনে সমভাবেই নূতন প্রেরণা যোগাইত এবং উহাকে উচ্চতর ভাবভূমিতে আরোহণ করাইত।

মিঃ এফ. এস. রোডহ্যামেল আরও লিখিয়াছেন,[১] "তাঁহার সহিত দীর্ঘ ও ঘনিষ্ঠ আলাপ ও পরামর্শ এবং তাঁহার স্বর্গীয় সান্নিধ্যে বসিয়া ধ্যানাভ্যাস আমার জীবনের অমূল্য মুহূর্ত। ওকল্যাণ্ড শহরের যে অংশে কলকারখানা নাই, সেই অংশের কর্মশান্ত জনবিরল রাস্তাগুলিতে আমি স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে সকালে ও সন্ধ্যায় বেড়াইতাম। সেইসকল দীর্ঘ ভ্রমণে আমি পাইতাম আধ্যাত্মিক আদর্শবাদের রাজ্যে সুদূর দৃষ্টি। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের স্নিগ্ধালোকে বেড়াইতে বেড়াইতে আমার মন এমন এক ভাবলোকের আভাস পাইত, যাহার ঔজ্জ্বল্য পার্থিব সূর্যের কিরণাপেক্ষা অধিকতর প্রভাশালী। স্বামী তুরীয়ানন্দ ভারতের আধ্যাত্মিকতা ও দর্শনের গূঢ়রহস্যে আমাকে দীক্ষিত করিতেছিলেন।"

যাঁহারা স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে শান্তি আশ্রমে গিয়াছিলেন তাঁহারা সকলে একবাক্যে শান্তি আশ্রমের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। সেইসকল শুনিয়া শান্তি আশ্রম সম্বন্ধে স্বামী তুরীয়ানন্দের ব্যক্তিগত ধারণা জানিবার জন্য আমার আগ্রহ জন্মিল। সেইজন্য আমি একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "স্বামীজী আশ্রমটি কি সত্যই এরূপ আদর্শস্থল?" তিনি উত্তর দিলেন, "হাঁ, আশ্রমের পক্ষে ইহা একটি আদর্শ স্থান।" আমি পুনরায় প্রশ্ন করিলাম, "'আশ্রমের পক্ষে আদর্শ স্থান' বলিতে আপনি কি বুঝাইতে চান?" পশ্চাৎ দিকে ঘাড়টি একটু বাঁকাইয়া এবং প্রসন্নভাবসূচক অর্ধনিমীলিত নয়নে আমার দিকে তাকাইয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "ভগবদ্ধ্যানের পক্ষে ঐ স্থান অতীব উপযুক্ত।" আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "পাশ্চাত্ত্য সভ্যতায় এই আশ্রমের মত একটি স্থানের কি মূল্য?" তিনি বলিলেন, "মানুষ ঈশ্বরকে জানিতে চায় এরূপ যেকোন সভ্যতায় এরকম আশ্রমের মূল্য অসীম। যে দেশে

১ 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় ১৯১৮ খ্রীঃ মে মাসে 'শান্তি আশ্রমে দিনগুলি'-শীর্ষক প্রবন্ধ।

মানবমন ধর্মপ্রবণ তথায় মাঝে মাঝে নির্জন বাসের জন্য এইরূপ স্থানের প্রয়োজন হয়। যাঁহারা সর্বাপেক্ষা আধ্যাত্মিকভাবসম্পন্ন তাঁহাদের প্রধান কর্মস্থল জনসমাজ হইলেও তাঁহারা মাঝে মাঝে নির্জন স্থানে প্রস্থান করেন।"

একটি স্ত্রীভক্ত স্বামী অতুলানন্দকে পত্রে[১] লিখিয়াছিলেন, "স্বামী তুরীয়ানন্দ ওকল্যাণ্ডে যেসকল ক্লাশ করিতেন সেগুলি সান্‌ফ্রান্সিস্কোর ক্লাশ অপেক্ষা ছোট হইত। কিন্তু সেগুলিতে আরও ঘনিষ্ঠ আলোচনা হইত বলিয়া আমার খুব ভাল লাগিত। প্রায়ই আমি তাঁহার সঙ্গে সান্‌ফ্রান্সিস্কো হইতে ওকল্যাণ্ডে আসিতাম সেই ক্লাশগুলিতে যোগদানের জন্য। পাশ্চাত্ত্যবাসিগণ 'এটা কেন করে, ওটা কেন করে'—এইসকল প্রশ্ন তিনি আমাকে সর্বদা করিতেন। আমি তখন অল্পবয়স্কা ছিলাম। তাই তাঁহার সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে না পারিয়া ঘাবড়াইয়া যাইতাম। সুতীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি সহায়ে তিনি আমার চরিত্রের দোষগুলি দেখাইয়া দিতেন। সেইগুলি সংশোধন করিবার জন্য আমিও খুব চেষ্টা করিতাম।"

১ 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার ১৯২৭ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় স্বামী অতুলানন্দের পত্রে উদ্ধৃত।

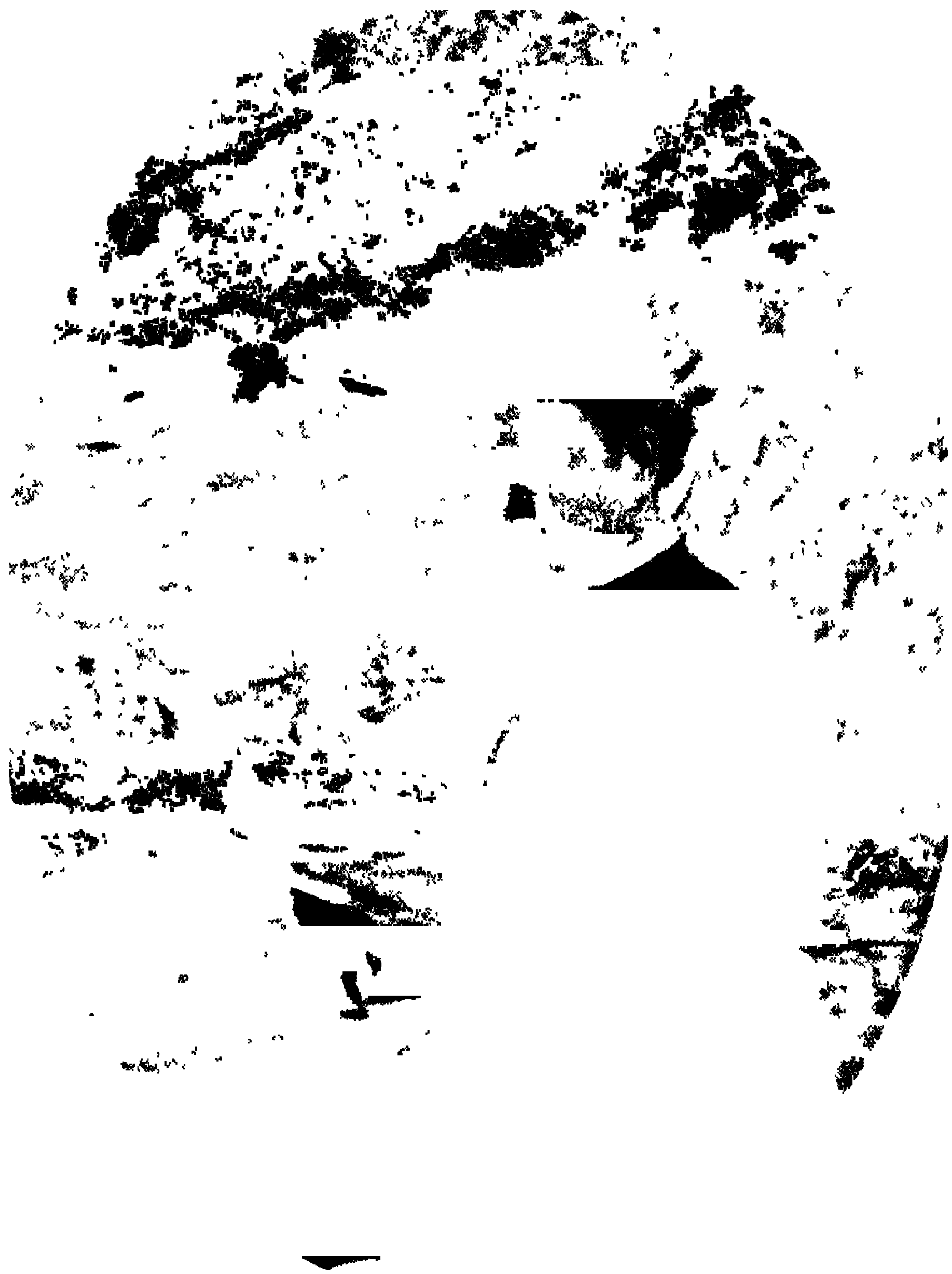
ষষ্ঠ অধ্যায়

আমেরিকায় তিন বৎসর

শান্তি আশ্রমে (১)

স্বামী বিবেকানন্দ যখন দ্বিতীয়বার আমেরিকায় যান তখন নিউইয়র্কে বেদান্তানুরাগিনী কুমারী বুক বেদান্তসাধনার জন্য আশ্রম-স্থাপনার্থ কালিফোনিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে ১৬০ একর (প্রায় ৫০০ বিঘা) নিষ্কর ভূমি দান করেন। স্বামীজী এই বিপুল দান গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু স্থানটি পরিদর্শন করিতে পারেন নাই। তিনি স্বামী তুরীয়ানন্দকে তথায় যাইয়া আশ্রম স্থাপন করিতে বলিলেন। স্বামীজী গুরুভ্রাতাকে বলিলেন, "সেখানে যাও, কাজে প্রাণ ঢেলে দাও, সন্ন্যাসীর মত থাক এবং ভারতকে ভুলে যাও।"

স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামীজীর আদেশ শিরোধার্য করিলেন; কিন্তু ভারতকে ভুলিতে পারিলেন না। তিনি একদিন শান্তি আশ্রমে বলিয়াছিলেন, "তোমরা জান, আমি তোমাদের সকলকে কিরূপ ভালবাসি, কিরূপ তোমাদিগকে অভিন্ন জ্ঞান করি, তোমাদিগকে পরমাত্মীয় মনে করি। বস্তুতঃ আমি ভুলিয়া যাই যে, আমি বিদেশে আছি। কিন্তু ভারতকে একেবারে ভোলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।" ভারতকে বিস্মৃত না হইলেও স্বামী তুরীয়ানন্দ আমেরিকাকে স্বদেশতুল্য ভালবাসিতেন এবং উহার গুণাবলীর প্রশংসা করিতেন। কথাপ্রসঙ্গে একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমাদের মেয়েরা কেমন সবল ও স্বাধীন! তোমাদের সমাজে স্ত্রী ও পুরুষের সম্বন্ধ কি সুন্দর! তোমরা চাকরদের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার কর আমি তা খুব পছন্দ করি। তীব্র কর্ম সত্ত্বেও তোমরা



কালিফোর্নিয়া, আমেরিকা

বাক্যে কেমন সংযত! তোমাদের কথায় চীৎকার নাই, উত্তেজনা নাই। তোমরা শৃঙ্খলাপ্রিয় ও সময়ানুবর্তী। তোমরা সর্ব জিনিস পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখ।…”

আশ্রমের ভূমিদাত্রী কুমারী বুকের সহিত স্বামী তুরীয়ানন্দ কালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত লস এঞ্জেলস যান। উক্ত শহরে স্বামী বিবেকানন্দ যাঁহাদের অতিথি হইয়াছিলেন তাঁহাদের বাড়ীতেই উঠিলেন। উক্ত গৃহে তিনটি সহোদরা ভগিনী থাকিতেন। তাঁহারা সকলে বেদান্তানুরাগিনী ছিলেন। স্বামীজী তাঁহাদিগকে পরিহাসচ্ছলে ‘তিনটি করুণা’ (**Three Graces**) বলিতেন। ভগিনীত্রয় স্বামী তুরীয়ানন্দকে পাইয়া আনন্দে অধীরা হইলেন এবং নবাগত সন্ন্যাসীকে সমুদ্রতীর, পার্শ্ববর্তী শহরগুলি এবং কমলালেবুর বড় বড় বাগান দেখাইলেন। কালিফোর্নিয়া কমলালেবুর জন্য প্রসিদ্ধ। লস এঞ্জেলসেও স্বামী তুরীয়ানন্দ জগন্মাতার চিন্তায় ও প্রসঙ্গে নিমগ্ন ছিলেন। ধর্মশিক্ষা, ধর্মালাপ ও শাস্ত্রব্যাখ্যায় তাঁহার দিনগুলি কাটিত। তথায় তিনি প্রভাবশালী প্রচারকরূপে পরিগণিত হইলেন। তাঁহাকে সেখানে রাখিবার জন্য বন্ধুগণ চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তিনি ত স্বামীজী কর্তৃক অন্য কার্যের জন্য প্রেরিত। তিনি তথায় কয়েক সপ্তাহ কাটাইয়া ২৬শে জুলাই (১৯০০) সানফ্রান্সিস্কোতে পৌঁছিলেন। উক্ত শহরে তিনি সশ্রদ্ধ সম্বর্ধনা পাইলেন। কারণ এইখানেই স্বামীজী স্থানীয় ভক্তদিগকে বলিয়াছিলেন, “আমি কেবল বক্তৃতাই দিলাম। কিন্তু আমি আমার এমন এক গুরুভ্রাতাকে পাঠাইব, যে দেখাইবে ও শিখাইবে আমি যা বলেছি তা কিরূপে কার্যে পরিণত করা যায়।”

স্বামীজীর অল্পসংখ্যক অনুরাগী বন্ধু মিলিত হইয়া সানফ্রান্সিস্কোতে বেদান্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বন্ধুগণ নিয়মিতভাবে মিলিত

হইয়া উক্ত সমিতিতে বেদান্তপাঠ করিতেন। তাঁহাদের লইয়াই স্বামী তুরীয়ানন্দ কাজ আরম্ভ করেন। অচিরে তাঁহার ক্লাশে শ্রোতার সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। তন্মধ্যে যে বারজন বেদান্তসাধনার জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন তাঁহাদের লইয়া তিনি সান্ আন্তনিও উপত্যকায় শান্তি আশ্রম স্থাপনার্থ যাইতে প্রস্তুত হইলেন। ১৯০০ খ্রীঃ ৩রা আগস্ট যাত্রার দিন নির্দিষ্ট হইল। কিন্তু সানফ্রান্সিস্কো হইতে সান্ আন্তনিও উপত্যকা বহুদূর। সানফ্রান্সিস্কো হইতে সান্ জোস পর্যন্ত ট্রেনে, তথা হইতে বাইশ মাইল চারি-ঘোড়ার গাড়ীতে চড়াই-উতরাই পথে ৪৪০০ ফুট উচ্চ হ্যামিলটন পর্বতশিখরে অবস্থিত জগদ্বিখ্যাত লিক অবজার্ভেটারী পর্যন্ত। সান্ জোস হইতে হ্যামিলটন পাহাড়ে উঠিতে সাণ্টাক্লারা উপত্যকায় অবস্থিত আঙ্গুর, কমলা প্রভৃতি ফলের বড় বড় সুন্দর বাগান। সমুদ্রতীরবর্তী পর্বতশ্রেণীর মধ্যে হ্যামিলটন সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। তথা হইতে নিম্নপথে দক্ষিণ-পূর্বে আঠার মাইল দূরে সান্ আন্তনিও উপত্যকায় যাইতে হয়। কিন্তু এই দীর্ঘ যাত্রা কষ্টকর হয় নাই। রমণীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য, ক্লান্তিহর বায়ু, ফলের বাগান, অলিভ উদ্যান, আঙ্গুর বাগান, যাত্রিগণের উৎসাহ, স্বামী তুরীয়ানন্দের সংস্কৃত শ্লোকাবৃত্তি ও চিত্তাকর্ষক ধর্মপ্রসঙ্গ উক্ত যাত্রাকে সুখকর করিয়াছিল। সান্ জোসে শেষ রেলওয়ে স্টেশন ও বাজার অবস্থিত। এই স্থান হইতে সান্ আন্তনিও চল্লিশ মাইল পথ।

স্বামী তুরীয়ানন্দ সানফ্রান্সিস্কোতে একদিন ক্লাশে বলিয়াছিলেন যে, ঠাকুর তাঁহাকে প্রথম ঈশ্বরলাভ করিতে এবং তদন্তে সংসারে বাস ও কর্ম করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তদনুযায়ী হরি মহারাজ ঈশ্বরলাভকেই স্বীয় জীবনের প্রধান কর্তব্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ছাত্রছাত্রীগণকে তাহাই করিতে উদ্বুদ্ধ করিতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আরও বলিয়াছিলেন, "পদ্মপত্রের মত হও। পদ্মপত্র জলের উপর ভাসে, কিন্তু জল উহাতে লাগিয়া থাকে না। অথবা ননীর তুল্য হও। ননী দুধের উপর ভাসে, উহার সহিত মিশ্রিত হয় না। চিত্ত শুদ্ধ করিয়া ঈশ্বর দর্শন কর। তখন সংসারে থাকিলেও আসক্ত হইবে না।" শান্তি আশ্রমের যাত্রিদলের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠা একটি তরুণী ছিল। স্বামী তুরীয়ানন্দ পথে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, ইড়া, তুমি আমাদের সঙ্গে এলে কেন? তুমি ত অল্পবয়স্কা বালিকা-মাত্র। তুমি আশ্রমে যাইয়া কি করিবে?" "ও! স্বামীজী, আমি ওখানে যাচ্ছি এইজন্য যে, আমি ননী হতে চাই।" তাহার সরল উত্তরে হরি মহারাজ অতিশয় প্রীত হইয়া বলিলেন, "হাঁ, নিশ্চয়ই তুমি ননীর মত হইতে পারিবে, যদি সাধ্যমত চেষ্টা কর।"

প্রীতিপ্রদ যাত্রার শেষে যাত্রিদল সান্ আন্তনিও উপত্যকায় উপস্থিত হইলেন। মানবনিবাস হইতে সুদূরে পর্বতোপরি জঙ্গলাকীর্ণ উচ্চ-নীচ-স্থানসঙ্কুল এই উপত্যকা। ওক, পাইন, চাপারাল ও মানজ্ঞানীতাদি বৃক্ষে উহার একাংশ পরিপূর্ণ। অন্য অংশ সমতল ও তৃণাচ্ছাদিত। সুদূরে চিরতুষারাচ্ছন্ন সমুচ্চ সিয়ারা নেভাদা পর্বতশ্রেণী। শান্তি আশ্রমের বিস্তৃত ভূমিখণ্ড দেড় মাইল দীর্ঘ ও আধ মাইল প্রস্থ। ইহার চারিদিকে কাঁটা তারের বেড়া। ইহা জলহীন ও অনুর্বর, গ্রীষ্মে অতি উত্তপ্ত ও শীতে অতি শীতল হয়। গ্রীষ্মকালে ইহার তাপ ১১৮° ফারেনহিট পর্যন্ত উঠে এবং শীতকালে ইহার শীতলতা ১৬° ফা. অথবা তন্নিম্নেও নামে। কোন কোন বৎসর বরফ পড়ে। শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়, তারপর সব শুষ্ক হইয়া যায়। একটি খাড়ী উহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত, কিন্তু উহা বৎসরের অধিকাংশ সময় শুষ্ক থাকে। একপ্রকার ছোট ঘাস সারা জমিতে হয়। এই ঘাস খাইয়া

অসংখ্য পশু বাঁচিয়া থাকে। ইহা পশুচারণ মাঠরূপেও ব্যবহৃত হইত। গৃহপালিত পশুগুলি এখানে চড়িয়া বেড়াইত এবং ঘাস খাইয়া বাড়িত এবং বড় হইলে কসাইদের কাছে বিক্রীত হইত। এতদ্ব্যতীত দূরে দূরে কয়েকটি ক্ষীণকায় প্রস্রবণ আছে। এই নির্জন আরণ্য আশ্রমে কয়েকটি নরনারী বেদান্তসাধনের জন্য তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর সান্নিধ্যে বাস করিতে গিয়াছে। তাহাদের জীবনে ইহা অভিনব প্রচেষ্টা। স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে বাসান্তে তাহাদের জীবন উন্নত ও পরিবর্তিত হইয়াছিল। যে যেমনটি আসিয়াছিল তেমনটি ফিরিয়া যায় নাই। গুরুর প্রভাব কেহ প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। জ্বলন্ত অগ্নির পার্শ্বে বসিলে শীতল শরীর উত্তপ্ত হইবেই। দিব্য স্ফুলিঙ্গ প্রত্যেকের সাধন-প্রদীপ জ্বালাইল। স্বামী তুরীয়ানন্দ আশ্রমটির নাম রাখিলেন 'শান্তি আশ্রম'।

একটি পুরাতন কাঠের ঘর ব্যতীত আশ্রম-গৃহ বলিয়া তখন কিছুই ছিল না। এতগুলি লোক কোথায় থাকিবে ও শুইবে? জল কোথায় পাওয়া যাইবে? অনেক দূর হইতে জল আনিতে হয়। স্বামী তুরীয়ানন্দ কিঞ্চিৎ নিরুৎসাহ হইলেন। আশ্রম-ভূমির এধার হইতে ওধার তিনি ঘুরিয়া দেখিলেন। তিনি ভগ্নহৃদয়ে জনৈক ছাত্রকে বলিলেন, "তোমরা আমাদের কোথায় এনেছ?" কিন্তু আমেরিকান ছাত্রছাত্রীগণ হতোদ্যম হইলেন না। তাঁহারা কষ্টসহিষ্ণু, সাহসী, শ্রমশীল ও কর্মঠ ছিলেন। কাহার কাহার তাঁবুতে বাস করা অভ্যাস ছিল। সাময়িক ব্যবস্থা অচিরে করা হইল। কিন্তু হরি মহারাজ ভয় করিলেন যে, কঠোর পরিশ্রমে তাঁহাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে পারে। তিনি প্রাঙ্গণে পাইচারি করিতে করিতে জগন্মাতাকে অভিযোগপূর্বক বলিলেন, "মা, একি করলে? তোমার

অভিপ্রায়ই বা কি? এই ১৪।১৫টি লোক এরূপ কঠোরতা অভ্যাস করলে মারা যাবে। আশ্রয় নাই, জল নাই; তারা এই অবস্থায় কি করবে?" একটি ছাত্রী স্বামী তুরীয়ানন্দের মনোভাব বুঝিতে না পারিয়া ভাবিল, স্বামী তুরীয়ানন্দ বোধ হয় বিশ্বাস হারাইয়াছেন। সে তাঁহার নিকট যাইয়া বলিল, "স্বামীজী, আপনি হতাশ হইলেন কেন? আপনি জগন্মাতার উপর বিশ্বাস হারাইলেন নাকি? আপনি চিন্তিত হইবেন না। তিনি সব ঠিক করিয়া দিবেন।" স্বামী আশ্চর্যান্বিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, সুখস্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ গৃহে বাস এবং নাগরিক জীবনযাপন করিয়া এই রমণী এত সাহসী! তিনি ঘাড় সোজা করিয়া সোৎসাহে বলিলেন, "তুমি ঠিক বলেছ। মা আমাদিগকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন। তোমার কি বিশ্বাস! এখন হইতে তোমার নাম হইবে শ্রদ্ধা।"

রাত্রিতে স্বামী তুরীয়ানন্দ জগদম্বার নিকট হইতে আশ্বাস ও অভয় পাইলেন। তিন-চার মাইল দূর হইতে আশ্রমে জল আনিতে হইত। পরদিন এক জলবিদ্যাবিৎ লোক আসিলেন এবং অল্প চেষ্টায় অদূরে জলের সন্ধান পাইলেন। শীঘ্রই তথায় জল পাইবার ব্যবস্থা হইল। ক্রমশঃ আবশ্যকীয় ব্যবস্থা হইতে লাগিল। কয়েকটি তাঁবু খাটান এবং একটি কূপ খনন করা হইল।

প্রথমে সকলেই তাঁবুতে থাকিতেন। পরে কাঁচা ইটের এবং কাঠের কেবিন নির্মিত হইল। স্বামী তুরীয়ানন্দের সময়ে তিন-চারিটি কাঠের কেবিন তৈরী হইয়াছিল। কাঠের কেবিনগুলি ব্রহ্মচারী গুরুদাস এবং মিঃ রোয়ার কর্তৃক নির্মিত। এক একটি কেবিন এক একজনের বাসযোগ্য ছিল। কাঁচা ইটের একটি কেবিনে ভগিনী ধীরা ও ভগিনী প্রস্তৃতি একত্রে থাকিতেন। একটি ধ্যানঘরও নির্মিত

হইল। একজনের সাহায্য বিশেষভাবে কাজে লাগিল। তিনি উত্তমশীল, আজ্ঞাবহ ও শিল্পকার্যে নিপুণ ছিলেন। যেখানে সাহায্য দরকার সেখানে তিনি অচিরে উপস্থিত হইতেন। তাঁহার সেবাপ্রিয়তাদর্শনে প্রীত হইয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহার নাম রাখিলেন সাধুচরণ। সুতরাং অল্পকালের মধ্যে স্থানটি বাসযোগ্য ও আরামপ্রদ হইল। দৈনন্দিন কার্যতালিকা প্রচলিত হইল।

আশ্রমবাসীরা প্রাতে পাঁচটায় শয্যাত্যাগ করিতেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ ও পুরুষগণ প্রধান তাঁবু হইতে একটু দূরে স্নান সারিতেন। শীত ও গ্রীষ্মকালে প্রাতঃস্নান চলিল। শীতকালীন প্রাতে স্নানার্থ কূপসমীপে যাইবার সময় এত অন্ধকার থাকিত যে, পথ দেখিবার জন্য লণ্ঠন লইতে হইত। শীতও তখন এত অধিক ছিল যে, স্নানান্তে ফিরিয়া আসিয়া দেখা যাইত, ভেজা তোয়ালেগুলি ঠাণ্ডায় বরফ জমাতে শক্ত হইয়া গিয়াছে। তৎপরে ধ্যানঘরে আগুন জ্বালিয়া সকলে উহার চতুর্দিকে বসিতেন। গ্রীষ্মকালে বৃক্ষতলে প্রাতঃকালীন ধ্যান হইত। শীতকালে প্রাতঃকালীন ধ্যানের পূর্বে স্বামী তুরীয়ানন্দ সংস্কৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন। সকলকে লইয়া তিনি এক ঘণ্টা ধ্যান করিতেন। ধ্যানান্তে ছাত্রীগণ প্রাতর্ভোজ প্রস্তুত করিতেন এবং ছাত্রগণ জল আনা, কাঠকাটা, শাকসব্জী লাগান ও কেবিন-নির্মাণকার্যে নিযুক্ত হইতেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ আশ্রমের সকল কাজেই আগ্রহ দেখাইতেন ও সাধ্যমত যোগ দিতেন। বেলা আটটার সময় ক্যাম্বিস-নির্মিত আহার-কক্ষে প্রাতর্ভোজ পরিবেশিত হইত। পাহাড়ের হাওয়া ও শারীরিক পরিশ্রমে সকলের শরীর যে কেবল ভাল রহিল তাহা নহে, স্বাস্থ্যোন্নতিও দেখা গেল। প্রাতর্ভোজের ঘণ্টাটি বিশেষ উপভোগ্য ছিল। স্বামী তুরীয়ানন্দ নানা বিষয়ে প্রসঙ্গ করিতেন।

সকলে সেই প্রসঙ্গে যোগ দিত। আলোচনা-স্রোতের গতিটি তিনি সযত্নে সর্বদা রক্ষা করিতেন। হাসি ও ঠাট্টা সত্ত্বেও জীবনের লক্ষ্য কখনও দৃষ্টিচ্যুত হইত না।

প্রাতরাশের পর প্রত্যেকে স্ব স্ব কার্য্য করিতেন। দশটা হইতে এগারটা গীতাব্যাখ্যা হইত। তৎপরে পুনরায় এক ঘণ্টা ধ্যান। বেলা একটায় দ্বিপ্রহরের আহার, সন্ধ্যা সাতটায় নৈশ ভোজন এবং তৎপরে সান্ধ্য ধ্যান। রাত্রি ১০টায় প্রত্যেকে স্ব স্ব তাঁবুতে শুইতে যাইতেন। ইহাই ছিল আশ্রমের সাধারণ নিয়ম। কিন্তু স্বামী তুরীয়ানন্দ সদা কর্মরত থাকিতেন। তিনি কখন একে, কখন বা তাকে কিছু বলিতেন। সর্বদা তিনি জগন্মাতার প্রসঙ্গই করিতেন। তিনি অন্য প্রসঙ্গ ভালবাসিতেন না। কখন কখন তিনি বলিয়া উঠিতেন, "মায়ের চিন্তায় মগ্ন হও, জাগতিক বিষয় ভুলিয়া যাও। আশ্রমে কেবল মায়ের কথা, মায়ের চিন্তাই চলুক। শহরের ভাব এখানে আনিও না। সেসব ভুলিয়া মাকেই ভাব।" যখন ছাত্র-ছাত্রীগণের কয়েকজন মিলিত হইয়া আলাপ করিতেন, তিনি সহাস্যে তাহাদের কাছে যাইয়া বলিতেন, "তোমরা কি বিষয়ে আলাপ করছ? সকলে মিলে তাঁর চিন্তাই কর, তাঁর কাছে যাবার চেষ্টা কর।" তাঁহার উপদেশ কোন বিশেষ সময় বা দিনের জন্য নির্দিষ্ট ছিল না। তাঁহার ধর্ম রবিবার বা কোন নির্দিষ্ট দিনের জন্য নহে। তিনি স্বয়ং যাহা করিতেন তাহাই অন্যকে শিক্ষা দিতেন। তাঁহার অফুরন্ত কথা ছাত্রছাত্রীগণকে দিব্যভাবে আবিষ্ট করিত।

কখন তাঁহার ভাবাবেগ আসিবে কেহ জানিত না, ইহার নির্দিষ্ট সময় ছিল না। সেইজন্য ছাত্রছাত্রীগণ সর্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিতে চাহিতেন যাহাতে তাঁহার হৃদয়-উৎস হইতে বহির্ভূত ভাবকণিকাগুলি নিঃশেষে

পান করিতে পারেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ শান্তি আশ্রমে দিব্যভাবে এত আবিষ্ট থাকিতেন যে, সকলের মনে হইত জগন্মাতা তাঁহার অন্তরে জাগ্রত হইয়া তাঁহার জিহ্বা অবলম্বনপূর্বক আশ্রমবাসীদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। তিনি তাঁহাদিগকে জগদম্বার সন্তান বলিয়া অভিহিত করিতেন। তাঁহার এই আহ্বান শ্রোতাদের কর্ণে মধুবর্ষণ করিত, তাঁহাদের হৃদয়ে আশার আলোক জ্বালিয়া দিত।

একদা রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ দেখিলেন যে, আহার পাক করিবার সময় একটি ছাত্রী পাত্র হইতে কিঞ্চিৎ আহার্য তুলিয়া লবণের পরিমাণ ঠিক হইয়াছে কিনা জানিবার জন্য আস্বাদ করিতেছে। তাহা দেখিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "আমরা ভারতে রাঁধবার সময় কখন চাখি না, কারণ এগুলি ঈশ্বরকে নিবেদন করা হয়। আমরা নিজেদের জন্য বা পরিবারবর্গের জন্য রাঁধি না, ঈশ্বরকে নিবেদন করবার জন্যই আমরা পাক করি। ঈশ্বরকে অন্ন নিবেদন করা হলে বাড়ীর সকলে প্রসাদ গ্রহণ করি। সেইজন্য আমরা রান্নাঘর ও পাকের জিনিসগুলি সর্ব পরিষ্কার রাখি। আমরা স্নান ও উপাসনা শেষ করে শুদ্ধ কাপড় পরে রান্নাঘরে যাই। আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি কাজ ঈশ্বরকে নিবেদন করা উচিত। তা হলে আমাদের দ্রুত আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে।" যখন তাঁহাকে ফুল উপহার দেওয়া হইত তিনি সেগুলি আঘ্রাণ না করিয়া বা কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতির সম্মুখে স্থাপন করিতেন। একবার গুরুদাস মহারাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামীজী, আপনি ফুল পছন্দ করেন না?" তিনি উত্তর দিলেন, "হাঁ, নিশ্চয়ই। নচেৎ কিরূপে সেগুলি আমি ঠাকুরকে দিই? আমরা দেবতাকে নিবেদন না করিয়া ফুল আঘ্রাণ করি না।"

কখন কখন নূতন ছাত্র বা ছাত্রী আসিত। একবার একটি তরুণী ছাত্রী আসিল। সে শুনিয়াছিল ভারতে শিষ্যগণ সমিৎপাণি হইয়া অরণ্যবাসী গুরুর কাছে যাইতেন। ছাত্রীটি আশ্রমসংলগ্ন জঙ্গলে ঢুকিয়া কয়েক খণ্ড শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহপূর্বক স্বামী তুরীয়ানন্দের তাঁবুতে গেলেন। তিনি বলিলেন, "ভিতরে এস।" নবাগতা তাঁবুতে প্রবেশ করিয়া কাষ্ঠখণ্ডগুলি সম্মুখে রাখিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ স্বামী তুরীয়ানন্দজী নবাগতার ভাবটি বুঝিলেন এবং উচ্চশিক্ষিতা তরুণীর সরলতা ও নম্রতায় মুগ্ধ হইলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দের মাতৃসুলভ স্নেহে আশ্রম-জীবন অচিরে মধুময় হইয়া উঠিল। তাই নবাগত ছাত্রছাত্রীগণ আশ্রমের ভাব অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারিতেন। আলস্য কাহাকেও স্পর্শ করিত না, জীবনের বাহিরে ও অন্তরে কর্মতৎপরতা ছিল। স্বামী তুরীয়ানন্দ আধ্যাত্মিক অগ্নিকুণ্ডস্বরূপ ছিলেন। সেই দিব্য অগ্নি আশ্রমবাসীদের জীবন উজ্জ্বল করিয়া রাখিত। পরম উৎসাহ ও ঐকান্তিকতার বলে প্রত্যেকে ঈশ্বরচিন্তায় ডুবিয়া যাইতে চেষ্টা করিতেন।

আশ্রমে কোন নির্দিষ্ট নিয়মকানুন ছিল না। একদা একটি ছাত্র হরি মহারাজকে কয়েকটি নিয়ম নির্ধারণ করিতে বলিলেন। তুরীয়ানন্দজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা নিয়ম চাও কেন? তুমি কি দেখছ না, প্রত্যেকে কেমন সময়ানুবর্তী? আমরা সকলে কেমন নিয়ম অনুযায়ী চলছি। কোন ধর্মপ্রসঙ্গে বা ধ্যানে কেহ অনুপস্থিত হয় না। মা নিজেই তাঁর সব নিয়ম করে রেখেছেন। তাতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আমরা কেন আমাদের নিয়মাদি করতে যাব? আশ্রমে স্বাধীনতা থাকুক, কিন্তু যথেচ্ছাচারিতা যেন আশ্রমে না ঢোকে। ইহাই মায়ের শাসননীতি। আমাদের কোন সংঘ নাই। কিন্তু দেখ, আমরা কেমন

সংঘবদ্ধ। এইপ্রকার সংঘই টিকে থাকে। অন্যপ্রকার যে সংঘ তা কালে ভেঙ্গে যায়। এইরূপ সংঘই মানুষকে মুক্ত করে, অন্যপ্রকারের সংঘ মানুষকে বদ্ধ করে। সংঘের ইহাই শ্রেষ্ঠ স্বরূপ, কারণ ইহা আধ্যাত্মিক নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত।"

অন্য এক সময় স্বামী তুরীয়ানন্দ এই বিষয়টি আরও পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছিলেন। অপর এক সময় আর একটি ছাত্র মন্তব্য করিয়াছিলেন, "স্বামীজী, কি আশ্চর্য্য! এত বিভিন্ন প্রকৃতির নরনারীগণ একত্রে শান্তিতে থাকিতে পারে!" স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "এর একমাত্র কারণ এই যে, আমি প্রেমের দ্বারাই শাসন করি। তোমরা সকলে প্রীতিসূত্রে আমার সঙ্গে আবদ্ধ। অন্য কি উপায়ে ইহা সম্ভব হতে পারে? তুমি কি দেখছ না, আমি সকলকে বিশ্বাস করি এবং সকলকে স্বাধীনতা দিই? আমি যে এইরূপ করি তাহার কারণ, আমি জানি তোমরা সকলে আমাকে ভালবাস। কোথাও সংঘর্ষ নাই, সবই নির্বিঘ্নে হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মনে রেখো, এ সব মা-ই করছেন। এতে আমার কোন হাত নাই। তিনি আমাদিগকে এই পারস্পরিক প্রীতি দিয়েছেন যাতে তাঁর কাজ ঠিক ভাবে চলে ও বাড়ে। যতক্ষণ আমরা তাঁর অনুগত থাকব ততক্ষণ কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। কিন্তু যে মুহূর্তে আমরা তাঁকে ভুলে যাব অমনি মহা বিপদ ও ভয় এসে হাজির হবে। সেই জন্যই ত আমি তোমাদিকে সর্বদা বলি, 'মায়ের চিন্তা কর।'"

ক্রীশ্চান সায়েন্সে বিশেষজ্ঞ একটি ছাত্র একবার স্বামী তুরীয়ানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের শরীরটাকে সুস্থ রাখা কি আমাদের কর্তব্য নয়?" স্বামী তুরীয়ানন্দ উত্তর দিলেন, "হাঁ। কিন্তু সর্বোচ্চ দৃষ্টিভঙ্গীতে দেহধারণই মহাব্যাধি, মহাবিঘ্ন! আমরা দেহজ্ঞানের অতীত হয়ে অনুভব করতে চাই, আমরা অজর, অমর আত্মা। যে উচ্চতর অবস্থায়

আমরা জানতে পারি, 'আমি এই দেহ নই, আমি নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত আত্মা ; দেহ মায়িক, মিথ্যা'—সেই অবস্থা লাভের পথে দেহপ্রীতিই বড় বাধা। যতদিন আমরা দেহকে ভালবাসব, ততদিন আমাদের আত্মজ্ঞান হবে না, এবং আমরা বার বার জন্মগ্রহণ করব। যখন আমরা দেহকে ঠিক ঠিক ভালবাসব তখন দেহের প্রতি আমাদের ঔদাসীন্য আসবেই আসবে। দেহাসক্তি দূরীভূত হলেই মুক্তির দিব্যালোক দৃষ্টিগোচর হবে।"

একটি ছাত্রীর মন সিদ্ধাই-প্রবণ ছিল। স্বামী তুরীয়ানন্দ এক দিন দেখিলেন তিনি স্বতঃ-লেখন অভ্যাস করিতেছেন। তিনি মনকে জড়বৎ নিষ্ক্রিয় করিয়া স্বতঃ-লেখনের জন্য হাতে একটি পেন্সিল লইয়া বসিলেন। হাতটি প্রেতচালিত হইয়া নড়িতে ও লিখিতে আরম্ভ করিবে এবং তিনি উক্ত লেখা প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিবেন—ইহাই ছিল ছাত্রীটির উদ্দেশ্য। এই উপায়ে কাগজে সুন্দর সুন্দর বিষয় লিখিত হয়। ছাত্রীটিকে উক্ত কর্মে ঐপ্রকারে রত দেখিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহাকে তীব্র ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, "এ কি তোমার বোকামি? তুমি কি প্রেতচালিত হতে চাও? এই নিরর্থক ব্যাপার ছাড়। আমরা চাই মুক্তি। এই জগৎ এবং অন্যান্য সকল জগতের পারে আমরা যেতে চাই। প্রেতাত্মাদের সহিত যোগাযোগ করতে চাও কেন? তাদের শান্তিতে থাকতে দাও। এই সব মায়া। মায়ার বাহিরে যাও এবং মুক্ত হও।"

গুরুদাস মহারাজ বলেন, "স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে শান্তি আশ্রমে আমরা নিরন্তর আনন্দ ও প্রেরণা পাইতাম। তাঁহার নিকট সর্বদা শিক্ষালাভ হইত। আমরা সকলেই অনুভব করিতাম তিনি আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সদা সচেষ্ট। আধ্যাত্মিক ভাবে সদা আরূঢ়

হইয়া তিনি কখন স্থকোমল ও স্থভদ্র স্থশান্ত পিতৃতুল্য এবং কখন বা গর্জনকারী বেদান্তকেশরীবৎ ব্যবহার করিতেন। আশ্রমে একটি মুহূর্তও অবসাদ বা অলসতায় ব্যয়িত হইত না।" ব্যক্তিগত ভাবে অনেকেই কোন না কোন কঠোরতা অভ্যাস করিতেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ কাহাকেও কঠোরতা অভ্যাস করিতে বলিতেন না। তাপসের তপঃপ্রভাবে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া কোন কোন ছাত্র বা ছাত্রী তপশ্চর্যায় ব্রতী হইতেন। কেহ আহারসংযম, কেহ মৌনাবলম্বন, কেহবা নির্জনবাস করিতেন। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত তপস্যায় প্রত্যেকে বিপুল আনন্দ পাইতেন। আধ্যাত্মিকতার মূর্তি তপস্বীর কাছে কেহ উদাসীন বা অযত্নশীল থাকিতে পারিত না।

স্বামী তুরীয়ানন্দের সময়ে আশ্রমবাসিগণ নিরামিষাশী ছিলেন। আশ্রমে কাহাকেও পশুপক্ষী শিকার করিতে দেওয়া হইত না। কিন্তু এই অহিংস নীতি কতদূর কিভাবে পালন করা উচিত? বিশেষ উপলক্ষ্য না হওয়ায় এই বিষয়টি কাহার মনে উঠে নাই। একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। স্বামী তুরীয়ানন্দ যে তাঁবুতে থাকিতেন উহার কাঠের মেজে ছিল। মেজে ও মাটির মধ্যে একটু ফাঁক ছিল। একদিন স্বামী তুরীয়ানন্দ যখন তাঁবুতে ঢুকিতেছিলেন তখন একটি বড় র‍্যাটল সর্প[১] মেজের নীচে লুকাইল। কি করা যায়? সাপটি ত যেকোন সময় তাঁবুর মধ্যে যাইতে পারে! লম্বা লম্বা লাঠির দ্বারা ইহাকে ইহার গুপ্ত স্থান হইতে সহজে তাড়াইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু তারপর? সাপটি মারা যাইবে কিনা? পরামর্শ-সভা বসিল। স্বামী তুরীয়ানন্দ সিদ্ধান্তের ভার আশ্রমবাসীদের উপর ছাড়িয়া দিলেন।

১ আমেরিকার একজাতীয় বিষধর সর্প। ইহার লেজে কতকগুলি এরূপ অস্থিগ্রন্থি থাকে যাহা গমনকালে ঝম্ ঝম্ শব্দ করে।

ামান্য মতভেদ হইল। কিন্তু অধিকসংখ্যক ব্যক্তি সাপটি মারিবার ক্ষে ছিলেন না। তাঁহারা বলিলেন, "এস আমরা সাপটিকে ধরে াহাড়ের উপরে ছেড়ে দিই। সেখানে আর সে আমাদের কোন অনিষ্ট রতে পারবে না।" কিন্তু সাপটি ধরিবে কে? একটি বৃহৎ বিষধর র্পকে ধরিয়া দূরে লইয়া যাওয়া সহজ ব্যাপার নহে। অনেকে সাপটি রিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সাপটিকে তাঁবুর নীচে হইতে তাড়ান হইল। সকলে লাঠি হাতে দূরে দূরে উহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। সে সজোরে ঝম্ ঝম্ শব্দ করিতে লাগিল, কিন্তু ক্রুদ্ধ হইলেও আক্রমণ করিতে সাহসী হইল না। সে সতর্ক ও কুণ্ডলীকৃত রহিল এবং কেহ একটু কাছে আসিলে ফণা তুলিয়া ফোঁস্ ফোঁস্ করিতে লাগিল।

প্রথমতঃ সাপটিকে লাঠির ভয় দেখাইয়া দূরে লইয়া যাওয়া হইল। পরে কৌশলে উহার গলায় দড়ির ফাঁস পরাইয়া দুইজনে দীর্ঘ দড়ির দুই প্রান্ত ধরিয়া উহাকে শূন্যে তুলিয়া বহু দূরে লইয়া গেল। তথায় সাপটিকে নামাইয়া দড়ির দুই দিক ছোট করিয়া কাটিয়া ফেলা হইল। সাধুচরণ নামক আশ্রমবাসী এই কার্যে সর্বাগ্রণী ছিলেন। সাপটিকে দূরে ফেলিয়া সকলে আপনাদিগকে নিরাপদ ভাবিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, দুই এক দিনের মধ্যেই সাপটিকে পূর্ব স্থানে আবার দেখা গেল। উহার গলায় দড়ি থাকায় সহজে উহা চেনা গেল। এবারেও পূর্ব প্রকারে তাহাকে আরও দূরে লইয়া ফেলা হইল। পরে উপহাসচ্ছলে সকলে উহাকে 'নেকটাই'-পরা সাপ বলিয়া উল্লেখ করিতেন।[১]

এইরূপ ছোট ছোট সাময়িক ব্যতিক্রম ব্যতীত শান্তি আশ্রমে ধ্যান তপস্যার স্রোত নিরবচ্ছিন্ন গতিতে বহিতে লাগিল। আশ্রমে পুরুষের সংখ্যা ছিল অতি অল্প, বাকী সকলে মহিলা। কেহ কেহ মৌনী থাকিয়া

১ 'With the Swamis in America' পুস্তকে ৮০—৮১ পৃষ্ঠায় বিবৃত।

সাধন-ভজন করিতেন। তবে তুরীয়ানন্দজী নিয়ম করিয়াছিলেন যে, তিন দিনের বেশী কেউ এই ভাবে থাকিতে পারিবে না। একবার তিনি নিজে সাত দিনের জন্য মৌনব্রত লইয়াছিলেন। একমাত্র গুরুদাস মহারাজ তাঁহাকে চা ও টোষ্ট দিয়া আসিতেন। তিনি স্বীয় কেবিনের বাহিরে যাইতেন না। সেই সময় কোন আশ্রমবাসিনী তাঁহাকে না জানাইয়া মৌনব্রত গ্রহণ করেন। তিনি ইহা জানিতে পারিয়া পঞ্চম দিবসে নিজ মৌনব্রত ভঙ্গ করেন এবং উক্ত আশ্রমবাসিনীও তাঁহার নির্দেশে স্বীয় সংকল্প হইতে বিরত হন।

শান্তি আশ্রমে[১] (২)

"তাঁহারা থিয়সফিষ্ট," "তাঁহারা অল্‌ট্রুরিয়ান," "তাঁহারা শেকার," "তাঁহারা বেনামীদলভুক্ত," "তাঁহারা মর্ত্যে স্বর্গরাজ্য-স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন," "তাঁহারা অবিবাহিত, নিরামিষাশী, বিশ্বাসে রোগা-রোগ্যকারী ক্ষেপার দল"—হিন্দু দর্শনমার্গে সাধনশীল কয়েকজন নরনারী সম্বন্ধে সান আনতোন উপত্যকার বিস্ময়বিমুগ্ধ অধিবাসীরা এইসকল অজ্ঞজনোচিত অদ্ভুত মন্তব্য প্রকাশ করিত। মাসাধিক পূর্বে সান

১ আমেরিকার শান্তি আশ্রমে স্বামী তুরীয়ানন্দের বেদান্তসাধন ও যোগশিক্ষাদান সম্বন্ধে কালিফোর্নিয়ার তদানীন্তন বিখ্যাত সংবাদপত্র 'সানফ্রান্সিস্কো ক্রনিক্‌ল্'এ ১৯০০ ২৬শে আগষ্ট রবিবার এই হৃদয়গ্রাহী বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত বিবরণ 'সানফ্রান্সিস্কো ক্রনিক্‌ল্'এর নিজস্ব সংবাদদাত্রী কর্তৃক লিখিত। সেই মহিলা শান্তি আশ্রম পরিদর্শনান্তে উক্ত বিবরণ লিখিয়াছিলেন। ১৯০০ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে 'ব্রহ্মবাদিন্‌' ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকাদ্বয়ে 'সানফ্রান্সিস্কো ক্রনিক্‌ল্' হইতে উহা উদ্ধৃত হয় এবং স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক অনূদিত হইয়া উহা 'উদ্বোধন' পত্রিকায় ১৩৫৬ বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

আনতোন উপত্যকার অধিবাসীদের মধ্যে তাহাদের শান্তিপ্রদ নিম্নভূমিতে সমাগত কয়েকজন লোক সম্বন্ধে এইসকল কৌতূহলোদ্দীপক জনরব রটিয়াছিল। সান্ জোস হইতে ঐ অদ্ভুত যাত্রিদল সভ্যতার প্রচলিত পথ ছাড়িয়া হ্যামিলটন্ পাহাড় অতিক্রম করিয়া খাড়া ও বাঁকা উতরাই পথে মনোরম ইসাবেল উপত্যকায় পৌছিলেন। তৎপরে তাঁহারা শুষ্কপ্রায় কোয়োট নদী পার হইয়া একটি পশুচারণ-ভূমির মধ্য দিয়া সান্ আনতোন উপত্যকায় পৌছিয়াছেন। এই অদ্ভুত লোকদের সুখ্যাতি চারিদিকে লোকমুখে ছড়াইয়া পড়িতেছে। তাঁহাদের সম্বন্ধে লোকে বিচিত্র ও চমকপ্রদ বর্ণনা দিতেছে।

শান্তি আশ্রমে যাত্রার অদীর্ঘ পথে উক্ত সান্ আন্তোনিও উপত্যকায় আগত ভাবুকদের উদ্দেশ্য ও কার্য সম্বন্ধে স্থানীয় লোকদের মনোভাব জানিবার জন্য কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলে প্রত্যেকেই একবাক্যে আমাকে বলিত, "আপনি তাঁহাদের জানেন না?" আমি যথার্থ অথচ কপট উত্তর দিতাম, "আমি সানফ্রান্সিস্কো হইতে এতদূর আসিয়াছি তাঁহাদের সম্বন্ধে জানিবার জন্য। গ্রামবাসী তোমরা ভদ্র ও অকপট। তোমরা তোমাদের বন্ধুদের প্ররোচনায় নিশ্চয়ই তোমাদের নবাগত প্রতিবেশীদের সমালোচনা করিবে না।" আমার সামান্য জিজ্ঞাসাদ্বারা যতটুকু আশা করিতাম তদপেক্ষা অধিক তথ্য তাহাদের উত্তরে পাইতাম। এই নবাগতদের রহস্যজনক কার্যাবলী সম্বন্ধে উপত্যকা-বাসীদের ধারণা এত চমৎকার এবং কল্পনা এত ব্যাপক ও চিত্তাকর্ষক যে, তাঁহাদের কথা মনোযোগ সহকারে শুনিবার জন্য পথিপার্শ্বে শ্রোতার আসন গ্রহণ করিলাম। যতই আমরা বিজন উপত্যকার নিকটবর্তী হইলাম ততই জনরব ঘনিষ্ঠ ও বিচিত্র হইতে লাগিল। আমরা যতই হ্যামিলটন পাহাড়ের উতরাইতে নামিতে লাগিলাম ততই

শ্যামল স্বর্ণাভ পাহাড়ের মনোরম নয়নরঞ্জক দৃশ্য আমাদের উভয়পার্শ্বে দৃষ্টিগোচর হইল। যে ছোট পরিষ্কার গাড়ীতে আমি যাইতেছিলাম উহার চালক আমাকে স্থানীয় জনশ্রুতির কথা বলিতে লাগিল।

যতই প্রদোষের অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া রাত্রিতে পরিণত হইল ততই জনরব আরও আশ্চর্যজনক ও নিবিড় হইল। নবাগতদের গতিবিধির আভাস পাওয়া গেল দূরস্থিত তাঁবুর আলোকে। গাড়ীর চালক আমাকে বলিতে লাগিল, কিরূপে ক্ষুদ্র সত্যান্বেষী দলের নেতা শ্যামাঙ্গ হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহার আমেরিকান শিষ্যদের সম্মোহিত করিয়াছিলেন, কিরূপে তাঁহারা রাত্রিতে শিবিরাগ্নির চারিদিকে ধ্যানচক্রে বসেন এবং অদ্ভুত মন্ত্রাদি উচ্চারণ করেন, কিরূপে অগ্নিশিখা হইতে উত্থিত অদ্ভুত বস্তুরাশি চতুর্দিকস্থ প্রাচীন, পুরাতন ওক গাছের মধ্যে ও পার্শ্বে ঘুরিতে থাকে। সে বলিল, যাহারা স্বামী তুরীয়ানন্দের মুগ্ধকর প্রভাবের গণ্ডীর মধ্যে সাহসপূর্বক যাইতে পারে তাহারা এইসকল অলৌকিক দৃশ্য দেখিতে পায়।

এই পাহাড়ী লোকটি আমাকে বলিল যে, সে এইসকল গল্প আদৌ বিশ্বাস করে না। শিকারী যেমন শিকার ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে আগ্রহশূন্য, খেলোয়াড় যেমন খেলা ছাড়া অন্য সকল কার্যে উদাসীন, তেমনি ছিল অনুৎসাহ ও ঔদাসীন্য এই গাড়ীচালক পাহাড়ীর মন্তব্যে। আমরা কৌতূহলপূর্ণ নীরবতায় অভিভূত হইয়া শান্তি আশ্রমে পৌঁছিলাম। কল্পনাপ্রিয় গ্রামবাসীদের বর্ণিত স্থানে উপস্থিত হইয়া আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য উৎসুক হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। আশ্রম নিবিড় নীরবতায় সমাচ্ছন্ন। প্রজ্জ্বলিত অগ্নির যে শিখাসমূহ নীলাকাশে উঠিতেছিল, উহার সামান্য সোঁ সোঁ শব্দে নীরবতা কিঞ্চিৎ ব্যাহত হইতেছিল। দূরস্থিত পাইনবৃক্ষের অস্পষ্ট ধ্বনি কর্ণগোচর হইতে লাগিল

হিন্দুগণ যে দেবতার উপাসনা করেন সেই দেবতার উপাসকগণ প্রজ্জ্বলিত অগ্নির চতুর্দিকে সুখাসনে ধ্যানমগ্ন। উহার একপার্শ্বে বুদ্ধমূর্তির ন্যায় নিস্পন্দ এবং সেই প্রাচীন জগদ্গুরুর ন্যায় ধ্যানাসনে স্থিরভাবে উপবিষ্ট ছিলেন আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং তাঁহার উভয় পার্শ্বে ছিলেন শিষ্যগণ। সকলের চক্ষু স্তিমিত এবং সকলের মুখে তন্ময়তার শান্তভাব সুস্পষ্ট। মাঝে মাঝে সুমধুর সঙ্গীতবৎ সংস্কৃত শ্লোকের উচ্চারণধ্বনি নীরবতা ভঙ্গ করিতেছিল। তৎপরে আবার পাইনবৃক্ষের ভাষাহীন সঙ্গীত শ্রুত হইল। উপাসকগণের ধ্যানমগ্নতা এবং বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা এত গভীর ছিল যে, অভ্যাগতের আগমন এবং জড় জগতের অস্তিত্ব তাঁহারা আদৌ অনুভব করিতে পারিলেন না। যে হিমালয় হইতে তাঁহাদের আচার্য সমাগত, সেই হিমালয়ের গভীরতম নির্জন প্রদেশে যেন তাঁহারা বাস করিতেছেন!

অবশেষে এক শান্তমূর্তি ব্যক্তি উঠিয়া আমাকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন। যে ভদ্র গাড়ীচালক এবং শিষ্ট শিকারী আমাকে শেষ কয়েক মাইল পথ দেখাইয়া আনিয়াছিল তাহাদিগকেও তিনি মিষ্ট বাক্যে সন্তুষ্ট করিলেন। তারপর তিনি আমাকে রান্নাঘরে লইয়া যাইয়া আমার জন্য আবশ্যকীয় আহার্য প্রস্তুত করিলেন এবং ধুনির পাশে ধ্যান সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আমার আপ্যায়নে নিযুক্ত রহিলেন। পরে আমরা অন্য সকলের সঙ্গে যোগ দিলাম। যখন অগ্নিচক্রের মধ্যে উপবিষ্ট এবং উহার পবিত্র উত্তাপসীমার মধ্যবর্তী হইলাম তখন উক্ত ক্যাম্প অন্য অন্য ক্যাম্পের মতই প্রীতিদায়ক মনে হইল। কিন্তু ঐ ক্যাম্পের অসাধারণত্ব ছিল স্বামী তুরীয়ানন্দের সুদর্শন ও সমুজ্জ্বল মূর্তি। স্বামী তুরীয়ানন্দ গেরুয়া রঙের পোশাকপরিহিত ছিলেন। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকের ন্যায় তাঁহার গায়ের রঙ শ্যামল। তাঁহার চক্ষু উজ্জ্বল ও কালো, কপালে গভীরচিন্তাসূচক

সূক্ষ্মরেখাশ্রেণী, প্রফুল্ল সুঠাম দেহ অথচ উচ্চ আভিজাত্যের অবর্ণনীয় ভাবপূর্ণ মুখমণ্ডল। অন্য সকলে তাঁহার শিষ্য এবং আশ্চর্যের বিষয় তাঁহারা ছিলেন সংখ্যায় দ্বাদশ। তাঁহারা আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সুসভ্য নাগরিক। তাঁহাদের গাত্রবর্ণ এবং পরিচ্ছদাদি সাধারণ ও স্বদেশীয়। স্বামী তুরীয়ানন্দের শিষ্যদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন মহিলা।

কল্পনা করুন, যে স্থান হরিণ, শশক, কপোত, ভারুই প্রভৃতি শিকারযোগ্য বন্য পশুপক্ষীতে অধ্যুষিত সেখানকার আশ্রমে একটিও বন্দুক নাই! কল্পনা করুন, নৈশ শিবিরাগ্নির পাশে ক্লীমেণ্টাইন এবং স্পেনীয় ক্যাভেলিয়ারের পরিবর্তে সংস্কৃত শান্তি-পাঠ! কল্পনা করুন, অরণ্যে শিকারীর অসম সাহসিকতার গল্পের পরিবর্তে বিশ্বের ক্রম-বিকাশ এবং উহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা! সংক্ষেপে কল্পনা করুন, সাধারণ ক্যাম্পের প্রত্যেক আদর্শ এখানে নির্বাসিত এবং তৎপরিবর্তে রহিয়াছে মানবের অন্তর্নিহিত দেবত্বের ঐকান্তিক অনুসন্ধিৎসা। তাহা হইলে আপনি শান্তি আশ্রমের একটি স্পষ্ট চিত্র পাইবেন। অবশেষে ধ্যানের পরিবেশ কিঞ্চিৎ অপসারিত হইলে আমি তুরীয়ানন্দজীকে বলিলাম, "স্বামীজী, আমি আপনার সম্বন্ধে কিছু লিখিতে আসিয়াছি।" স্বামী তুরীয়ানন্দ হাসিয়া বলিলেন, "আমরা সভ্যতার পরিবেশ হইতে দূরে থাকিবার জন্য শহর হইতে বহু মাইল দূরে আসিয়াছি। কি আশ্চর্য! দেখিতেছি সেই সভ্যতাই আমাদের পশ্চাতে পুনরায় ধাবমান!" আমার হস্তস্থিত ক্যামেরাটি তাঁহার একটি সাধারণ ছবি লইবার অভিপ্রায়ে বিধৃত হওয়ায় তিনি সুমিষ্টস্বরে বিস্ময়মিশ্রিত বিরক্তির সুরে বলিয়া উঠিলেন, "শিব, শিব, শিব!" পরে জানিলাম, অপ্রীতিকর বা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিলে ঐসকল হিন্দু-সন্ন্যাসী উক্তপ্রকার মাঙ্গলিক শব্দোচ্চারণ করিয়া থাকেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি

আমাকে একটি প্রশ্ন করিতে অনুমতি দিবেন? আপনি কি সংক্ষেপে বলিবেন এখানে কি করিতে চান, কি আদর্শ ও উদ্দেশ্য লইয়া শান্তি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত?" তিনি উত্তর দিলেন, "নিশ্চয়ই। স্বামী বিবেকানন্দ যে রাজযোগ লিখিয়াছেন এবং যাহাতে পাতঞ্জল যোগসূত্রের অনুবাদ আছে, উহার প্রারম্ভেই আমরা তাহা পাইব। বইখানি এখানে আছে, আসুন আমরা পড়ি।—'প্রত্যেক মানবহৃদয়ে দেবত্ব নিহিত। বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিয়া অন্তর্নিহিত দেবত্ব প্রকাশ করাই জীবনের লক্ষ্য। কর্ম, উপাসনা, যোগ বা জ্ঞান, এইগুলির একটি বা একাধিক বা সকলমার্গ অবলম্বনে এই দেবত্ব প্রকাশ কর এবং মুক্ত হও। ইহাই ধর্মের সারতত্ত্ব। মতবাদ, দার্শনিক তত্ত্ব, অনুষ্ঠান, পুস্তক, মন্দির বা অন্যান্য পদ্ধতি—সকলই সহায়ক মাত্র, মুখ্য নহে।' "

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য আপনি কোন্ কোন্ আহার্যত্যাগ, নিঃশ্বাস-নিরোধ প্রভৃতি কয়েকটি দৈহিক প্রক্রিয়া অভ্যাস করেন? উহাদের তত্ত্ব কি?"

স্বামী তুরীয়ানন্দ—"কেবলমাত্র এইজন্য যে, যাহা সূক্ষ্ম তাহাকে সংযত করা অপেক্ষা যাহা স্থূল তাহাকে আয়ত্ত করা অপেক্ষাকৃত সহজ। প্রথমতঃ নিঃশ্বাস সংযত করিয়া দেহকে বশীভূত কর। কারণ নিঃশ্বাসই দেহের প্রধান স্থূল গতি। উক্ত অভ্যাসবলে দেহের সূক্ষ্ম গতিগুলি অনিবার্যরূপে অধীন হইবে। মনঃসংযমের শক্তিতে সকল জ্ঞানলাভ হয়। প্রাণবায়ু স্থির হইলে সহজে মন স্থির হয়, মনের চিন্তাশীলতা জাগ্রত হয়। বাহ্যবস্তুর উপর মনকে একাগ্র করা শক্ত নয়। মনের দ্বারা মনকে পর্যবেক্ষণ করিলে আত্মাকে জানা যায়। আমরা এখানে সম্পূর্ণ সরল ও সহজসাধ্য উপায়ে আত্মজ্ঞানলাভের চেষ্টা করিতেছি। এই উপায়সমূহ 'রাজযোগ' গ্রন্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।"

আগ্রহান্বিত দলের সকলেই সুস্পষ্ট প্রীতি ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদের আচার্যের জ্ঞানোদ্দীপক শিশুসুলভ মুখমণ্ডলের দিকে তাকাইতেছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনারা কি সকলে সন্ন্যাসী বা যোগী হইতে চান?" তন্মধ্যে একজন সহাস্যে বলিলেন, "সুদূর ভবিষ্যতে হইতে পারি। এই প্রকার আধ্যাত্মিকতা সাধনের জন্য এই আশ্রম স্থাপিত। আমরা আশা করি, সমস্ত আমেরিকায় এই আশ্রম বেদান্ত-সাধনের কেন্দ্রস্থল হইবে। ভারতের বাহিরে ইহাই একমাত্র শান্তি আশ্রম এবং কালিফর্নিয়া নির্জন প্রান্তরবহুল হওয়ায় আশ্রমের পক্ষে এই দেশ প্রশস্ত।"

তারপর তাঁহারা আমাকে বলিলেন, তাঁহাদের অন্যতমা কুমারী মিনি বুক কর্তৃক আশ্রমের জমি প্রদত্ত। জমির আয়তন ১৬০ একর। স্থানটি মরুভূমিতুল্য নির্জন ও অনুর্বর, রেলওয়ে স্টেশন হইতে চল্লিশ মাইল দূরবর্তী, এবং চিত্ত-বিক্ষেপকারী সভ্যতার পরিবেশ হইতে বহুদূরে অবস্থিত। অবাঞ্ছিত ক্যামেরাকে লক্ষ্য করিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ আবার 'শিব! শিব! শিব!' উচ্চারণান্তে কোন এক আশ্রমবাসীকে সহাস্যে বলিলেন, "চেতন, তুমি বলিয়াছিলে যে, আমাদের আশ্রমটি আর একটু মার্কিন-ভাবাপন্ন হইলে ভাল হয়। এই দেখ, সভ্যতার এক বাহন আসিয়াছে! শিব, শিব, শিব!"

চেতন কেবল বলিলেন, "আজকাল কোন কিছুই ফটোগ্রাফির চক্ষু হইতে গোপন রাখা যায় না।" তিনি পরে আমাকে ঘনজনাকীর্ণ এই উপত্যকার অদ্ভুত গল্প করিলেন। সুইজারল্যাণ্ড, ইটালী এবং জার্মেনির লোক এই সমতলভূমিতে চাষ করিতে আসিয়াছিল। তখন স্থানটি মনুষ্যকণ্ঠধ্বনিতে মুখরিত ছিল। কিন্তু জলাভাব এবং জিনিস-পত্রের আমদানি-রপ্তানির অসুবিধার জন্য সেই ক্ষুদ্র উপনিবেশ এই

সুন্দর উপত্যকায় আর রহিল না। এখন এখানে পড়িয়া আছে জনহীন গৃহ, ছাত্রছাত্রীশূন্য বিদ্যালয়, জলশূন্য কূপ এবং শস্যশূন্য গোলাঘর। শস্যক্ষেত্র এখন পশুচারণক্ষেত্রে পরিণত। পার্শ্ববর্তী একটি মাঠের আয়তন ৪৪৫০০ একর। এইসকলের জন্য আশ্রমের চারিদিকে নির্জনতা সম্ভব হইয়াছে।

মার্কিনোচিত নির্ভীকতায় হিন্দু-ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "স্বামীজী, ক্যাম্পের আগুনের পাশে আমরা সব সময় ভূতের গল্প করিয়া থাকি। আপনি ভারতীয় ভূতের গল্প আমাকে আজ বলিবেন? আপনি কি নিজে কখনো ভূত দেখিয়াছেন?" স্বামী তুরীয়ানন্দ নিরতিশয় সরলতার সহিত বলিতে লাগিলেন, "হাঁ। মনে হয় আমি একবার ভূত দেখিয়াছিলাম। কিন্তু ইহা মনের ভ্রমও হইতে পারে। ভারতে আমাদের মঠে এইটি ঘটিয়াছিল। একটি বন্ধুর সহিত আমি আমাদের মঠের হলঘরে পায়চারি করিতেছিলাম। হঠাৎ এক অপরিচিত ব্যক্তিকে আমাদের দিকে আসিতে দেখিলাম। মুহূর্তমধ্যে সে মুখ ফিরাইয়া মঠের একটি অব্যবহৃত কক্ষে ঢুকিয়া পড়িল। উক্ত কক্ষে কেহ নাই—ইহা বলিবার জন্য উহার পশ্চাতে যাইয়া দেখি, সে অন্তর্হিত। কক্ষে ঢুকিয়াও তাহার কোন সন্ধান পাইলাম না। আমার বন্ধুটি তাহাকে আদৌ দেখে নাই। পরে শুনিলাম, ঐরূপ চেহারার এক ব্যক্তি সেই কক্ষে আত্মহত্যা করিয়াছিল। অবশ্য ইহা আমার মনের খেয়ালও হইতে পারে। এই কথা আমি পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু ইহা মনের ভুল নাও হইতে পারে। প্রেতাত্মাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না।"

স্বামী তুরীয়ানন্দ পুনরায় বলিলেন, "ইহা ছেলেখেলা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। মৃত ব্যক্তিগণের স্থূলশরীরহীন আত্মাই ভূত। তাহারা

অশরীরী—আমরা ইহা ভুলিয়া যাই, তাই তাহারা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।" তৎপরে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম দিকে আশীর্বাদ প্রেরণ করিয়া তিনি স্বীয় তাঁবুতে গেলেন। আশ্রমে তেরটি তাঁবু এবং একটি কাঠের ঘর আছে। পরম সমাদরপূর্বক একটি গৃহতুল্য কক্ষ তাঁহারা আমার রাত্রিবাসের জন্য ঠিক করিলেন। সেই রাত্রিতে অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলাম—মহাত্মাগণ, পবিত্র অগ্নি, ভ্রাম্যমাণ ভূতাদির স্বপ্ন! রাত্রি প্রভাত হইলে আমার ক্ষুদ্র কাষ্ঠনির্মিত কেবিনের ফাঁকে ফাঁকে যখন স্বর্ণাভ অরুণকিরণ প্রবেশ করিল তখন আমার ঘুম ভাঙ্গিল। গির্জার বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গীতবৎ মধুরধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। ইহা স্বামী তুরীয়ানন্দের কণ্ঠস্বর। আমি নিদ্রিত কি জাগ্রত তাহা তখন বুঝিতে বিলম্ব হইল চক্ষুকর্ণের স্ব স্ব বিষয়ে প্রমত্ততা হেতু। স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রাতঃকালীন সূর্যস্তব আবৃত্তি করিতে করিতে নিদ্রিত আশ্রমবাসিগণকে গাত্রোত্থান পূর্বক প্রাতঃকৃত্য অনুষ্ঠানের জন্য সস্নেহ আহ্বান করিতেছিলেন। পার্বত্য প্রাতের সুন্দর সূর্যোদয় উপভোগ করিবার জন্য বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, শেষ সন্ধ্যাগ্নির ভস্মের চারিপার্শ্বে বহু শিষ্য সমবেত। আমি বসিতেই স্বামী তুরীয়ানন্দ আমার সম্মুখে একটি ধূপকাঠি জ্বালিয়া সম্মুখস্থ বালিতে পুঁতিয়া দিলেন। প্রত্যেক উপাসকের সম্মুখে এইরূপ ধূপ জ্বলিতেছিল। সুবাসিত শুভ্র ধূপের তেরটি সরু শিখা প্রাতঃকালীন আকাশে-বাতাসে মিশিয়া গেল। প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছি, ইহাই এইসকল উপাসকের একমাত্র ক্রিয়ামূলক ধর্মানুষ্ঠান। অবশিষ্ট সকলের সঙ্গে আমি চক্ষু বুজিলাম। সকালটি খুব মনোরম ও ধ্যানোদ্দীপক ছিল। চাতকের তরল স্বরকম্পন, দূরাগত গরুর ঘণ্টার টুংটুং ধ্বনি, কাঠঠোকরা পাখীর ঘন ঘন মৃদু আঘাত, চিতাবাঘের তীব্র চীৎকার, শীতল বায়ুর শ্রুতিমধুর সোঁ সোঁ শব্দ,

ধূমায়মান ধূপের সূক্ষ্ম সুগন্ধ এবং সংস্কৃত শব্দের সুমধুর উচ্চারণ ব্যতীত অন্য কিছুই কিছুক্ষণের জন্য আমার মনের বিষয়ীভূত হইল না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে অসাধারণ শারীরিক স্থৈর্য, হয়ত বা নিয়মিত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, দৃশ্যের বিচিত্র রমণীয়তা এবং আর কিছু—দিব্য পরিবেশ বা অন্য যাহাই বলুন—আমি অন্তরে তাহার ভাষাহীন অনাহূত সঙ্গীতের সন্ধান পাইলাম। বোধ করিলাম, যেন আমি অনন্ত সঙ্গীতের অসীম সুরের একটি যন্ত্র। অনির্বচনীয় অপূর্ব স্বস্থতা ও স্থিরতার আবেশ নিদ্রার মত আমাকে অভিভূত করিল। এমন অনুকূল পরিবেশের মধ্যে মনকে দুঃসাধ্য একাগ্রতায় নিমগ্ন করিয়া ঘণ্টাধিক স্বেচ্ছাপ্রসূত নিশ্চলতা অভ্যাসের উপকারিতা সাধারণ আমেরিকান কিরূপে বুঝিবে ? সকলেই ইহা পরীক্ষা করিতে পারেন। কারণ, ইহা পরীক্ষার যোগ্য। ইহাতে বিন্দুমাত্র অনিষ্টাশঙ্কা নাই।

প্রায় একঘণ্টা নীরবতা ও স্থিরতা অভ্যাসের পরে প্রথমে একজন, পরে আর একজন শিষ্য সেই সাধকচক্র ছাড়িয়া দৈনন্দিন সাধারণ কর্মে ব্যাপৃত হইলেন। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত ব্যবহার্য সমুদয় জল চার মাইল দূর হইতে বাল্তিতে ভরিয়া বহিয়া আনিতে হইত। কিন্তু সম্প্রতি শিবির হইতে সিকি মাইলের মধ্যে একটী ভাল প্রস্রবণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কেহ জল আনিতে কূপের কাছে গেলেন। আমি বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছিলাম, ইহাদের গুরু কি কোন দিব্য অধিকারের বলে শ্রমসাধ্য নিত্যকর্ম হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন ? কিন্তু আমার বিস্ময়ের অবকাশ বেশীক্ষণ রহিল না। স্বামী তুরীয়ানন্দ শিবিরের কর্মে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য বাল্তি হাতে সকলের সহিত শীঘ্র মিলিত হইলেন। নারীগণ প্রাতরাশ প্রস্তুত করিতে ব্যাপৃতা হইলেন এবং অচিরে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণরূপ ভোজনশালার দোদুল্যমান

চন্দ্রাতপের তলায় পরিবেশন করিলেন বৃদ্ধের ধূমপানের নল, ভাল রুটীমাখন, ঈষৎ সিদ্ধ ফল। বলা বাহুল্য, এই আশ্রম-শিবির নিরামিষাশী। বন্ধুদের প্রীতিপ্রদ প্রসঙ্গে, কালিফর্নিয়ায় বেদান্ত আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা এবং বর্তমানে প্যারিসে অবস্থানকারী স্বামী বিবেকানন্দের কথায় এবং মাঝে মাঝে দার্শনিক প্রসঙ্গে প্রাতর্ভোজন সমাপ্ত হইল।

"মানুষ এত পবিত্র হইতে পারে যে, তাহার পবিত্রতা যেন ছোঁয়া যায়। স্থূল অর্থে দেহও এত বিশুদ্ধ করা যায় যে, সে বিশুদ্ধি বাস্তব হয়, এবং যেখানে থাকে সেখানে ইহার বিশুদ্ধি বিকীর্ণ করে। যদি তুমি যোগাভ্যাস কর তোমার পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অনুভবশক্তি এত সূক্ষ্ম হইবে যে, তুমি এই তন্মাত্রগুলি দেখিতে পাইবে। যেমন পুষ্প হইতে সৌরভ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, তেমনি প্রত্যেক ব্যক্তি যে দৈহিক ও মানসিক পরিবেশ বিকীর্ণ করে তাহাই তন্মাত্র। আমরা স্বাধীন ও পরাধীন উভয়ই। আমাদের আত্মা মুক্ত, কিন্তু দেহ ও মন বদ্ধ। সেইজন্য বন্ধন ও মুক্তির পরস্পর-বিরুদ্ধ জ্ঞান সমকালে সম্ভূত হয়। আমরা মনে করি আমরা মুক্ত; কিন্তু প্রত্যেক মুহূর্ত আমাদিগকে বুঝাইয়া দেয় যে, আমরা বদ্ধ। যদি তুমি বল যে, মুক্তির ভাব ভ্রান্তিমাত্র, তাহা হইলে আমি বলিব যে, বন্ধনের ভাবও সমশ্রেণীর ভ্রম ব্যতীত অন্য কিছু নহে। কারণ বন্ধন ও মুক্তির জ্ঞান একই ভিত্তিতে, অর্থাৎ বুদ্ধিতে আরূঢ়। রাজযোগের ইহাই বাণী।" এইরূপে স্বামী তুরীয়ানন্দ মানজানিতা গাছের শাখায় নির্মিত আসনে টেবিলের শিরোদেশে বসিয়া কণ্ঠস্থ শাস্ত্রবাণী একটির পর একটি প্রশান্তভাবে উদ্ধৃত করিয়া আমাকে শুনাইলেন।

"কি অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি আপনাদের, স্বামীজী!" একজন বিস্ময়বিমুগ্ধ আশ্রমবাসী বলিয়া উঠিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "এখন

আমার তত নাই। অতীতে অনেকের ছিল এবং বর্তমানে কাহার কাহার আছে। একটি পুস্তক একবার মাত্র পড়িলেই মুখস্থ হইত।" আহার সমাপ্ত হইলে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখানে আপনার একটি ফটোগ্রাফ লইতে পারি কি?" আশ্রমবাসিগণের সম্মতিক্রমে চারিদিকে পর্বতবেষ্টিত শুকবৃক্ষরাজির নিম্নে লতাকুঞ্জে অবস্থিত সশিষ্য স্বামী তুরীয়ানন্দের একটি ফটো লইলাম। উক্ত কুঞ্জে তিনি ও তাঁহার অধিকাংশ শিষ্যগণ একত্রে বসিয়া আহার করেন। সকলের একত্র আহারে বসিবার সুযোগ হয় না। অল্প কয়েকজন ছাত্রী তাঁহাদের ক্ষুদ্র স্থানে একত্র বসেন। ইঁহাদের প্রায় সকলেই সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া এই হিন্দু দার্শনিকের পদানুগ হইয়াছেন।

সুস্পষ্ট স্বস্তিবোধ প্রকাশ করিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ গাত্রোত্থান করিলেন। মামুলি উচ্ছ্বসিত শব্দ উচ্চারণ করিয়া তিনি বাগানের মধ্যে উষ্ণ গৃহে গেলেন। থালাবাসন ধৌত এবং তাঁবুগুলি পরিষ্কৃত হইলে সেখানকার অক্লান্ত সাধকগণ তাঁহাদের অগণিত কর্তব্য সম্পাদনার্থ পুনরায় মিলিত হইলেন। এইবার ধ্যানের পূর্বে 'রাজযোগ' হইতে পড়া হইল। 'রাজযোগের' পরে আদি হিন্দুশাস্ত্র বেদের সংস্কৃতবাক্যাবলী প্রথমে অবর্ণনীয় সুমধুর স্বরে পঠিত এবং তদন্তে অনূদিত হইল। পঠিত বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ হইল। স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহার কপাল কুঞ্চিত করিয়া ভাবপ্রকাশক ভঙ্গীতে এবং সরল বাক্যে শিষ্যগণের সুসূক্ষ্ম সন্দেহসমূহ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। আলোচিত সামান্য সমস্যাগুলির মধ্যে ছিল সৃষ্টিতত্ত্ব, নৈতিকতা বনাম আধ্যাত্মিকতা, প্রকৃতির স্থান ও সীমা এবং ক্রমবিকাশ। হাক্সলে এবং জন ফিস্কের বাক্য উদ্ধৃত হইল। হাক্সলে বলিয়াছিলেন, বিশ্বপ্রকৃতির সাহত নৈতিক আদর্শের সম্বন্ধ নাই। ইহার প্রতিবাদে জন ফিস্কের উক্তি এই যে,

বিশ্বপ্রকৃতি কি একমাত্র নৈতিক আদর্শের জন্য বিদ্যমান নহে? স্বামী তুরীয়ানন্দ আলোচনা-সভায় শান্তি ও শৃঙ্খলাস্থাপনের জন্য শিষ্যগণকে আত্মস্বরূপের ধ্যান করিতে বলিলেন।

এইবার আমাকে ফিরিবার কথা ভাবিতে হইল। সত্যান্বেষিগণের সৎসঙ্গ করিবার সময় অতীত হইল। বহির্জগতের লোকের ন্যায় আমিও তাঁহাদিগের তথ্য অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। শান্ত সন্ন্যাসীর সুভদ্র মুখমণ্ডল এবং তৎপশ্চাতে গভীর নীলাকাশ, নবীনা ও প্রাচীনা শিষ্যাদের গুরুর ন্যায় প্রশান্ত ভাব, শিষ্যদের তন্ময়তাপূর্ণ এবং স্তিমিত বা উন্মুক্ত নয়নসমূহ আমার মনে গভীর রেখাপাত করিল। আমি আশ্রমে আরও এক ঘণ্টা কাটাইলাম। রোজ চার ঘণ্টা তাঁহারা ধ্যান ও উপাসনা করেন। আমি তাঁহাদের সাধননিষ্ঠায় স্তম্ভিত হইলাম।

মাঝে মাঝে সঙ্গীতবৎ সুমধুর অদ্ভুত ধ্বনি 'ওম্' 'ওম্' ওম্' আশ্রমে শুনা যাইত। 'আইডা' গ্রন্থে 'থ'র প্রতি মিশরীয় একটি স্তোত্রের কথা এই ওঁকার ধ্বনি আমাকে স্মরণ করাইয়া দিল। 'ওম্' 'ওম্' 'ওম্' শব্দে নিশ্চয়ই কোন যাদু আছে। ধ্যানচক্রে যোগ দিবার লোভ হইল। কিন্তু সময় কাহারও অপেক্ষা করে না। আমি আমার কেবিনে নিঃশব্দে ফিরিয়া গেলাম। প্রাচীনতম ধর্মের মঙ্গলসূচক 'ওঁ'কার ধ্বনি কালিফর্নিয়ার উপত্যকায় ধ্বনিত হইতেছে! ভারতের এই বেদান্ত-ধর্মের উৎপত্তির কাহিনী অতীতের কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন।

কিন্তু যে দেশে নিত্য এই 'ওঁ'কারধ্বনি উচ্চারিত হয় সেখানে লক্ষ লক্ষ নরনারী অনাহারে মরিতেছে বা মর্মান্তিক দারিদ্র্যে নিমজ্জিত। ইন্দ্রিয়ভোগের আত্যন্তিক ত্যাগ শিক্ষাদাতা এই ধর্ম এবং তদবলম্বী হিন্দু জনসাধারণের দুরবস্থা—এই উভয়ের মধ্যে কি কোন কার্য-কারণ সম্বন্ধ আছে? এই পর্বতবাসী ভাবুকের কথা হয়ত সত্য যে, পাশ্চাত্ত্যের

বাস্তববাদ এবং প্রাচ্যের আদর্শবাদের সম্মিলন হইতে সমুদ্ভূত সত্যযুগ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতেছে। কে জানে? এই মুষ্টিমেয় সদয় নরনারীগণের নিকট বিদায় লইয়া শান্তি আশ্রম ত্যাগ করিলাম। প্রত্যাগমনের পথে 'ওম্' 'ওম্' 'ওম্' স্বর কর্ণে বাজিল।

শান্তি আশ্রমে[১] (৩)

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের কথা। তখন হিন্দু সন্ন্যাসী আমেরিকায় দেখা যাইত না। যাঁহারা বেদান্ত সমিতিতে আসিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ জীবনে হিন্দু সন্ন্যাসী দেখেন নাই। তাঁহাদের পক্ষে স্বামী তুরীয়ানন্দকে দর্শন অভিনব অভিজ্ঞতা। স্বামী তুরীয়ানন্দ আমেরিকাতেও ভারতীয় পরিবেশ রক্ষা করিতেন। তাঁহাকে দেখিয়া কেহ কেহ একটি অদ্ভুত ভাব লক্ষ্য করিত—তাঁহার অন্তর্মুখীনতা ও চোখে মুখে এক আনমনা ভাব। এমন হইয়াছে যে, প্রশ্ন করার পর স্বামী তুরীয়ানন্দ মৃদুস্বরে 'ওঁ ওঁ ওঁ' উচ্চারণ করিতে লাগিলেন—তাঁহার উজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয় প্রষ্টার ঊর্ধ্বে শূন্যে নিবদ্ধ। এইভাবে অনভ্যস্ত লোকে প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করিত। তাহারা ভাবিত স্বামীজী তাহাদের প্রশ্ন বুঝেন নাই। প্রশ্নের উত্তর দেওয়াতেও তাঁহার এক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইত। ক্রমশঃ ভক্তগণ তাঁহার ভাব বুঝিতে পারিলেন। কারণ স্বামী তুরীয়ানন্দের বিলম্বিত উত্তর প্রষ্টার সংশয় নাশ করিত, মনে শান্তি আনিয়া দিত। গীতাতে অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "যাহা সর্বভূতের নিশা, তাহাতে

১ 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় ১৯২৯ খ্রীঃ এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত স্বামী অতুলানন্দের প্রবন্ধ-অবলম্বনে।

সংযমী জাগ্রত থাকেন এবং যাহাতে সংসারিগণ জাগ্রত থাকেন, আত্মদ্রষ্টা মুনির পক্ষে তাহা নিশা।" এই ভগবদ্বাক্য স্বামী তুরীয়ানন্দের জীবনে রূপায়িত হইয়াছিল। তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত তিনি মুক্ত পুরুষ, ঈশ্বরদ্রষ্টা এবং জগতের প্রতি অনাসক্ত। তাঁহার সঙ্গ করিলে ভক্তের হৃদয়ে অনাসক্তি ও মুমুক্ষুত্ব জাগিয়া উঠিত।

আমেরিকার মত নূতন দেশে যাইয়াও স্বামী তুরীয়ানন্দের ব্রহ্মলীন মনে কৌতূহল জাগ্রত হয় নাই। থিয়েটার প্রভৃতি দেখা বা সঙ্গীতাদি শোনার জন্য তাঁহার আদৌ আগ্রহ ছিল না। নানা অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ তিনি পাইতেন; কিন্তু ঐ সকল আমন্ত্রণ তিনি রক্ষা করিতে যাইতেন না। কোথাও যাইবার কথা বলিলে তিনি উত্তর দিতেন, "কেন বাইরে যেতে চাও? এস, আমরা মায়ের চিন্তা ও আলোচনা করি।" এই বলিয়া তিনি গ্রন্থাগার হইতে কোন সাধুর জীবনী বা অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ লইয়া উচ্চৈঃস্বরে পড়িতেন ও ব্যাখ্যা করিতেন। যখন তিনি কাহারও সঙ্গে বেড়াইতে যাইতেন তখন ধর্মপ্রসঙ্গ চলিত। কোনদিন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বা স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের ঘটনাবলী গভীর ভাবের সহিত বলিয়া যাইতেন। তাঁহাদের কথা বলিতে তিনি কখনও ক্লান্ত হইতেন না।

একদিন শান্তি আশ্রমে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। প্রাতঃকালীন ক্লাশে তিনি ঠাকুরের জীবনের অতি গোপনীয় বিষয় বলিয়া ফেলিলেন। ক্লাশের পরে স্বীয় তাঁবুতে ফিরিয়া তিনি গুরুদাস মহারাজকে বলিলেন, তিনি নিজের জিভ্‌টি হঠাৎ জোরে কামড়াইয়াছেন। উহার ফলে তাঁহার মুখে একটু রক্তও আসিয়াছে। তখন তিনি বলিলেন, "ঠাকুরের জীবনের রহস্যপূর্ণ ঘটনাবলী প্রকাশ করার জন্য হয়ত মা সন্তুষ্ট হন নাই। হইতে পারে কতিপয় ছাত্রছাত্রী উচ্চতর ধর্মশিক্ষার জন্য প্রস্তুত নহে।"

শান্তি আশ্রমে স্বামী তুরীয়ানন্দ সকলকে অর্থহীন আলাপ হইতে বিরত হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ সাবধান করিতেন—"তোমরা সদা গল্প গুজব করিতে চাও।" তিনি একদিন বলিলেন, "নিষ্প্রয়োজন আলাপে অনর্থ সৃষ্টি হয়। তোমরা অপরের সমালোচনা করিতে আরম্ভ কর এবং মহানন্দে আবোল-তাবোল বকিতে থাক। অপরের নিন্দা করিলে তোমার কি লাভ? নিজের দোষগুলি দেখ এবং নীরব হও। সন্ত তুলসীদাস বলেন,

রামং চিন্তয় চিত্ত বর্বর চিন্তাশতৈঃ কিং ফলম্
কিং মিথ্যাজল্পনেন সততং রে বক্ত্র রামং বদ।
কর্ণ ত্বং শৃণু রামচন্দ্রচরিতং কিং গীতবাদ্যাদিভিঃ
চক্ষুস্ত্বং রামময়ং নিরীক্ষ সততং রামাৎ পরং ত্যজ্যতাম্॥[১]

সেইজন্য আমি কখন কখন তোমাদিকে মৌনাবলম্বন এবং নির্জনবাস করতে বলি। নীরবতাকে সংস্কৃতে মৌন বলে। এর অর্থ শুধু বাক্-সংযম নয়; সকল ইন্দ্রিয়কে প্রত্যাহার করা, অন্তর্মুখীন হওয়া, মনকে আত্মাতে একাগ্র করা—এই প্রকৃত উদ্দেশ্য। মন সদা কুতূহলী, নূতন খবর পাবার জন্য সদা ব্যস্ত। আমি দেখি, যেদিন ডাক আসে তোমরা চিঠিপত্রের জন্য ছুট। পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টা তোমাদের দেহগুলি এখানে থাকলেও তোমাদের মনগুলি সান্‌ফ্রান্সিস্কোতে উপস্থিত হয়। ঐহিক বিষয়ের কৌতূহল বর্জন কর। জগদম্বার সম্বন্ধে কুতূহলী হও, তাঁকে

১—রে বর্বর চিত্ত! সদা রাম চিন্তা কর, অন্য শত চিন্তায় কি লাভ? রে বদন! বাজে কথা বলিয়া কি লাভ? সদা রামের কথা বল। রে শ্রবণ! গীতবাদ্যাদি শুনিলে কি হইবে? সদা রামচন্দ্রের লীলা শ্রবণ কর। রে নয়ন! রাম ব্যতীত অন্য সকল বস্তু ত্যাগপূর্বক রামময় দর্শন কর।

কিরূপে জানতে ও ভালবাসতে হয় তাহা শেখ। জীবনের উৎকৃষ্ট ব্যবহার কর। জীবন ক্ষণস্থায়ী। বৃথা কার্যে সময় নষ্ট ক'র না। 'আত্মানমেব বিদ্ধি। অন্যা বাচঃ বিমুঞ্চথ।' "[১]

শান্তি আশ্রমের একটি ঘটনা। আহারের টেবিলের চতুর্দিকে সকলে উপবিষ্ট। আহার অনেক পূর্বেই সমাপ্ত। কিন্তু কেহই আসন ছাড়িয়া উঠিতেছিলেন না, কেহই পার্শ্বপরিবর্তন করিতে চান নাই, পাছে স্বামী তুরীয়ানন্দের প্রসঙ্গপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাঁহার মুখ হইতে সেদিন যে দেববাণী অনর্গল প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা কখন তৎপূর্বে আশ্রমবাসীদের কর্ণে প্রবেশ করে নাই। স্বামী তুরীয়ানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাপ্রসঙ্গ করিতেছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, যেদিন তিনি ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন সেদিন তাঁহাকে শুকদেব বলিয়া মনে হইয়াছিল। ঠাকুর গাড়ী হইতে বাহিরে আসিলেন হৃদয়ের উপর ভর করিয়া। তিনি সেদিন ভাবসমাধিতে ছিলেন এবং তাঁহার পা দুইটি মাতালের মত টলিতেছিল। তাঁহার মুখমণ্ডল দিব্য-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। অন্তরে তিনি যে আনন্দ উপভোগ করিতে-ছিলেন তাহা বদনে প্রকটিত। তৎপরে তিনি এক ভক্তগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং আসনে বসিয়া মধুরকণ্ঠে, গভীরভাবে শ্যামাসঙ্গীত গাহিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর হরি মহারাজকে বলিয়াছিলেন স্বীয় শক্তির উপর নির্ভর না করিয়া ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতে। হরি মহারাজ সেদিন ঠাকুরের গভীর প্রেম ও শিশুসুলভ সরলতাদি গুণ কীর্তন

১ 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় ১৯২৭ অক্টোবর সংখ্যায় স্বামী অতুলানন্দের 'স্বামী তুরীয়ানন্দ'-শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন।

করিলেন। চাপাস্বরে তিনি বলিলেন, "আমাদের ঠাকুর আমাদিকে বলেছিলেন যে তাঁর অনেক ভক্ত আছে যারা ভিন্ন ভাষা বলে, ভিন্ন দেশে থাকে এবং যাদের চালচলনও ভিন্ন। তারাও আমার পূজা করবে। তারাও মায়ের সন্তান।" স্বামী তুরীয়ানন্দ গম্ভীরভাবে আশ্রমবাসীদিগকে বলিলেন, "মা আমাকে জানিয়ে দিলেন যে, তোমরাই তাঁর সেই শিষ্যমণ্ডলী।" এই অদ্ভুত ঘোষণায় সেখানে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। এই শুভ সংবাদ যেন কেহ বিশ্বাস করিতে পারিল না; সকলের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ আলোড়িত হইল। অবশেষে একটি ছাত্র এই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া শঙ্কিতভাবে বলিয়া উঠিলেন, "আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে, আমি এত বড় আশিসের যোগ্য।" স্বামী তুরীয়ানন্দের ভাব উদ্বেলিত। প্রথমে তিনি ভাবাতিশয্যে উত্তর দিতে পারিলেন না। তারপর আবেগভরে বলিলেন, "কে যোগ্য? ঈশ্বর কি আমাদের যোগ্যতার বিচার করেন? বাইবেলে আছে, 'যে প্রথমে এসেছে সে শেষে গৃহীত হবে, যে শেষে এসেছে সে প্রথমে গৃহীত হবে।' আমি তোমাদের বলি, ভাল হও, মন্দ হও, তোমরা নিশ্চয়ই জগন্মাতার সন্তান।" ইহার অল্পকাল পরে উক্ত ছাত্রটি দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তাঁহার মুখে শ্রীরামকৃষ্ণ-নাম উচ্চারিত হইয়াছিল।

শান্তি আশ্রমে কয়েকটি ছাত্র ছিলেন যাঁহারা পূর্বে নিজেরাই ধর্মশিক্ষক ছিলেন। তাঁহারা শিক্ষা দিতেন যে নীরোগতা চিন্তা করিয়া ইচ্ছাশক্তিবলে রোগ সারান যায়। তাঁহারা ভাল লোক ছিলেন এবং সৎজীবন যাপন করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের যে সঙ্কীর্ণ ভাবগুলি ছিল সেগুলি উৎপাটন করা শক্ত। স্বামী তুরীয়ানন্দ

দেখিলেন তাহারা নিজদিগকে ধার্মিক মনে করে এবং নূতন ভাব লইতে পারে না। তাহারা ত্যাগের মূল্যও বুঝে না। স্বাস্থ্য ও সম্পদলাভ এবং সৎ ও নির্মল নৈতিকজীবনযাপনে তাহারা বিশ্বাসী। স্বামী তুরীয়ানন্দ একদিন তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা ভাল হবার কথা সর্বদা বল। উহা তোমাদের উচ্চতম আদর্শ। আমরা ভারতে মুক্তি চাই। তোমরা পাপে বিশ্বাস কর, সেজন্য পাপ জয় করে ভাল হতে চাও। আমরা বিশ্বাস করি অজ্ঞান সকল অনর্থের মূল। সেইজন্য আমরা জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞান নাশ করতে চাই। জ্ঞানই মুক্তি। যীশুখ্রীষ্ট তাই বলেছিলেন, 'সত্য লাভ কর এবং সত্যই তোমাদিগকে মুক্ত করিবে।' "

শান্তি আশ্রমে এক বৈকালে ছাত্রছাত্রীগণ স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে বেড়াইতে গেলেন। একটি উঁচু পাহাড়ের কাছে যাইয়া সকলে উহার উপরে উঠিলেন। তথায় পাইন গাছগুলির তলায় সকলে মাটির উপর বসিলেন। কথাপ্রসঙ্গে স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "জগন্মাতা অতি গর্বিতা এবং অতি বিশুদ্ধা। তিনি আবৃত থাকেন একটি মোটা আবরণে, যাহা তাঁহার সন্তানগণ ব্যতীত কেহ উত্তোলন করিতে পারে না। যখন সন্তানগণ পর্দা তুলিয়া তাঁহাকে দর্শন করে তখন তিনি সুখী ও হাস্যমুখী হন।" একটি অল্পবয়স্ক ছাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা কে এবং কোথায় থাকেন ?" স্বামী তুরীয়ানন্দ উত্তর দিলেন, "তিনিই এইসব হয়েছেন এবং সর্বত্র আছেন। তিনি প্রকৃতিতে পরিব্যাপ্তা। তিনিই প্রকৃতি। কিন্তু কথায় কিছু হয় না। পর্দা উত্তোলন কর।" যুবকটি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরূপে স্বামীজী ?" স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "ধ্যানের দ্বারা মায়াজাল ছিন্ন হয়।"

তখন খুব জোরের সহিত স্বামী তুরীয়ানন্দ বারবার বলিলেন,

"ধ্যান কর, ধ্যান কর, ধ্যান কর। তোমরা কি করছ? তোমরা জীবন বৃথা ব্যয় করছ। গভীরভাবে মায়ের চিন্তা কর। মায়ের কাছে সদা প্রার্থনা কর। নশ্বর বস্তুর পেছনে তাকিয়ে দেখ, দেখবে এক সনাতন সত্তা সর্বভূতে বিরাজমান। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, 'ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদ্দেশে অবস্থিত।' 'আমার এই দৈবী ত্রিগুণাত্মিকা মায়া অতিক্রম করা শক্ত। যারা আমার আশ্রয় গ্রহণ করে কেবল তাঁরাই মায়ামুক্ত হয়।' তুমি যুবক, এই সময়। এ সুযোগ হারিও না। তরুণ, সবল উদ্যোগীরাই সিদ্ধিলাভ করতে পারে। জগন্মাতাকে লাভ করাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য কর। ত্যাগ কর, ত্যাগ কর, সংসার ত্যাগ কর। ত্যাগ ব্যতীত মুক্তি অসম্ভব।"

স্বামী তুরীয়ানন্দ শান্তি আশ্রমে যীশুখ্রীষ্টের কথা প্রায়ই বলিতেন। একদিন প্রাতরাশের টেবিলে একজন একটু নুন ফেলিলেন। এই ব্যাপারে সকলে তামাসা করিতে লাগিলেন। কারণ আমেরিকায় একটি প্রবাদ আছে যে, নুন ফেলিলে ঝগড়া বাধে; কিন্তু পতিত লবণের একটু খাইয়া বাকীটুকু বাম কাঁধের দিক দিয়া ফেলিয়া দিলে আর ঝগড়া বাধে না। দোষী প্রবাদানুযায়ী কাজ করাতে সকলে তাহাকে ঠাট্টা করিতে লাগিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ নিজেও ঠাট্টা-তামাসা ভালবাসিতেন। সকলে শান্ত হইলে তাঁহাকে একটু চিন্তাকুল দেখাইল। তাহার পর তিনি নিজেকে লক্ষ্য করিয়া নীচুস্বরে বলিলেন, "তোমরাই পৃথিবীর লবণস্বরূপ" (রত্নতুল্য, ভাগ্যবান)।[১] ক্ষণকাল চিন্তামগ্ন থাকিয়া যেন নিজের উদ্দেশ্যে বলিলেন, "শৃগালদের গর্ত

১ ইহা যীশুর বাণী। একদা তিনি স্বীয় অন্তরঙ্গ ভক্তদিগকে বলিয়াছিলেন, "তোমরাই পৃথিবীর লবণস্বরূপ। লবণ যদি তার লবণত্ব হারিয়ে ফেলে তবে তাকে আবার কি দিয়ে নোন্‌তা করা যাবে?"

আছে, বিহগদেরও নীড় আছে। কিন্তু ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষের মাথা রাখিবার স্থান নাই।" আবার একটু থামিয়া বলিলেন, "যে তোমাদের সঙ্গে কথা বল্‌ছে তিনিই সেই পুরুষ।" তিনি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস গ্রহণানন্তর উচ্চ ও গভীর স্বরে আশ্রমবাসীদের বলিলেন, "এইসকল বাক্যের পশ্চাতে যে অনুভূতি, যে বিশ্বাস, যে আদেশ আছে, তাহা কি তোমরা হৃদয়ঙ্গম কর? হাঁ, সত্যই যীশুখ্রীষ্ট ঈশ্বর-তনয় ছিলেন। ঐসকল দেবজীবন অনুপ্রেরণার উৎস। এইসকল মহৎ জীবনের অনুধ্যান কর! তাঁর বাণী বহু শতাব্দী চলতে থাকবে, এতে আর আশ্চর্য কি?" স্বামী তুরীয়ানন্দ কোমল কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "তারপর আমাদের ঠাকুর আসলেন, পুরাতন বাণীকে নবজীবন, নব ব্যাখ্যা দান করতে। প্রাচীন বাণীসমূহের তিনি ছিলেন জীবন্ত মূর্তি এবং তিনি কিছু অভিনব বাণীও দিলেন। তিনি শিক্ষা দিলেন যে, আন্তরিক অনুরাগ দ্বারা সকল ধর্মপথে একই ঈশ্বরের দর্শনলাভ হয়। যা তিনি প্রত্যক্ষ অনুভব করলেন তাহাই তিনি শিক্ষা দিলেন। তাঁর জীবন অদ্ভুত, অভূতপূর্ব! তাঁহার বাণী বুঝতে ও নিতে জগৎকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হইবে। তিনি কোন কৃতিত্বের দাবী করেন নাই। তিনি সদা বলতেন, 'মা-ই সব জানেন, আমি কিছু জানি না।' তাঁহার নম্রতাও যেমনি, সরলতাও তেমনি। আমরা প্রায় ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়াছি; কিন্তু তাঁহার মত আর একটিও মহাপুরুষ দেখি নাই।"

একদা আমেরিকার পথে কোন এক পরিচিত ব্যক্তি হঠাৎ গুরুদাস মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি কি মনে করেন, স্বামী তুরীয়ানন্দ একজন মহাপুরুষ?" মুহূর্তকাল বিলম্ব না করিয়া গুরুদাস মহারাজ বলিলেন, "হাঁ।" প্রশ্নকারী উত্তরে একমত হইলেন

না। মহাপুরুষ ব্যতীত অন্যের মহত্ত্ব সাধারণ ব্যক্তি বুঝিতে পারে না। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক, শিল্পস্রষ্টা বা যুদ্ধজয়ীকে আমরা প্রচলিত অর্থে বড়লোক বলি। যিনি দেশ বা কোন সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করেন তাঁহাকে লোকে বড় বলে। সেই অর্থে স্বামী তুরীয়ানন্দ বড় ছিলেন না। ব্যক্তিগত জীবনের উপর তাঁহার প্রভাব ছিল সুগভীর। যাঁহারা তাঁহার দিব্যসঙ্গে কিছুকাল বাস করিতেন তাঁহারাই তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তি অনুভব করিতেন। গুরুদাস মহারাজকে তিনি একদা বলিয়াছিলেন, "আমার কাজ সফল বিবেচনা করব যদি আমি মুষ্টিমেয় ব্যক্তিকে পবিত্র জীবনযাপন করতে এবং ঈশ্বরপরায়ণ হতে উদ্বুদ্ধ করতে পারি।" সেইজন্য তিনি লোকালয় ছাড়িয়া নির্জন পর্বতবেষ্টিত শান্তি আশ্রমে অনুরাগী ছাত্রছাত্রীগণের জীবন উন্নত ও ঈশ্বরমুখী করিবার জন্য যত্নবান হইলেন। তাঁহার সংকল্প আশাতীত-ভাবে পূর্ণ হইয়াছে। আমেরিকা ও ভারতে বহু সাধু ও ভক্তের জীবনে তিনি মুমুক্ষুত্বের হোমানল জ্বালিয়া দিয়াছেন। এমন ধর্মশিক্ষক, এমন চরিত্রনির্মাতা দুর্লভ। তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিকতার এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

জনৈক পাশ্চাত্ত্যদেশীয় সাধু বহু বৎসর তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া ধন্য হইয়াছেন। তিনি বলেন, "তাঁহার জীবন ছিল মূর্ত আদর্শ। তিনি সদা ঈশ্বরসমীপে থাকতেন এবং ঈশ্বরই ছিল তাঁহার জীবনের ধ্রুবতারা। এই তাঁর প্রকৃত মহত্ত্ব। ক্ষণকালও তিনি ঈশ্বরকে ভোলেন নাই। ঈশ্বরদর্শন তাঁর প্রাণবায়ু। তাঁর সকল বাক্যে ও কর্মে এই একই ভাব প্রকটিত হত। রসিকতায়, গাম্ভীর্যে, আহারে, বিহারে, শিক্ষায় তাঁর বীণার তারে একই সুর ঝঙ্কৃত হত। কেউ অন্য প্রসঙ্গ করতে আসলেই তিনি তা অবিলম্বে ধর্মপ্রসঙ্গে পরিণত করিতেন। এমন

ঈশ্বরপ্রসঙ্গ-প্রিয় পুরুষ পৃথিবীতে বিরল।" শান্তি আশ্রমে অন্যপ্রসঙ্গে নিরত ছাত্রছাত্রীগণকে তিনি একবার অন্য কথাবার্তা পরিত্যাগ করিয়া ভগবদালোচনায় নিমগ্ন হইতে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে দেখিলেই তাহাদের ঈশ্বর-স্মরণ হইত। শান্তি আশ্রমে তিনি একবার বলিয়াছিলেন; "যদি তোমরা সর্বদা জাগতিক ব্যাপার নিয়েই থাকবে তবে এখানে এলে কেন? তাহলে সংসারে থাক, সংসার ভোগ কর। ভুলো না, তোমরা এখানে এসেছ জগন্মাতার চিন্তা নিয়ে থাকতে। পশুরা ইন্দ্রিয়সুখে উন্মত্ত। ধর্মজীবনযাপন এবং আত্মজ্ঞানলাভ মানবের পক্ষেই সম্ভব। যদি আমরা আমাদের দেবপ্রকৃতি জানতে চেষ্টা না করি আমরা পশুর সমান।"

সানফ্রান্সিস্কো এবং লস্ এঞ্জেলেসের বেদান্তভক্তগণের সনির্বন্ধ অনুরোধে স্বামী তুরীয়ানন্দ কয়েক মাসের জন্য শান্তি আশ্রম হইতে ঐসকল স্থানে যাইয়া কাজ করেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে শান্তি আশ্রমের ভার ছিল ব্রহ্মচারী গুরুদাসের উপর। ঐ সময় গুরুদাস মহারাজকে স্বামী তুরীয়ানন্দ লস্ এঞ্জেলেস হইতে যেসকল পত্র[১] লিখিয়াছিলেন সেগুলির আবশ্যকীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। উদ্ধৃত অংশগুলি হইতে জানা যায়, স্বামী তুরীয়ানন্দ আশ্রমে যে-ভাব সদা জাগ্রত রাখিবার জন্য প্রাণপাত করিতেন তাঁহার অনুপস্থিতিতে ছাত্রছাত্রীগণ যাহাতে উহা পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখে তজ্জন্য তিনি কতদূর সচেষ্ট ও সাগ্রহ ছিলেন!

"প্রিয় গুরুদাস, নিরুৎসাহ বা হতাশ হইও না। কেন সর্বদা সুদিন ও সুসময় আশা কর? মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ হউক। সুদিনে দুর্দিনে আমরা

১ মূল পত্রাংশগুলি 'With the Swamis in America' পুস্তকের ১০০—১০৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত।

যেন মাকে না ভুলি। তাঁহার দর্শন না পাইলেও আমরা নিরাশ হইব কেন? তিনি যথাসময়ে কৃপা করিবেন। তিনিই সর্বাপেক্ষা ভাল জানেন, আমাদের পক্ষে কি কল্যাণকর। তাঁহার চরণে একবার আত্ম-সমর্পণ করিলে আমাদের সম্বন্ধে চিন্তা করিবার কি অধিকার আমাদের আছে? ইহা বলা সহজ যে, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত; কিন্তু উপায়ান্তর নাই। আমরা বুঝি আর না বুঝি, মা-ই আমাদের একমাত্র আশ্রয়। জোয়ার-ভাটা, ভালমন্দ সকল হৃদয়ে আসে; কিন্তু সেগুলিতে যেন সুখী বা দুঃখী না হই।

"প্রকৃত আন্তরিক সমবেদনার ফল আশ্চর্যজনক। এই দুঃখদৈন্যপূর্ণ জগতে একমাত্র ইহাই সর্বশক্তিমান। মায়ের কাছে তাহা চাও, নিশ্চিত পাবে। অপরের জন্য ভাব, নিজের কথা ভুলিয়া যাও—ইহাই আত্মত্যাগ, ইহাই ধর্ম, ইহাই সব। তুমি ত মৃত, তোমার আমিত্ব ত বিসর্জন দিয়াছ। মাকে কি সর্বস্ব অর্পণ কর নাই? তবে আর নিজের কথা ভাবা কেন? পদ বা নামযশের চিন্তা মনে স্থান দিও না। এইসকল ভাব ত্যাগ কর। নিষ্কাম নিঃস্বার্থ কর্মই প্রকৃত উপাসনা। ধর্মজীবনের উৎকর্ষেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব—উচ্চপদে, পাণ্ডিত্যে বা প্রভূত অর্থে নহে। মা আমাদের অন্তর দেখেন, অন্তরের সব ভাব জানেন এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা করেন। আধ্যাত্মিকতার আলোকে জীবন এমন ভাস্বর কর যেন তাহা সকলের দৃষ্টিগোচর হয়। তোমার কর্ম নীরবে, গোপনে চলুক। মা, যিনি গোপনে দেখেন, সর্বসমক্ষে তোমাকে পুরস্কৃত করিবেন। আকাশে উড্ডীয়মান পক্ষীদের বিশ্রামস্থল আছে কিন্তু ঈশ্বরসন্তানের মাথা গুঁজিবার স্থান নাই। যীশুখ্রীষ্টের কোন উল্লেখযোগ্য পদ ছিল না। তাই তিনি লক্ষ লক্ষ লোকের অন্তঃকরণে আসন পাইলেন, অসংখ্য সংসার-শ্রান্ত নরনারীর আশ্রয়স্থল হইলেন। বাবা, সাধনে লাগিয়া

থাক, ধর্মজীবন যাপন কর। মায়ের কাছে ইহার জন্য কাতরভাবে কৃপাভিক্ষা কর। ... আশ্রমে অনুষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসবের বিবরণপাঠে পরমানন্দিত হইলাম। তাঁহার প্রসঙ্গে এবং প্রার্থনায় এখানে উক্ত শুভ দিবস উদ্‌যাপিত হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন গভীর ভক্তি ও প্রকৃত ত্যাগের জীবন্ত বিগ্রহ। তিনি আমাদের হৃদয়ে ভক্তি ও ত্যাগের বিমল ভাব উদ্বুদ্ধ করুন।

"বাবা! মনে জোর আন। কোন কিছুতে হাল ছাড়িও না। দুর্বল হওয়া ভাল নয়, কারণ দুর্বলেরা পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। ইহাই জগতের নিয়ম। জগতের সঙ্গে তোমার আর সম্পর্ক কি? ভাল হও, মন্দ হও, দুর্বল হও, সবল হও—তোমরা মায়ের সন্তান। মা ব্যতীত অন্য কাহার দিকে তাকাইও না। যাহারা অজ্ঞ তাহারাই জগতের পদানত হয়। আমি নিশ্চিত যে, তুমি কখনো তাহা করিবে না।

"বৈদান্তিক সত্যের মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বেদান্তদর্শনে যেসকল সূক্ষ্মতত্ত্বের বিষয় আমরা অবগত হই, সেইগুলির পূর্ণ প্রকাশ তাঁহার জীবনে হইয়াছিল। অচলা ভক্তি-বিশ্বাসের জন্য প্রার্থনা কর। ইহা হইলেই তোমার সব চাওয়া ও পাওয়া হইবে।

"বাহিরে কোন জগৎ নাই—মন হইতে যাহা বাহিরে প্রকাশিত হয় তাহাই জগদ্‌রূপে দেখি। এই সত্যটি ধারণা করা কী শক্ত! ধারণার পরে ইহা সদা স্মরণ রাখা আরও শক্ত।

"যখন আমরা নিজেদের ক্ষুদ্র, হীন ভাবি তখনই অসুখী হই। যখন আমরা আমাদিগকে সান্ত, সসীম মনে করি তখনই নিজেদের ভাগ্যহীন মনে হয়। ইহাই দোষ। মাকে ভুলিলেই আমরা মায়ার ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া যাই। মা কৃপা করিয়া আবার তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেন। উপনিষদে আছে, 'নাল্পে সুখমস্তি, যৎ অল্পং তৎ

মর্ত্যম্। যৎ ভূমা তৎ সুখম্।' (অল্পে সুখ নাই, অল্প অনিত্য। ভূমাই সুখ।) ভূমাকে জান। ভূমাই তোমার প্রকৃত স্বরূপ, পরমাত্মা। এই পরমাত্মাকে আমরা যেন কখন না ভুলি। এই পরমাত্মাই সর্বভূতের আত্মা, জগজ্জননীর স্বরূপ এবং আমরা সেই জগজ্জননীর সন্তান।"

স্বামী তুরীয়ানন্দের অসাধারণ স্পষ্টবাদিতা সম্বন্ধে নিম্নোক্ত ভক্তদ্বয়ের বর্ণনাই যথেষ্ট। কালিফোর্নিয়ার একটি স্ত্রীভক্ত স্বামী অতুলানন্দকে একখানি পত্রে[১] লিখিয়াছিলেন, "সানফ্রান্সিস্কোতে আমরা যখন আমাদের পরমপূজনীয় স্বামী বিবেকানন্দকে শেষ বিদায়-অভিনন্দন দিলাম, তিনি আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, তিনি স্বামী তুরীয়ানন্দকে নিউইয়র্ক হইতে পাঠাইবেন। তখন স্বামীজী তুরীয়ানন্দজীর চরিত্র ও স্বভাবের গুণাবলী আমাদের কাছে কীর্তন করিলেন। সুতরাং আমরা এক অদ্ভুত ও অসাধারণ ব্যক্তির অপেক্ষায় রহিলাম। তাঁহার কাছে আমাদের অনেক কিছু শিখিবার ছিল। যতই আমরা তাঁহাকে জানিতে পারিলাম ততই তাঁহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি বাড়িতে লাগিল।

"তিনি অতিশয় সাহসী ছিলেন। কখন কখন তাঁহাকে সিংহতুল্য মনে হইত। অন্যান্য সময়ে তিনি মেষশাবকবৎ শান্ত ও ভদ্র হইতেন।

"আমাদের দোষত্রুটিগুলি সংশোধন করিতে তিনি ইতস্ততঃ করিতেন না। সেজন্য প্রায়ই আমরা অস্বস্তি বোধ করিতাম। কিন্তু তাঁহার এই চেষ্টা এত প্রীতিপূর্ণ হইত যে, তাঁহার প্রতি আমাদের ভক্তি আরও বাড়িয়া যাইত।

"সানফ্রান্সিস্কোতে অবস্থানকালে তিনি পিত্তকোষের পাথুরীরোগে ভীষণভাবে আক্রান্ত হন। তখন তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। এই উপায়ে আমি তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসি।

১ পত্রটি 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার ১৯২৭ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত।

যদিও তিনি আমাকে নির্মমভাবে বকিতেন, আমি সর্বদা জানিতাম যে, এই ভর্ৎসনার পশ্চাতে আছে নিঃস্বার্থ প্রেম ও কল্যাণকামনা। বস্তুতঃ ভর্ৎসনার পর আমরা সকলে লক্ষ্য করিতাম, আমাদের প্রতি তাঁহার সৌজন্য সহৃদয়তা বর্ধিত হইত—যেন তিরস্কার ভালবাসার মাত্রা বাড়াইয়া দিত।

"আমাদের মধ্যাহ্নভোজন কি হইবে, কিরূপে ভোজন প্রস্তুত হয়, ইত্যাদি প্রত্যেক বিষয়ে স্বামী তুরীয়ানন্দ আগ্রহান্বিত ছিলেন। কোন নূতন আহার্য প্রস্তুত হইবার পূর্বে উহা আস্বাদন করিবার জন্য তিনি বালকবৎ অধীর হইতেন। যখন তিনি রান্নার কাজে যোগ দিতেন, তখন সংস্কৃত শ্লোক সুমধুরস্বরে আবৃত্তি করিতেন এবং নানা গল্প বলিতেন। তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে আমরা ভুলিয়া যাইতাম আমরা কি করিতেছি, কারণ আমরা তাঁহার একটি কথাও হারাইতে চাহিতাম না। মধ্যাহ্নভোজনের পর তিনি বক্তৃতা ও প্রশ্নের উত্তর দিতেন। প্রশ্ন যতই জটিল হোক না কেন, তাহার উপযুক্ত উত্তর দিতে তিনি কখনও অসুবিধা বোধ করেন নাই।

"সুগন্ধের মত তাঁহার সৎসঙ্গের মধুর স্মৃতি আমাদের মনে এখনও জাগরূক। যদিও বহু বৎসর পূর্বে তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন, তথাপি আমাদের মধ্যে যাহারা তাঁহার কৃপালাভে ধন্য হইয়াছিল, তাহারা তাহা কখন ভুলিতে পারিবে না। দৈনন্দিন ঘটনাবলীকে অবলম্বন করিয়া তিনি আমাদিগকে শিক্ষা দিতেন। যীশুখ্রীষ্ট যখন তাঁহার শিষ্যগণের সহিত এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তখন তিনিও এইরূপ করিতেন। মনে হয়, সকল মহাপুরুষ এই উপায়েই ধর্মশিক্ষা দিয়া থাকেন।

"বাল্যে কেমন করিয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদতলে বসিয়া

ধর্মসাধন করিতেন সেইসকল কথাই তিনি বারবার আমাদের বলিতেন। তিনি আমাদের বিশ্বাস করাইয়া দিতেন যে, আমরা সকলেই, এমন কি আমাদের মধ্যে যাহারা সর্বাপেক্ষা অধম তাহারাও, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্তান। তিনি পুনঃ পুনঃ আমাদের বলিতেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ তোমাদের হাত ধরে আছেন। তিনি তোমাদিগকে ধর্মপথে নিশ্চয়ই চালিত করবেন।' তাঁহার আশ্বাসবাক্যশ্রবণে আমার দেহমনে আনন্দপ্রবাহ ছুটিত। কিন্তু আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, আমার সম্বন্ধে তিনি এই বিষয়ে নিশ্চয়ই ভুল করিয়াছেন। যে মধুর হাস্য ও বাক্যে তিনি আমাকে পুনরায় আশ্বস্ত করিলেন, তাহা আমি জীবনে কখন ভুলিতে পারিব না। সেই আশ্বাস-বাক্যগুলি আশীর্বাণীরূপে আমাকে আজীবন আনন্দ ও উৎসাহ দিতেছে। আমার দৃঢ় ধারণা ও প্রাণের প্রার্থনা এই যে, যাঁহারা তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন তাঁহাদের সকলের পক্ষে তাঁহার বাক্যগুলি সত্য হইবে।"

স্বামী তুরীয়ানন্দ যখন আর একবার অসুস্থ হন, তখন আর একটি স্ত্রীভক্ত আহারনিদ্রা ভুলিয়া তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। তিনি স্বামী অতুলানন্দকে[১] তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "স্বামী তুরীয়ানন্দ ছিলেন, যাকে আমরা বলি জেদী রোগী। তিনি রুগ্ন অবস্থাতেও নিজের ভাবে চলবার জন্য গোঁ ধরতেন। বালকের ন্যায় তিনি খিটখিটে ছিলেন এবং সামান্য সামান্য বিষয়ে অভিযোগ করতেন। আমি এটা বুঝতে পারতাম না। আমি আশা করেছিলাম যে, সন্ন্যাসী সকল দুর্বলতার অতীত হবেন, গ্রীসদেশীয় দার্শনিক ষ্টোয়িকদের মত নীরবে সব রোগযন্ত্রণা সহ্য করবেন—আমরা সাধারণতঃ সকলে যেরকম করে থাকি। কিন্তু তা না করে অসুখে তিনি রেগে যেতেন। কখনও তাঁকে যুক্তিহীন বলে মনে হত।

১ 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় ১৯২৭ অক্টোবর সংখ্যায় স্বামী অতুলানন্দের প্রবন্ধে উদ্ধৃত।

"একদিন সকালে যখন আমি রাত্রের সেবিকার স্থানে কাজ করতে এলাম, আমি তাঁকে অত্যন্ত বিরক্ত দেখলাম। স্বামী তুরীয়ানন্দ সেই রাতে উত্ত্যক্ত ছিলেন। আমার সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্রই তিনি ভর্ৎসনা-বাক্যে আমাকে অভ্যর্থনা করলেন। তিনি বললেন, 'পাশ্চাত্ত্য সেবিকা তোমরা, কিছুই জান না। তোমাদের শিক্ষিতা শুশ্রূষাকারিণীগণ অপেক্ষা যে-কোন হিন্দু রোগীর সেবা অধিক জানে। তোমাদের এম. ডি. ডিগ্রীধারী ডাক্তারগণের চেয়ে আমাদের মাতামহীগণ উত্তম চিকিৎসক।' অবশ্য আমি বুঝলাম, তিনি উহা আক্ষরিক অর্থে বলেন নাই। কিন্তু আপনি জানেন, শিক্ষিতা নার্স আমরা চটে যাই যখন আমাদের পেশার কেহ নিন্দা করে। সেইজন্য স্বামী তুরীয়ানন্দের মন্তব্যে ক্ষুণ্ণ হয়ে আমি তীক্ষ্ণভাবে উত্তর দিলাম, 'আপনার মাতামহীর কথা আমি কিছু জানি না। কিন্তু আমাদের দেশের লোকেরা রোগভোগের সময় আপনার চেয়ে অধিক সহ্যগুণের পরিচয় দেয়।' স্বামী তুরীয়ানন্দ বললেন, 'হাঁ, তোমরা সকলে ভান ভালবাস। আমি তোমাদের নিন্দা বা প্রশংসার তোয়াক্কা রাখি না। তোমার যদি ভাল না লাগে তুমি চলে যেতে পার। আমি কোন সেবিকা চাই না। তোমার দেশের লোকদের চেয়ে আমি আরও উত্তম ক্রীশ্চান সায়েন্টিষ্ট। যেখানে প্রশংসা পাবে সেখানে গিয়ে তোমার দম্ভ দেখাও। তোমার সঙ্গে আমার কোন কাজই চলবে না। তোমরা চাও একটু বাহ্যিক চাকচিক্য ও মৌখিক প্রশংসা। তোমাকে তুষ্ট করবার জন্য আমি ভণ্ডামি করতে পারি না। এদেশে রোগীরাও স্বাধীনভাবে চলবার সুযোগ পায় না. সেবিকা কি ভাববে—সেটি তাকে বিবেচনা করে চলতে হবে?'

"আমি স্বামী তুরীয়ানন্দকে শ্রদ্ধা করতাম। আমার অধৈর্যের জন্য আমি অনুতপ্ত হলাম। আমার চোখে জল এল। তা দেখে স্বামীজীর

ভাব সেইক্ষণে পরিবর্তিত হয়ে গেল। তিনি অতি ভদ্রভাবে বললেন, 'তুমি ত জান না, ভারতে আমরা এইরূপে চলতে অভ্যস্ত। যাদের আমরা ভালবাসি তাদের ভালর জন্য তা'দিকে বকে থাকি। যার প্রতি উদাসীন থাকি তাকে আমরা কখন বকি না। যাদের ভালবাসি তাদের ভাল করবার চেষ্টা করি। আমি সুস্থ বা অসুস্থ যাহাই হই না কেন তাতে আমার কি আসে যায়? আমি এদেশে এসেছি তোমাদের উন্নতির জন্য, আমার উপকারের জন্য নয়।'"

শাস্ত্র সত্যই বলিয়াছেন যে, সাধুর হৃদয় বজ্রাদপি কঠোর এবং কুসুমাদপি কোমল। স্ত্রীভক্তটির সরল বর্ণনাই ঘটনাটির উপর আলোক-সম্পাত করে। তাঁহার তিতিক্ষা অদ্ভুত ছিল। শেষ জীবনে তিনি যে তিতিক্ষার নিদর্শন দিয়াছেন তাহা রক্তমাংসের শরীরে সহ্য হয় না। কিন্তু লোকশিক্ষার্থ তাঁহাকে কখন কঠোর, কখন কোমল হইতে হইত। উপরোক্ত স্ত্রীভক্তটি পরে স্বীকার করিয়াছিলেন, "স্বামী তুরীয়ানন্দের মত রোগীর বা বীরোচিত সহ্যগুণের অভাব এদেশে নাই। কিন্তু তাঁর এই রুদ্র-কঠোর ভাব না দেখলে তাঁর মহত্ত্ব আমি বুঝতে পারতাম না। উল্লিখিত ঘটনার পরে, রোগের বিরামাবস্থায় তিনি করুণা ও ধৈর্যের প্রতিমূর্তি হলেন। স্বীয় মনের উপর তাঁহার সংযম ছিল অসাধারণ। তখন হতে তিনি বশীভূত বালকবৎ পরিচালিত হতেন। তাঁর আর কোন অনুযোগ ছিল না। মানবশক্তি অপেক্ষা জগন্মাতার শক্তি অধিক—এ কথা তিনি প্রায়ই আমাকে বলতেন। তিনি জগন্মাতার সন্তান। জগন্মাতা তাঁর জন্য যে ব্যবস্থা করবেন তাতেই তিনি বিনা অভিযোগে সন্তুষ্ট থাকবেন। 'মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ হোক'—এই বাক্য তাঁর জিহ্বা সদা উচ্চারণ করত এবং তাঁর মনও ইহা সদা অভ্যাস করত।" নার্সটির পেশাদারী গর্ব এই ঘটনায় চিরতরে

চূর্ণ হইল। স্বামী তুরীয়ানন্দের কৃপায় তাঁহার ধর্মজীবন লাভ হইল। তিনি বুঝিলেন, মানুষ জগন্মাতার হস্তে যন্ত্রমাত্র। তিনি তখনই স্বামী তুরীয়ানন্দের অনুরক্ত ভক্ত হইয়া উঠিলেন।

একবার স্বামী তুরীয়ানন্দ কালিফোর্নিয়ায় কোন ভক্তের অতিথি ছিলেন। গৃহিণী যখন রন্ধনে ব্যাপৃতা থাকিতেন তখন তিনি পাকশালায় যাইয়া তাঁহাকে গল্প শুনাইতেন। একদিন গুরুদাস মহারাজও উপস্থিত ছিলেন। সেদিন তিনি এক সিংহের শিকারীর জালে ধরা পড়ার গল্পটি বলিলেন। সিংহটি জালে বদ্ধ হইয়া অসহায় অবস্থায় পড়িয়া আছে। কোথা হইতে একটি ছোট ইঁদুর আসিয়া জালের দড়িগুলি একটির পর একটি কাটিয়া দিল। অচিরে সিংহ জালমুক্ত হইল। স্বামী তুরীয়ানন্দজী গল্পের উপসংহারে বলিলেন, "এইরূপে মন সংসারবন্ধন একটির পর একটি কাটিয়া আত্মাকে মুক্ত করে।"

তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিবার ধরনটি ছিল সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সুতীক্ষ্ণ অনেকের দীর্ঘস্থায়ী সন্দেহ তাঁহার উত্তরে দূরীভূত হইয়াছে। তাঁহার উত্তরশ্রবণে শ্রোতার মন জ্ঞানের নবালোকে উদ্ভাসিত হইত। উত্তর-প্রদানকালে তিনি অনেক সময় সন্ত তুলসীদাসের বাক্য উদ্ধার করিতেন। একদা সানফ্রান্সিস্কোতে এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জগতে এত দুঃখকষ্ট কেন?" তিনি উত্তর দিলেন, "তুলসীদাস বলেন, 'সতের কাছে এ জগৎ ভাল প্রতীত হয়, অসতের কাছে মন্দ! আসলে এ জগৎ ভালও নয়, মন্দও নয়। তুমি যাকে ভাল বলছ আমি হয়ত সেটাকেই মন্দ বলি। ভাল-মন্দের মাপকাঠি কোথায়? জীবনের প্রতি যার যেমন মনোভাব তার মাপকাঠিও তেমনি। প্রত্যেকের মাপকাঠি পৃথক। অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টি যতই বাড়বে ততই সেই মাপকাঠিও বদলাবে। দুঃখের বিষয় এই যে, অসৎ এখনও আমাদের চোখে পড়ে।

যখন আমরা সর্বাংশে সৎ হব তখন জগৎও সৎ দেখাবে। আমাদের মনের প্রতিবিম্বই আমরা জগতে দেখি। সর্বভূতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব কর। তখন আর মন্দ দেখবে না।' "

আলোচ্য বিষয়টি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "সন্দিগ্ধ মন সর্বত্র মন্দ দেখে, বিশ্বস্ত মন সর্বত্র ভালই দেখে। তোমরা কি কোন ঈর্ষাপরায়ণ মেয়ে দেখেছ? সে সকলকে সন্দেহ করে। হয়ত তার পতি ভাল লোক। পতি যাহাই করুক বা বলুক না কেন নিজের ঈর্ষা যে অমূলক নয় তা প্রমাণ করার জন্য কোন-না-কোন ছিদ্র বার করবে। ঝগড়াটে মানুষ ঝগড়া করবার অজুহাত কিছু না কিছু খুঁজে পায়। কিন্তু যে শান্তিপ্রিয় সে কাহারও সঙ্গে ঝগড়া করে না। আমি দেখি, এদেশের অনেক লোক কতকগুলো নির্দিষ্ট ধারণার বশবর্তী। তাদের যেসকল ধারণা আছে সেগুলো তাদের-দেখা সকল জিনিসের ওপর গিয়ে পড়ে। সে ধারণাগুলি তাহারা ছাড়তে পারে না! তাই দিয়েই তারা সকল বিষয় ব্যাখ্যা করে।

"কেউ কেউ আবার কেবল তর্ক করতে চায়। তারা ক্ষুদ্রবুদ্ধি। তারা অপরের দিকটা দেখতে পায় না, অথচ তর্ক করে। লজ্জাবতী লতার ন্যায় অত্যভিমানী লোকও এদেশে অসংখ্য। তারা নিজেদের মত-সমর্থনের জন্য ব্যস্ত। একটা কিছু কর্ম না করা হলে তারা মনে করবে তাদিকে আক্রমণ করা হল। এইভাবে আমরা মন্দকে প্রশ্রয় দিই। ফলে পরস্পরকে আমরা ভুল বুঝি। মন্দ মনোজগতে আছে, বহির্জগতে নাই! পরস্পরের ভাব যতই বুঝতে চেষ্টা করব ততই দোষদর্শন কমে যাবে।

"কিন্তু কে বুঝতে চায়? প্রত্যেকেই অহঙ্কার-কারাগৃহে আবদ্ধ। সেই কারাগার হতে আমরা জগৎকে দেখি ও বিচার করি। সর্বভূতে

ভগবদ্দর্শন ইহার একমাত্র প্রতিকার। শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলছেন, 'যে সর্বভূতে আমাকে এবং আমাতে সর্বভূতকে দেখে সেই শান্তি পায়।' সর্বভূতে ঈশ্বরদর্শন করলে দৃষ্টিপথ হতে মন্দ অন্তর্হিত হবে।"

একমাত্র ঈশ্বরের উপর নির্ভর করার ভাব হইতেই স্বামী তুরীয়ানন্দ সকল সংকল্প করার ঘোর বিরোধী ছিলেন। এই বিষয়েও তিনি প্রায় একই প্রকার ভাষা ব্যবহার করিতেন। তিনি বলিতেন, "তোমরা সংকল্প কর কেন? মতলব আঁট কেন? ভবিষ্যতের কথা এত ভাব কেন? মাকে সংকল্প করতে দাও। তাঁর সংকল্পসকল সহজে সত্য হয়। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত মানুষের সংকল্প সবই বৃথা। তিনি জানেন কি ঘটবে। তাঁর কাছে ভবিষ্যৎ একখানি খোলা পুস্তকের মত। বর্তমানে বাস কর, সময় ও সুযোগের সদ্ব্যবহার কর। ভবিষ্যতের কথা ভেব না। নিশ্চিত জেনো মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ হবেই। তাঁকে বিশ্বাস কর, তাঁর হাতে সব দাও। তাঁকে আন্তরিক-ভাবে ভালবাসতে চেষ্টা কর, দেহমন তাঁর চরণে অর্পণ কর, তোমাকে নিয়ে তিনি যা ইচ্ছা করুন।" আর এক সময় তিনি বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বরে বিশ্বাস করার অর্থ অলসতার প্রশ্রয় দেওয়া নয়। তাঁর ইচ্ছা জানবার চেষ্টা কর। তাঁর ইচ্ছা জেনে তা পূর্ণ করবার জন্য মানুষের মত সচেষ্ট হও। তোমরা কি দেখছ না যে, আমি কখন কুড়েমি করি না। মনকে কোন-না-কোন কাজে সদা ব্যাপৃত রাখ। যদি দৈহিক শ্রম না কর, মনকে অধ্যয়ন ধ্যান বা অন্য কোন চিন্তায় নিযুক্ত রাখ। বৃথা গল্প-গুজবে সময় নষ্ট ক'রো না। বাজে কথায় অনিষ্ট সৃষ্ট হয়। যদি কথা বলতে চাও ঈশ্বরের কথা বল।"

অপরোক্ষানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি-লিখিত পুস্তক পড়িতে স্বামী তুরীয়ানন্দ পরামর্শ দিতেন। একদিন আশ্রমের জনৈকা ছাত্রীকে 'নিউ থট' সম্বন্ধে

একটি বই পড়িতে দেখিয়া তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন, "মূল উৎসে যাও। যেসকল অনুভূতিহীন নির্বোধ ধর্মপ্রচার করতে চায় তাদের অগভীর চিন্তারাশি জেনে সময় নষ্ট ক'রো না। ধর্মসম্বন্ধে হাজার হাজার বই আছে। তুমি সেগুলি সব পড়তে পারবে না। সুতরাং শ্রেষ্ঠ পুস্তকগুলি বেছে নাও। যাদের ধর্মানুভূতি আছে, তারাই ধর্মসম্বন্ধে বলবার অধিকারী। নচেৎ 'অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ', দুজনেই পড়ে যায়, দুজনকেই দুঃখভাগী হতে হয়। খাঁটী গুরুরাই শিষ্যকে ঠিক পথে চালাতে পারেন। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষই প্রকৃত গুরু হতে পারেন।"

স্বামী তুরীয়ানন্দের শাসনও অসাধারণ ছিল। কচিৎ কোন ছাত্র বা ছাত্রীর কোন দোষ দেখিলে তাহাকে কঠোর সাধন অনুষ্ঠান করিতে দিতেন। অতি বাচাল একটি ছাত্রকে তিনি মৌনাবলম্বন করিতে আদেশ দিতেন, কাহাকেও উপবাস করিতে বা কাহারও সঙ্গে দেখা না করিয়া স্বীয় তাঁবুতে একাকী বাস করিতে বলিতেন। এইরূপে সাধনাগ্নি সদা আশ্রমে প্রজ্জ্বলিত থাকিত।

ধর্মজীবনগঠন ছিল শান্তি আশ্রমে স্বামী তুরীয়ানন্দের প্রধান কাজ। তিনি বলিতেন, "স্ব-স্বরূপ জান, সবল হও। বলিষ্ঠ, বিশুদ্ধ, অকপট ব্যক্তিরাই অনুভূতি লাভ করতে পারে। সদা স্মরণ কর যে তুমি আত্মা। এতে সবচেয়ে বেশী শক্তি ও সাহস পাবে। সাহসী হও, মায়ার বন্ধন ছিন্ন কর। সিংহতুল্য হও, মৃত্যু দেখেও কম্পিত হ'য়ো না। স্বামীজীর শিক্ষা—'আত্মামাত্রই অব্যক্ত ব্রহ্ম। অন্তরে সুপ্ত দেবত্বকে জাগ্রত কর। তা হলে অপরের মধ্যে দেবত্ব দেখতে পাবে।' যখন সূর্য মেঘে ঢাকে, তখন আমরা বলি সূর্য নাই। কিন্তু সূর্য সর্বদা রয়েছে। অজ্ঞানমেঘে আবৃত হয়ে আমরা নিজেদের দুর্বল

মনে করি। কিন্তু আত্মারবি সদা দেদীপ্যমান। অজ্ঞানমেঘ সরিয়ে ফেল, তখন তোমার হৃদয়ে আত্মা স্বমহিমায় প্রকাশিত হবে। যখন তুমি আত্মজ্ঞ হও তখনই তুমি ঠিক ঠিক মানুষ, নচেৎ পশু হতেও তুমি ঘৃণ্য।" "কিরূপে আত্মজ্ঞান লাভ করতে হয়?"—জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিলেন, "ধ্যানসহায়ে। সত্যের দ্বার উন্মুক্ত করবার চাবি হচ্ছে ধ্যান। ধ্যান কর, ধ্যান কর, ধ্যান কর; যখন আত্মার আলোকে মন উজ্জ্বল হয়, হৃদয়ে আত্মা উদিত হন। বাক্য দ্বারা নয়, অধ্যয়নের দ্বারা নয়, কিন্তু একমাত্র ধ্যানের দ্বারাই সত্য অনুভূত হয়।" শান্তি আশ্রমে প্রথমাবস্থায় সকলে নিরামিষাশী ছিলেন। আশ্রমে মাছমাংস আনা হইত না, সকলে অহিংসা অভ্যাস করিত। এমন কি বিষাক্ত সাপও মারা হইত না। একদা ধ্যানের সময় একটি পোকা স্বামী তুরীয়ানন্দের হাতে কামড়াইল। তিনি হাত নাড়িয়া পোকাটি ফেলিয়া দিলেন। তিনি এই বিষয়ে আর ভাবেন নাই। কি পোকা কামড়াইল তাহা দেখিবার জন্য চোখও খুলিলেন না। কিন্তু ঘণ্টাখানেক বাদে হাত ফুলিয়া গেল। তখন তিনি বলিলেন যে, তিনি কোন পোকার দংশনের জ্বালা অনুভব করিতেছেন। ফোলা বাড়িয়া চলিল, কিছুতেই কমান গেল না। পরদিন সমস্ত বাহুটি ফুলিয়া উঠিল। সকলে শঙ্কিত হইল, কি করা যায়? চল্লিশ মাইল দূরে থাকেন নিকটতম ডাক্তার। আশ্রমে মোটর ছিল না, দুই চাকার একটি গাড়ী ও একটি ঘোড়া ছিল। মোটর রোড আশ্রম পর্যন্ত ছিল না, পাহাড়ের উপর দিয়া মোটর গাড়ী আসিত না। অবিলম্বে কিছু বিধান করা দরকার, বিষ শরীরে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। ঈশ্বরের কৃপায় একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। সন্ধ্যায় এক ভদ্রলোক পদব্রজে আশ্রমে আসিলেন। তিনি

সমগ্র পথ—প্রায় চল্লিশ মাইল—হাঁটিতে হাঁটিতে পথ খুঁজিয়া খুঁজিয়া আশ্রমে আসিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, তিনি একজন ডাক্তার—তিন সহস্রাধিক মাইল দূর নিউইয়র্ক হইতে এই সঙ্কটময় সময়ে আশ্রমে উপস্থিত! তিনি আহত স্থানে অস্ত্রোপচার করিলেন এবং বলিলেন, বিলম্ব মারাত্মক হইত। তাঁহার কাছে পূতিগন্ধ-নিবারক, বিষনাশক কয়েকটি সামান্য ঔষধ ছিল। শীঘ্রই স্বামী তুরীয়ানন্দ বিপন্মুক্ত হইলেন। ইহা কি অদ্ভুত কাণ্ড নহে? জগন্মাতা তাঁহার সন্তানকে রক্ষা করিবার জন্য এই তরুণ চিকিৎসককে পাঠাইয়াছিলেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে শান্তি আশ্রমে যাঁহারা বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখনও তাঁহার কথা বলিতে আনন্দিত হন। স্বামী তুরীয়ানন্দ যখন শান্তি আশ্রমে ছিলেন, তখন তিনি পূর্ণবয়স্ক, উদ্যমশীল এবং কর্মঠ ছিলেন। পাশ্চাত্ত্যের কর্মপ্রবণ মনকে ধ্যাননিষ্ঠ করিবার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। সেই কার্যে তিনি তাঁহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, এমন কি স্বাস্থ্যরক্ষার কথাও ভুলিয়া যাইতেন। তিনি যেন ঈশ্বরাদিষ্ট হইয়াই আশ্রম-পরিচালনে ব্রতী ছিলেন। ঈশ্বরের হস্তে যন্ত্রস্বরূপ হওয়ায় তাঁহার মধ্য দিয়া আধ্যাত্মিক শক্তি প্রবাহিত হইয়া আশ্রম-বাসীদিগকে ধন্য করিত। এমন সাধুতা, এমন নিরভিমানিতা, এমন একনিষ্ঠতা কখনও বৃথা হয় না; ছাত্রগণ তাঁহার ডাকে সাড়া না দিয়া পারিল না। তাঁহার বিবেক-বৈরাগ্য, ভক্তি-বিশ্বাস সংক্রামক ছিল। আশ্রমবাসীদিগের চরিত্র পরিবর্তিত হইল, জীবন গঠিত হইল। ছাত্রদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা রূপান্তরিত হইয়া ধর্মসাধনায় পরিণত হইল। শান্তি আশ্রম তীর্থে পরিণত হইল।

নিউইয়র্ক, বোষ্টন, লস্ এঞ্জেলেস ও সানফ্রান্সিস্কোতে স্বামী তুরীয়ানন্দ সাধারণ বক্তৃতা দিয়াছিলেন। কিন্তু বক্তৃতাদান তিনি পছন্দ করিতেন না।

জনসাধারণের মধ্যে ভাবপ্রচারের জন্য ইহা আবশ্যক হইত। ক্লাশে এবং ব্যক্তিগত আলোচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। স্বামীজীর নির্দেশ অনুসারে তিনি নিজে আদর্শ জীবন যাপন করিয়া অপরকে উক্ত জীবন-যাপনে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দের মত সাধু তাহারা পূর্বে দেখে নাই। ইন্দ্রিয়ভোগাসক্ত, ধনসম্পদশালী, বৈজ্ঞানিক-উন্নতি-সম্পন্ন পাশ্চাত্ত্য সমাজ স্বামী তুরীয়ানন্দের ভাগবত জীবন দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলেন।

শান্তি আশ্রমে স্বামী তুরীয়ানন্দের যে সময়ানুবর্তিতা দেখা যাইত তাহা তাঁহার মজ্জাগত ছিল। কখনও তাঁহার জীবনে উহার ব্যতিক্রম দেখা যাইত না। আশ্রমের নির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুসারে তিনি এমন-ভাবে চলিতেন যে, তিনি কি কাজ করিতেছেন দেখিয়াই লোকে বুঝিতে পারিত, ঘড়িতে ক'টা বাজিয়াছে। যদি ঘড়িতে নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা অল্প বা অধিক সময় দেখা যাইত তাহা হইলে তাঁহারা মনে করিতেন, ঘড়িই ভুল। কারণ তিনি কখন নিদিষ্ট সময়ের পূর্বে বা পরে কাজ করেন না, ঠিক সময়ে যথাকর্তব্য করিয়া থাকেন। তাঁহার মতে সময়ানুবর্তিতা ব্যতীত অনেক সময় বৃথা নষ্ট হয় এবং জীবনের অনেক প্রয়োজনীয় কাজ করা যায় না।

শান্তি আশ্রমে নীরসতা প্রভৃতি শুষ্কভাব প্রবেশ করিত না। সরসতা ও স্বাধীনতা আশ্রমজীবনের বিশেষত্ব। তিনি ছাত্রছাত্রীদের সহিত রঙ্গ-রসিকতাদিও করিতেন। কালিফোর্ণিয়ার 'নিউ থট' (নবভাব)-পন্থী মিঃ পি— আশ্রমবাসী ছিলেন। তিনি খুব রসিক ও প্রফুল্ল ছিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ অন্তর্নিহিত দেবত্ব জাগ্রত করিবার কথা প্রায়ই বলিতেন। তিনি একদিন মিঃ পি—র কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পি—, কি করছ?" পি— তখন রন্ধনে ব্যাপৃত

ছিলেন। তিনি সহাস্যে অবিলম্বে উত্তর দিলেন, "স্বামীজী, আমার মধ্যে যে দেবত্ব আছে তাকে যদি প্রকাশ করতে না পারি, অন্ততঃ আমার মধ্যে যে পাচক আছে তাকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করি। কিন্তু সেটি করাও দেখ্‌ছি খুব শক্ত।" উভয়ে উচ্চহাস্য করিলেন।

শান্তি আশ্রমে একটি ঘোটকী ছিল। সে স্বাধীনভাবে চড়িয়া বেড়াইত, আবশ্যকমত তাহাকে বাঁধা হইত। কিন্তু তাহাকে ধরিয়া বাঁধা খুব কষ্টকর ছিল। ধরিতে গেলেই সে আশ্রমের ১৬০ একর ভূমিতে ছুটিয়া বেড়াইত। একদিন যখন তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করা হইল তখন সে এমন ছুটিল যে পি—প্রমুখ কয়েকজন তাহার পেছনে ছুটিয়া ছুটিয়া পরিশ্রান্ত ও ঘর্মাক্ত হইলেন। অবশেষে তাহাকে বাঁধিয়া তাঁহারা সানন্দে দলবদ্ধ হইয়া ফিরিতেছেন এমন সময়ে অপেক্ষাকারী স্বামী তুরীয়ানন্দকে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন। তখন পি— সানন্দে তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "স্বামীজী, ঘোটকী মুক্ত হতে চায়। কিন্তু আমরা তার গলায় দড়ি পরিয়ে দিয়েছি। এখন সে মায়াবদ্ধ!" মায়া শব্দের এই নূতন প্রয়োগে স্বামী তুরীয়ানন্দ আহ্লাদিত হইলেন। তিনি খুব হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, পি—, তুমি ঠিক বলেছ। আমরা ঘোটকীটিকে মায়াবদ্ধ করেছি, আর নিজেরা মায়ামুক্ত হ'তে চাই। সাবধান, ঘোটকীর ভাগ্য যেন তোমার না হয়। মায়ার বন্ধন কেটে মুক্ত হও।"

স্বামী তুরীয়ানন্দ শান্তি আশ্রমে ঐকান্তিকতার সহিত স্বীয় কর্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বিভিন্ন প্রকৃতির এবং বিভিন্ন ধারণার বশবর্তী ছাত্রগণকে সর্বদা ধর্মশিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার অত্যধিক মানসিক ক্লান্তি হইত। তাঁহার স্নায়ুমণ্ডলী দুর্বল এবং স্বাস্থ্য ভগ্ন

হইল। সকলে তাঁহার বায়ুপরিবর্তন ও বিশ্রামের আবশ্যকতা অনুভব করিলেন।

তাঁহার পরমপ্রিয় গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দকে আর একটিবার দেখিবার জন্য তিনি একাধিকবার আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় ও স্বামীজীর সহিত সাক্ষাতে তাঁহার স্বাস্থ্যলাভ হইবে এবং তিনি নবীন আগ্রহ ও উৎসাহ লইয়া প্রত্যাগমন করিবেন —এই আশায় ছাত্রগণ তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর পাথেয় দিবার ব্যবস্থা করিলে স্বামী তুরীয়ানন্দ উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। জাহাজে উঠিবার দিন নির্দিষ্ট হইল। শান্তি আশ্রমে অবশিষ্ট কয়েকদিন তিনি স্নায়বিক দুর্বলতায় পুনঃ পুনঃ ভুগিলেন। কিন্তু মাঝে মাঝে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থবোধ করিতেন, শক্তি ও আধ্যাত্মিক আবেগে পূর্ণ হইতেন। তখন তিনি অবিরাম ঠাকুর, স্বামীজী ও জগন্মাতার কথা বলিতেন। দৈহিক দুর্বলতা কখন তাঁহার মনকে তমসাচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। তিনি বহুবার গুরুদাস মহারাজকে বলিয়াছিলেন, "কেবলমাত্র আমার স্নায়ুগুলি ক্লান্ত। আমার মন পূর্ববৎ সবল ও সুস্থ আছে। আমি এখন বিশ্রাম চাই। স্বামীজীকে দেখে আমি ফিরে আসব।"

শান্তি আশ্রমে স্বামী তুরীয়ানন্দ ও গুরুদাস মহারাজ একটি ক্ষুদ্র কেবিনে থাকিতেন। গোধূলির পর এক সন্ধ্যায় গুরুদাস মহারাজ কেবিনে প্রবেশ করিতেই তাঁহাকে স্বামী তুরীয়ানন্দ সম্বন্ধ এক অলৌকিক দর্শনের কথা বলিলেন। উক্ত দর্শনে জগন্মাতা তৎসমীপে আসিয়া তাঁহাকে শান্তি আশ্রমে থাকিতে বলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ তাহাতে অস্বীকৃত হন। জগন্মাতা তাঁহাকে বলেন যে, তিনি আশ্রমে থাকিলে আশ্রমের দ্রুত উন্নতি হইবে এবং আশ্রমে অনেক সুন্দর সুন্দর গৃহ নির্মিত হইবে। তথাপি তুরীয়ানন্দজী অস্বীকার করেন।

শেষে জগদম্বা তাঁহাকে একটি শিয়োপশোভিত স্থান দেখান। স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "স্বামীজীকে দেখিবার জন্য আমি একবার ভারতে যাইবই।" ইহাতে জগদম্বা গম্ভীরবদনে অন্তর্হিতা হইলেন।[১]

উক্ত দর্শনে তুরীয়ানন্দজী দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন, "জগদম্বার আদেশ অগ্রাহ্য করে আমি ভুল করেছি! কিন্তু এখন আর উপায় নাই।" কয়েকদিন পরে তিনি শান্তি আশ্রম হইতে সানফ্রান্সিস্কো যাত্রা করিলেন। শান্তি আশ্রমে শেষ দিবস পূর্বাহ্ণে স্বামী তুরীয়ানন্দ গুরুদাস মহারাজকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। গুরুদাস মহারাজ তুরীয়ানন্দজীর জিনিসপত্রাদি বাঁধিতে ছিলেন। গুরুদাস মহারাজ কেবিনে ঢুকিয়া দেখিলেন, তুরীয়ানন্দজী মেজেতে পূর্ববৎ বসিয়া আছেন—প্রশান্তবদন। অঙ্গুলিসঞ্চালনে গুরুদাস মহারাজকে তৎসম্মুখে বসিতে নির্দেশ করিয়া অতি মিষ্টস্বরে বলিলেন, "গুরুদাস, তোমার জন্য আমি এই আশ্রমটি করেছি। এখানে শান্তিতে থাক।" কয়েক মুহূর্ত চিন্তামগ্ন নীরবতার পর আবার বলিলেন, "আর যারা জগন্মাতার সন্তানভাবে থাকতে চায় তাদের জন্যও এই আশ্রম। তোমার উপরই এই আশ্রমের পূর্ণ ভার রইল। তোমাকে আমি সব বলেছি। তোমার কাছে আমি কিছু গোপন করি নাই। আমার মনের গভীরতম চিন্তাগুলিও তোমার নিকট ব্যক্ত করেছি। তুমি দেখেছ, আমি এখানে কিভাবে জীবন যাপন করেছি। এখন সেইরূপে থাকবার চেষ্টা কর।"

"কিন্তু তাহা আমার পক্ষে অসম্ভব, স্বামীজী," গুরুদাস মহারাজ বলিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহার দিকে করুণদৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিলেন, "সব কিছুর জন্য মায়ের উপর নির্ভর কর। তাঁকে বিশ্বাস

১ 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় (জানুয়ারী, ১৯২৫) স্বামী অতুলানন্দের প্রবন্ধে উল্লিখিত।

কর, তিনিই তোমাকে চালনা করবেন। তিনি তোমাকে কখন বিপথে যেতে দেবেন না। আমি এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত। একটি বিষয় মনে রেখো, কারুর উপর প্রভুত্ব ক'রো না। সকলকে সমান চক্ষে দেখো, সকলের প্রতি সমান ব্যবহার ক'রো। কাউকে অধিকতর প্রিয় মনে ক'রো না। সকলের কথায় কর্ণপাত ক'রো, ন্যায়পথে চ'লো।" গুরুদাস মহারাজ বলিলেন, "স্বামীজী, আমি চেষ্টা করব। কিন্তু ইহা গুরু দায়িত্ব।" স্বামী তুরীয়ানন্দ ভর্ৎসনার স্বরে বলিলেন, "কেন তুমি দায়িত্ব বোধ করবে? একমাত্র মা-ই দায়ী। তুমি তাঁর কাজে আত্মোৎসর্গ করেছ। তোমার ভয় কি? কেবল সাধুতা আশ্রয় কর, মাকে সর্বদা স্মরণ কর।"

তারপর তিনি সুর করিয়া ওঁ, ওঁ, ওঁ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। সুরের সঙ্গে তাঁহার শরীরটি হেলিতে দুলিতে লাগিল! কয়েক মুহূর্ত পরে তিনি হঠাৎ থামিলেন এবং সোজা হইয়া জোরের সহিত বলিলেন, "ক্রোধ হিংসা ও গর্ব প্রভৃতি রিপু দমন কর। কারো পেছনে তার নিন্দা ক'রো না। সব বিষয় সরলভাবে সাক্ষাতে আলোচনা ক'রো। কোন কিছু করণীয় হ'লে তুমিই অগ্রণী হবে। তখন অন্যেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কাজে যোগ দেবে। তুমি প্রথমে না করলে কেউ করবে না। তুমি জান, এই জন্যই আমি এখানে সব রকম দৈহিক কাজও করেছি।" গুরুদাস মহারাজ বলিলেন, "ক্লাশগুলি সম্বন্ধে কি করা যাবে, স্বামীজী? আমি কী শিক্ষা দেব? আমি ত নিজে ছাত্রমাত্র।"

স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "তুমি এখনও বোঝ নি বাবা, আদর্শ জীবনযাপনই আসল কথা। জীবনই সৃষ্টি করে জীবন। সেবা কর, সেবা কর, সেবা কর—এই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। নম্র হও। সকলের সেবক হও। যিনি সেবা করতে প্রস্তুত, একমাত্র তিনিই শাসন করতে সমর্থ।

তুমি আমাদের কাছে বহু বৎসর বেদান্ত অধ্যয়ন করেছ। যা তুমি জান তাই শিক্ষা দাও। তুমি যেমন দেবে তেমনি পাবে।"

গুরুদাস মহারাজ ব্যথিতচিত্তে বলিলেন, "আপনি চলে গেলে আমাদের অবস্থা হবে রাখালহীন মেষপালের মত। স্বামী তুরীয়ানন্দ গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "আমি তোমাদের কাছে সূক্ষ্মদেহে থাকব।" গাড়ী আসিল। স্বামী তুরীয়ানন্দের যাত্রার সময় সমুপস্থিত। তিনি গুরুদাস মহারাজের মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "তুমি মায়ের এবং মা তোমার।" বিদায়কালে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় সজল হইল। তিনি নীরবে কেবিন ত্যাগ করিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। আশ্রমবাসিগণের নিকট সেই ক্ষুদ্র কেবিনটি শূন্য বোধ হইল। আশ্রমবাসিগণ তাঁহার অভাবে দুঃখভারাক্রান্ত হইলেন। কিন্তু ধ্যানাদির সময় তাঁহারা স্বামী তুরীয়ানন্দের অদৃশ্য উপস্থিতি অনুভব করিলেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দের প্রভাবে শান্তি আশ্রমের ছাত্রছাত্রীগণ আমেরিকায় থাকিয়াও এত হিন্দুভাবাপন্ন হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগকে হিন্দু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হিন্দুজীবনাদর্শ তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা বাহ্য উপায়ে ধর্মান্তরগ্রহণ নহে; ইহা দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন, আধ্যাত্মিক আদর্শে দীক্ষা, মানসিক পরিধির বিস্তার এবং ধর্মের ভিত্তিতে জীবন-প্রতিষ্ঠা। ভারতপরিদর্শনেও তাঁহাদের এই অভিজ্ঞতা, এই উদারতা, এই অন্তর্দৃষ্টি, এই নবজীবন-লাভ হইত না। চিরসুন্দর হিমালয় এবং পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর কথা স্বামী তুরীয়ানন্দ আশ্রমবাসীদের মাঝে মাঝে বলিতেন। তাই কেহ কেহ এই পুণ্যস্থানভ্রমণে আসিয়াছিলেন। কিন্তু কখনও তিনি স্থূল-বাহ্য সৌন্দর্যের কথা বলিতেন না। একদা তিনি বলিয়াছিলেন, "দেখ, আমি অন্তরের সৌন্দর্য দেখতে শিখেছি। যারা

বর্হিজগতে সৌন্দর্যের সন্ধান করে, তাদের মত আমার হৃদয়কে জড়বস্তুর সৌন্দর্য আকৃষ্ট করতে পারে না।”

শান্তি আশ্রমে অবস্থানকালে স্বামী তুরীয়ানন্দ সর্বদা উচ্চ ভাবভূমিতে মনকে তুলিয়া রাখিতেন। গভীর নিশীথে যখন আশ্রমবাসিগণ নিদ্রিত এবং জগতের কোলাহল নিস্তব্ধ, তখন তিনি স্বীয় তাঁবুতে ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ শান্তি আশ্রমে এত ভাবাবিষ্ট থাকিতেন যে, অস্থির চিত্ত লইয়া কেহ তাঁহার কাছে আসিলে তাহার চিত্ত স্থির শান্ত হইত। তিনি স্বামী বিমলানন্দকে মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রমে বলিয়াছিলেন, “শান্তি আশ্রমে অবস্থানকালে আমার মনে স্ত্রী-পুরুষের ভেদ ছিল না, সর্বদা আত্মস্থ থাকিতাম।” স্বামীজীও হরি মহারাজকে আমেরিকায় বলিয়াছিলেন লিঙ্গভেদ বিস্মৃত হইয়া আত্মভাবে আরূঢ় থাকিতে। তদনুযায়ী হরি মহারাজ সু-উচ্চ ভাবভূমিতে মনকে সদা আরূঢ় রাখিতেন।

শান্তি আশ্রম হইতে বিদায়কালে গুরুদাস মহারাজ স্বামী তুরীয়ানন্দকে নম্রভাবে বলিলেন, “স্বামীজী, আমি আপনাদের সঙ্গে এতকাল বাস করা সত্ত্বেও যেন কিছু শিখতে পারি নি।” তাঁহার গূঢ়ার্থপ্রকাশক উত্তর হইল, “বাবা, ভারতের যা শ্রেষ্ঠ সম্পদ তা আমি তোমাদের দিয়েছি মুক্তহস্তে। এই অমূল্য রত্ন সযত্নে রক্ষা কর।” ঈশ্বরলাভকে জীবনের উদ্দেশ্য করিতে স্বামী তুরীয়ানন্দ আশ্রমবাসিগণকে শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং উহার সুগম পথও তিনি তাহাদিগকে দেখাইয়াছিলেন। আশ্রম-ত্যাগের পূর্বে তিনি এই বিদায়বাণী দেন—“বর্তমানে আমার কাজ শেষ। আমি কিছু অসমাপ্ত রাখি নি। অবশিষ্ট মা জানেন। এই আশ্রম মায়ের স্থান। তিনি এই আশ্রমটি তোমাদের জন্য করেছেন। ইহার উৎকৃষ্ট ব্যবহার কর।”

শান্তি আশ্রম-প্রতিষ্ঠা আমেরিকায় স্বামী তুরীয়ানন্দের কার্যের শ্রেষ্ঠ সাফল্য। তাঁহার আধ্যাত্মিক উৎসাহ স্বাধীনভাবে ক্রিয়াশীল হইয়াছিল। পাশ্চাত্ত্য জীবনের প্রথাদি হইতে দূরে থাকিয়া তিনি আগ্রহান্বিত ছাত্রছাত্রীদের জীবনগঠনে ব্রতী হন। তাঁহার কর্মসফলতার অর্থ এই নয় যে, তিনি অনেক শিষ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহারা ধর্মলাভের জন্য তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের জীবন রূপান্তরিত হইয়াছিল। এই রূপান্তর অস্থায়ী নহে, তাহা পরবর্তী বৎসরগুলিতে প্রমাণিত হইয়াছে। দুই বৎসর অপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যে উক্ত সাফল্যলাভ আশ্চর্যজনক ও অভূতপূর্ব। স্বামী তুরীয়ানন্দ ভারতে প্রত্যাগমন করিবার বহু বৎসর পরে গুরুদাস মহারাজ উক্ত ছাত্রছাত্রীদের সহিত সাক্ষাৎকালে সকলের মুখে শুনিয়াছিলেন যে, হরি মহারাজের তথায় অবস্থানকাল তাঁহাদের জীবনের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। এই কারণে তাঁহাদের নিকট এখনও শান্তি আশ্রম প্রিয় ও পুণ্যস্থান। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি যেমন মাঝে মাঝে তীর্থে গমন করেন, সেইসকল ব্যক্তিও সেইরূপ সুবিধা পাইলেই শান্তি আশ্রমে যাইয়া থাকেন। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের পুণ্যস্মৃতি তাঁহাদের হৃদয়ে এখনও অমূল্য সম্পদরূপে রক্ষিত।

আশ্রমবাসিগণের অনেকে দেহরক্ষা করিয়াছেন। স্বর্গতদের মধ্যে শঙ্করী অন্যতমা। সান্‌ফ্রান্সিস্কো উপসাগরের পারে আলমেদা শহরে 'হোম অব টুথে'র জনৈকা সভ্যা, অবিবাহিতা তরুণী ছিলেন শঙ্করী। ক্রীশ্চান সায়েন্সের এক শাখা 'হোম অব টুথ'। তাঁহাদের অন্যতম বিশ্বাস এই যে, প্রত্যেক রোগের কারণ চরিত্রগত কোন দোষ। রোগটি জানিলে চারিত্রিক দোষেরও সন্ধান করা যায়। ক্রোধ, হিংসা, লোভ, দ্বেষ প্রভৃতি দোষ অনুরূপ রোগ সৃষ্টি করে। উক্ত নৈতিক রোগ সংশোধন করিলেই

রোগ সারিয়া যায়। স্বামী বিবেকানন্দ কয়েক সপ্তাহের জন্য 'হোম অব ট্রুথে' অতিথি ছিলেন। তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানে গভীর প্রভাব বিস্তার করেন এবং উহার অনেক আচার্য তাঁহার পদানুগ হইয়াছিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ যখন কালিফোর্ণিয়ায় গেলেন তখন 'হোম অব ট্রুথের' সভ্যগণ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হন এবং তন্মধ্যে যাঁহারা তাঁহার কাছে শান্তি আশ্রমে গিয়াছিলেন শঙ্করী তাঁহাদের অন্যতমা। তিনি গুরুদাস মহারাজকে প্রায়ই বলিতেন যে, স্বামীজী বেদান্ত দ্বারা হোমের সভ্যগণকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্বামীজী বেদান্ততত্ত্বের আলোচনা করিতেন এবং শ্রোতৃবর্গ তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রবাহে বিঘ্নোৎপাদন করিবার ভয়ে গাত্রোত্থান করিতেও সাহসী হইতেন না। রুদ্ধনিঃশ্বাসে তাঁহারা তন্ময় হইয়া তাঁহার কথা শুনিতেন। স্বামীজীর বাগ্মিতা ও প্রেরণা তাঁহাদিগকে এক উচ্চলোকে লইয়া যাইত। স্বামীজীর প্রসঙ্গ সমাপ্ত হইলে তাঁহারা যেন পার্থিব জগতে ফিরিয়া আসিতেন। স্বামীজী একদিন প্রাতে তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা বিষাক্ত সর্প কর্তৃক দষ্ট হইয়াছ। বিষের ক্রিয়া অনিবার্য। তোমাদের জীবনে রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী, ঠাকুর তোমাদিগকে কৃপা করিয়াছেন।" যাঁহারা 'সর্পদষ্ট' হইয়াছিলেন তাঁহারা আর পূর্ব প্রতিষ্ঠানে ফিরিয়া যাইতে পারিলেন না। বেদান্তের ঔদার্য ও মাধুর্য তাঁহাদিগের দৃষ্টি এত বিস্তৃত করিয়া দিয়াছিল যে, 'হোম অব ট্রুথ' তাঁহাদের নিকট অতি সঙ্কীর্ণ মনে হইল, তাঁহারা উন্মুক্ততর বায়ুসেবনে ব্যগ্র হইলেন। শান্তি আশ্রমে তাঁহাদের সে সুযোগলাভ হইল। তথায় তাঁহারা এমন এক পুরুষের সঙ্গ পাইলেন যাঁহার জীবনে স্বামীজীর বাণী মূর্ত হইয়াছিল। তাঁহার পরিচালনায় স্বামীজীর বাণী স্ব স্ব জীবনে রূপায়িত করিবার সুযোগ পাইলেন। শঙ্করী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। তাঁহার অনুরাগ অতুলনীয়।

স্বামী তুরীয়ানন্দ ভারতে ফিরিবার কয়েক বৎসর পরে শঙ্করী এক কঠিন রোগে আক্রান্তা হন। সাহস ও ধৈর্যের সহিত তিনি শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করিলেন। নীরবে তিনি সকল কষ্ট সহ্য করিলেন, অভিযোগ-সূচক একটি বাক্যও তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইল না। প্রিয় বন্ধুবান্ধবীগণ তাঁহার অন্তিমকাল আসন্ন দেখিয়া পরম প্রীতির সহিত তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিলেন। একদিন তাঁহার প্রিয়া বান্ধবীকে ডাকিয়া বলিলেন, "মীরা, ঠাকুর আমাকে ডাকছেন। তুমি কি তাঁর নাম আমার কর্ণে উচ্চারণ করবে?" মীরা শঙ্করীর শয্যাপার্শ্বে সমগ্র দিবস এবং পরবর্ত্তী রাত্রি রহিলেন। পালা করিয়া উভয়ে ঠাকুরের নাম জপ করিতে লাগিলেন। শঙ্করীর স্বর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইল। মীরা বলিলেন, "প্রিয়ে, তুমি আর কষ্ট করে উচ্চারণ কর না। আমিই তোমাকে ঠাকুরের নাম শুনাইতে থাকি।" মৃদুহাস্যে শঙ্করী তাহাতে সম্মতি জানাইলেন। পরদিন প্রত্যূষে রোগিণী খুব দুর্বল হইলেন। তিনি একটু মাথা নাড়িয়া মীরার দিকে তাকাইলেন। অনুচ্চস্বরে উচ্চারিত হইল 'রামকৃষ্ণ'। ঠাকুরের নামোচ্চারণের সঙ্গেসঙ্গেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। পাঞ্চভৌতিক দেহ পড়িয়া রহিল, আত্মা মুক্ত হইয়া গুরুপদে বিলীন হইল, ঠাকুর তাঁহার শরণাগত ভক্তকে পদতলে স্থান দিলেন।

শান্তি আশ্রমে স্বামী তুরীয়ানন্দ যেসকল ভক্তের জীবনে রূপান্তর আনিয়াছিলেন, তাঁহাদের একটি উদাহরণ এখানে উল্লিখিত হইল। পূর্বানুসৃত সঙ্কীর্ণ ধর্মমত ও ধর্মসাধনা ত্যাগ করিয়া তাঁহারা স্বামী তুরীয়ানন্দের প্রভাবে প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার আস্বাদ পাইয়াছিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দের প্রভাব ব্যতীত উক্ত রূপান্তর সম্ভব হইত কিনা কে জানে? স্বামী তুরীয়ানন্দ ১৯০২ খ্রীঃ ২২শে মে স্বামী বিবেকানন্দের

এক পত্র পাইলেন এবং ৩রা জুন সান্‌ফ্রান্সিস্কো শহর হইতে ভারত-প্রত্যাগমনার্থ জাহাজে উঠিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের দেহরক্ষার দশ দিন পর ১৪ই জুলাই তিনি বেলুড় মঠে উপস্থিত হইলেন।

সান্‌ফ্রান্সিস্কোতে বেদান্ত সমিতি এবং উক্ত শহর হইতে প্রায় একশত মাইল দূরবর্ত্তী শান্তি আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতারূপে স্বামী তুরীয়ানন্দ আমেরিকায় চিরস্মরণীয়। আমেরিকায় তিনি যতদিন ছিলেন ততদিন সদা দিব্যভাবে আরূঢ় এবং জগন্মাতার হস্তে যন্ত্রস্বরূপ ছিলেন। ভারতে ফিরিয়া তিনি আমেরিকার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কথাপ্রসঙ্গে প্রকাশ করিয়াছিলেন, "আমি প্রত্যক্ষ অনুভব করতাম, মা আমাকে প্রত্যেক পদক্ষেপে চালিত করছেন।" ভাগবত ইঙ্গিতে তিনি চালিত হইয়াছিলেন বলিয়াই আমেরিকায় তাঁহার বেদান্তপ্রচার এত সাফল্যমণ্ডিত ও সুদূরপ্রসারী হইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়

স্বামীজীর অদর্শনে

শান্তি আশ্রম প্রতিষ্ঠার্থ স্বামী তুরীয়ানন্দকে যে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল তাঁহার ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া গেল। আশ্রমের ছাত্রছাত্রীগণ স্বামী বিবেকানন্দকে বেলুড় মঠে এই সংবাদ বারবার জানাইলেন। স্বামীজী কুমারী ম্যাকলিয়ডকে ডাকিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দকে তার করিতে বলিলেন ভারতে আসিবার জন্য। কিন্তু স্বামীজীর নির্দেশ যথাযথ বুঝিতে না পারিয়া ম্যাকলিয়ড কেব্‌ল (cable) না করিয়া তুরীয়ানন্দজীকে চিঠি লিখিলেন। সেই চিঠি ১৯০২ খ্রীঃ ২২শে মে হরি মহারাজের হস্তগত হইল। এইজন্য ভারতে আসিয়া পৌছিতে স্বামী তুরীয়ানন্দের কিছু বিলম্ব হইল। তিনি স্বামীজীকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি রেঙ্গুনে আসিয়া স্বামীজীর দেহত্যাগের সংবাদ শুনিলেন। এই দুঃসংবাদ শুনিয়া তিনি বজ্রাহতবৎ মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন। কিছুক্ষণ পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া উঠিলেন এবং রেঙ্গুনাগত যাত্রীর হাতে খবরের-কাগজে এই সংবাদ পড়িলেন। রেঙ্গুন হইতে কলিকাতা আসিবার জন্য যেদিন জাহাজে উঠিলেন সেইদিন এই সংবাদ পাইলেন।

জাহাজে তুরীয়ানন্দজীর মন প্রিয় গুরুভ্রাতার অদর্শনে অতিশয় বিষণ্ণ হইল; আহার-নিদ্রাও তাঁহার ভাল লাগিল না। পুনরায় আমেরিকা ফিরিয়া কাজ করিবার সকল উৎসাহ তিনি হারাইলেন। আমেরিকা হইতে আনীত দামী পোশাক-পরিচ্ছদ ও একটি মূল্যবান ঘড়িও তিনি ভগ্নহৃদয়ে গঙ্গাগর্ভে ফেলিয়া দিলেন। তিন দিন পর

জাহাজ কলিকাতায় আসিল। জাহাজ-ঘাটে স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণ উপস্থিত ছিলেন। হরি মহারাজ শরৎ মহারাজকে দেখিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া খুব কাঁদিলেন। তাঁহাদের কান্না দেখিয়া তথায় লোক জমা হইয়া গেল। কান্না থামাইয়া কোনরকমে হরি মহারাজ মঠে আসিলেন এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ প্রভৃতি গুরুভ্রাতাদের পূত সঙ্গে কিছুদিন কাটাইলেন। বেলুড় মঠে গুরুভ্রাতৃ-শোকে তিনি খুব মুহ্যমান রহিলেন। একদিন হঠাৎ ভাগবতের এই শ্লোকটি তাঁহার মনে পড়িল—

দুর্ভগো বতো লোকোঽয়ং যদবো নিতরামপি।[১]
যে সংবসন্তো ন বিদুর্হরিং মীনা ইবোড়ুপম্॥ ৩।২।৮

উক্ত শ্লোকের ভাবার্থ চিন্তা করিয়া তিনি বুঝিলেন, "আমরাও স্বামীজীকে খুব কাছে পেয়ে 'আমাদের স্বামীজী' বলে আমরা তাঁকে ধরে রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি যে কোন ঊর্ধ্ব লোকের অধিবাসী সে খেয়াল আমাদের ছিল না। তাই বিয়োগকাতর হয়ে পড়েছিলাম। তিনি যে কয়দিনের জন্য এসে আমাদের কাছে ধরা দিয়ে 'আপনার জন' হয়েছিলেন তাতেই আমরা ধন্য।" যতদিন তিনি বেলুড় মঠে ছিলেন প্রায়ই তিনি স্বামীজীর কথা আবেগভরে বলিতেন এবং সাধুব্রহ্মচারীদের লইয়া ধ্যানধারণাদি করিতেন।

১—উদ্ধব বিদুরকে বলিতেছেন, "আহা! এই নরলোক অতিশয় ভাগ্যহীন। কিন্তু যদুগণ সর্বাপেক্ষা ভাগ্যহীন। কারণ তাঁহারা কৃষ্ণের সহিত একত্র বাস করিয়াও তাঁহাকে হরি বলিয়া জানিতে পারেন নাই। মৎস্যগণ সমুদ্রে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রকে কোন কমনীয় জলচর মনে করে, অমৃতময় বলিয়া চিনিতে অক্ষম।"

বৃন্দাবনে

স্বামীজীর অদর্শনে মর্মাহত হইয়া হরি মহারাজ কয়েক বৎসর তপস্থায় অতিবাহিত করেন। বেলুড় মঠে অল্পকাল থাকিয়াই তিনি তপস্থার্থ শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করেন। তিন বৎসর ভোগবিলাসভূমি মার্কিনদেশে অবস্থান সত্ত্বেও তাঁহার স্বভাব আদৌ পরিবর্তিত হয় নাই। তিনি আমেরিকা যাইবার পূর্বে দ্বাদশ বৎসর যেভাবে ছিলেন সেভাবে বাকী জীবন কাটাইতে মনঃস্থ করিলেন। তিনি যখন বৃন্দাবনে গেলেন তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দ কৃষ্ণলাল মহারাজকে তাঁহার সেবকরূপে পাঠাইলেন। ব্রহ্মানন্দজী কৃষ্ণলাল মহারাজকে বলিয়া দিলেন, "তুমি হরি মহারাজের সঙ্গে থেকো ও সেবা করো।" সেইজন্য কৃষ্ণলাল মহারাজ প্রায় তিন বৎসর হরি মহারাজের সঙ্গে বৃন্দাবনে থাকেন ও তাঁহার সেবা করেন। তিনি বৃন্দাবনে যাইয়া কিছুদিন হরি মহারাজের জন্য রান্না করিয়াছিলেন। একদিন হরি মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন, "আমি মাধুকরী করে খাব। আমার জন্য আর রান্না করো না।" সেদিন হইতে তিনি সেবকের রান্না না খাইয়া মাধুকরী ভিক্ষায় উদরপূর্তি করিতে লাগিলেন। সেবক নিরুপায় হইয়া বেলুড় মঠে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে এই খবর লিখিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ সেবক কৃষ্ণলাল মহারাজ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "সে আমার খুব সেবা করেছিল। তবে তার খুব বামনাই (ব্রাহ্মণত্বের অভিমান) ছিল। কারণ সে ব্রাহ্মণসন্তান। ক্রমে ক্রমে তার সে ভাব কেটে গেল। সে রান্না করে আমাকে খাওয়াত এবং অন্যভাবেও সেবা করত। আমি খুব তাকে বকতুম ও ধম্‌কাতুম। সে সব সহ্য করত। শেষে

যখন আমার অসুখ হল, মহারাজ ডাকা সত্ত্বেও সে আমাকে ছেড়ে গেল না।”

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে স্বামী ব্রহ্মানন্দ হরিদ্বার হইতে বৃন্দাবন যাইয়া হরি মহারাজের সঙ্গে প্রায় দুই মাস থাকেন। দুই গুরুভ্রাতা পূর্বে এই তীর্থে তপস্যারত ছিলেন। তাই উভয়ে একত্রিত হওয়ায় পূর্ব স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। হাওড়ার অন্তর্গত রামকৃষ্ণপুর-নিবাসী শ্রীনবগোপাল ঘোষ তখন বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে স্ত্রীপুত্রাদির সহিত তীর্থবাস করিতেছিলেন। তাঁহার পুত্র নীরদ (যিনি পরে বেলুড় মঠে স্বামী অম্বিকানন্দ নামে পরিচিত হন) প্রায়ই তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে আসিত। পূর্ব পরিচয়নিমিত্ত তিনি হরি মহারাজের কাছে বসিয়া তাঁহার সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেন। মহারাজের গম্ভীর মূর্তি দেখিয়া তিনি তাঁহার কাছে যাইতে সাহসী হইতেন না, তাঁহার দরজার কাছে প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া হরি মহারাজ একদিন তাঁহাকে বলিলেন, “কিরে, তুই ভিতরে গিয়ে মহারাজের পাদস্পর্শ করে প্রণাম কর। বাহির থেকে ওরকম করে চলে আসিস্ কেন?” হরি মহারাজের আদেশে তরুণ নীরদ সভয়ে মহারাজের কাছে যাইয়া প্রণাম করিতেই তিনি সস্নেহে তাঁহাকে আদর করিলেন। পরদিন হইতেই তিনি মহারাজের কাছে যাইয়া বসিতেন ও আলাপ করিতেন। হরি মহারাজের কাছে তাঁহার যাওয়া পূর্বাপেক্ষা কমিয়া গেল। ইহা দেখিয়া মহারাজ একদিন হাসিতে হাসিতে স্বামী তুরীয়ানন্দকে বলিলেন, “আপনার চেলা যে বিগড়ে গেল!” হরি মহারাজ সহাস্যে উত্তর দিলেন, “ওর ভাগ্য ভাল।”

স্বামী তুরীয়ানন্দ বৃন্দাবনে রোজ ভাগবত পাঠ করিতেন। তাঁহার পাঠ শুনিতে দুইটি বাঙ্গালী বৈষ্ণব সাধু নিয়মিতভাবে আসিতেন।

হরি মহারাজের ভাগবত-ব্যাখ্যা তাঁহাদের বেশ ভাল লাগিত। পরস্পরের মধ্যে গভীর প্রীতি হইয়াছিল। বৈষ্ণব সাধুদ্বয় একত্রে বাস করিতেন, কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রায়ই ভীষণ ঝগড়া হইত। এত ঝগড়া হওয়া সত্ত্বেও একজন অপরকে ছাড়িয়া যাইতেন না। একদিন হরি মহারাজ তাঁহাদের ঝগড়া শুনিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "আপনাদের মধ্যে যখন এত ঝগড়া হয় তখন আলাদা থাকাই ভাল। একসঙ্গে থেকে ঝগড়া করার প্রয়োজন কি?" এই কথা শুনিয়া বৈষ্ণব সাধুগণ আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "আপনার মুখে একথা শুনব ভাবি নি। আপনি এতবড় সাধু হয়ে সাধুসঙ্গ ছাড়তে বলছেন কিরূপে? আমরা ঝগড়া করতে পারি, কিন্তু সাধুসঙ্গ ছাড়ি কেন? যদি সাধুসঙ্গ ছাড়ি, কি নিয়ে থাকব?" বৈষ্ণব সাধুদের কথায় হরি মহারাজ খুব সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহাদের প্রতি তাঁহার প্রীতি ও শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়া উঠিল এবং ভাগবতপাঠও অধিকতর জমিয়া গেল।

স্বামী তুরীয়ানন্দ খুব সত্যপ্রিয় ও স্পষ্টবাদী সাধু ছিলেন। কাহারও দোষত্রুটি দেখিলে তাহা স্পষ্ট কথায় বলিয়া ফেলিতেন। কিন্তু তাঁহার স্পষ্ট কথা শুনিয়া অনেকেই মনঃক্ষুন্ন হইতেন। কিন্তু ভাগবতের নিম্নোক্ত শ্লোকটি টীকাসমেত পড়িয়া তিনি এই অভ্যাস ছাড়িবার চেষ্টা করেন এবং অচিরে কৃতকার্য্য হন—

পরস্বভাবকর্মাণি ন প্রশংসেৎ ন গর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥

—সারা বিশ্বে (উপাদান ও নিমিত্ত-কারণরূপে) এক পরমাত্মাকে দেখিয়া অপরের চরিত্র ও কর্মাবলীর প্রশংসা বা নিন্দা করিবে না। উক্ত শ্লোকের টীকাতে আছে, "যদি দাঁত হঠাৎ জিহ্বার উপর জোরে



পড়িয়া জিহ্বাকে জোরে কাটিয়া দেয় তাহা হইলে কি লোকে পাথরের নুড়ি দিয়া দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলে? তাহা কেহ কখনও করে না। কারণ দাঁত যাহার, জিহ্বাও তাহারই। যখন এক পরমাত্মা আমার এবং অন্য সকলের মধ্যে বিরাজিত তখন অপরের দোষদর্শন বা নিন্দাবাদ অনুচিত।"

উত্তরকাশীতে

অসুখ সারিলে বৃন্দাবন হইতে স্বামী তুরীয়ানন্দ মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে স্বামী স্বরূপানন্দের নিকট চলিয়া যান এবং কৃষ্ণলাল মহারাজ বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসেন। হরি মহারাজ ১৯০৫ খ্রীঃ মায়াবতী যান এবং উক্ত বৎসর নভেম্বর মাসে আলমোড়া ও নৈনিতাল হইয়া কনখলে আসেন। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া পুনরায় উত্তরাখণ্ডে যাইয়া তপস্যা করেন। ১৯০৬ খ্রীঃ মার্চ মাসে তিনি হৃষীকেশে ছিলেন। ইহার পরে টিহিরীতে স্বামী বিজ্ঞানানন্দের সহিত একমাস অবস্থান করেন। বিজ্ঞানানন্দজী টিহিরীর রাজগুরু, শাস্ত্রজ্ঞ, তপস্বী ও বৈরাগ্যবান সাধু ছিলেন। পূর্বে টিহিরীতে অবস্থানকালে তাঁহার সহিত হরি মহারাজ পরিচিত হন। ইনি উত্তরকাশীর বিখ্যাত সাধু দেবীগিরির বিদ্যাগুরু। হরি মহারাজ বিজ্ঞানানন্দজীর নিকট দেবীগিরির নাম শুনেন এবং উত্তরকাশীতে যাইয়া তাঁহার সহিত পরিচিত হন। সেইবার উত্তরকাশীতে হরি মহারাজ কেদারঘাটস্থ ধর্মশালার একটি ছোট কুঠীতে মাসখানেক ছিলেন। তখন উত্তরকাশীতে খুব বরফ পড়িত এবং অসহ্য শীত হইত। সেইজন্য খুব কম

সাধুই শীতকালে তথায় থাকিতে সাহস করিতেন। তজ্জন্য উত্তর কাশীতে শীতকালে সাধুর সংখ্যা অতি অল্পই হইত। দেবীগিরিজী শীতকালে নীচে নামিয়া আসিতেন এবং আসিবার পূর্বে নিঃসম্বল কপর্দকহীন সাধুদের শীতের কয়েক মাসের উপযোগী প্রয়োজনীয় আহার্যের ব্যবস্থা করিতেন। সাধুসেবার জন্য তাঁহার নিকট কিছু অর্থাগম হইত।

দেবীগিরিজী বলেন, "কেদারঘাটের ধর্মশালাতে যাইয়া এক দিব্য জ্যোতির্ময় তেজঃপুঞ্জ মূর্তির সহিত আমার সাক্ষাৎকার হইল। ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশ হইতে উত্তরকাশীতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু-মহাত্মাদের সমাগম হইয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ অলৌকিক তেজঃসম্পন্ন সাধুর দর্শন অত্যন্ত দুর্লভ। আমি তাঁহার নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম। কিন্তু তিনি কোনপ্রকার সহায়তা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া বসিলেন। অবশেষে আমি অতি কাতরভাবে নিবেদন করিলাম, 'আপনি শীতকালে প্রথম উত্তরাখণ্ডে বাস করিতেছেন। তাই এই তপোভূমির পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সমধিক পরিচিত নহেন। এই কঠোর ভূমিতে শীতকালে বাস করিতে হইলে কিছু-না-কিছু আহার্য রাখার প্রয়োজন হয়। আপনি কৃপাপূর্বক কিছু গ্রহণ করুন।' আমার একান্ত অনুরোধে তিনি শেষে সেই দুই-তিন মাসের উপযোগী চাল ডাল ও আটাদি লইতে সম্মত হইলেন। এইরূপে এক মহাপুরুষের সহিত আমার পরিচয় ও সৌহার্দ্য হইয়াছিল। আমি সেই তপোনিষ্ঠ দিব্য মূর্তিকে কখনো ভুলিতে পারিব না। পরে জানিতে পারিলাম, এই মহাপুরুষের নাম স্বামী তুরীয়ানন্দ।"

উত্তরকাশীতে উজলী গ্রামে দেবীগিরিজীর যে আশ্রম আছে তথায় স্বামী তুরীয়ানন্দ কিছুদিন তপস্যা করেন। তখন তিনি একখানি মলমলের চাদর ও কৌপীনমাত্র ব্যবহার করিতেন, দ্বিতীয় বস্ত্র রাখিতেন

না। দেবীগিরিজী তাঁহার কম্বলমাত্র বিছানার নীচে পল বিছাইয়া দিতে চাওয়ায় তিনি আপত্তি করেন নাই। হরি মহারাজ তথায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র তিন ছটাক চাউলের ভাত ও দেড় পোয়া দুধ খাইতেন। দেবীগিরিজী তাঁহার সেবার্থ একটি চাকর নিযুক্ত করেন এবং তাঁহার সর্বপ্রকার অভাবপূরণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তখন হরি মহারাজ সর্বদা পদ্মাসনে জ্ঞানমুদ্রা করিয়া বসিয়া থাকিতেন এবং খুব কম কথা বলিতেন। তিনি রাত্রে তিনটার সময় উঠিয়া শৌচাদি-সমাপনান্তে জপধ্যানে বসিতেন এবং বেলা প্রায় ১১।১২টার সময় উঠিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া উপরোক্ত আহার করিতেন। দেবীগিরিজীর সঙ্গে গৌড়পাদের অজাতবাদ সম্বন্ধে প্রায়ই তাঁহার আলোচনা হইত। মাণ্ডূক্য উপনিষদের নিম্নোক্ত গৌড়পাদ-কারিকাটি তাঁহার মুখে তথায় প্রায়ই শোনা যাইত—

ন নিরোধঃ ন চোৎপত্তিঃ ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্তঃ ইত্যেষা পরমার্থতা ॥[১]

আলোচনার কালেও তিনি পদ্মাসনে বসিয়া 'সমকায়শিরোগ্রীব' হইয়া জ্ঞানমুদ্রা ধরিয়া থাকিতেন। দেবীগিরিজী বলেন, "তাঁহার কথা বেশী কি বলিব? তাঁহার মত বেদান্তবেত্তা ব্রহ্মনিষ্ঠ সন্ন্যাসী অতি বিরল দেখা যায়। তিনি তত্ত্বজ্ঞ ও সর্বপ্রকারে পূজ্য ছিলেন।" নয় মাস উত্তর-কাশীতে তপস্যান্তে স্বামী তুরীয়ানন্দ বদরীনাথ ও কেদারনাথের দিকে যাত্রা করেন। তখন দেবীগিরিজীর অনুরোধে একখানি লুই চাদর গায়ে দিয়া যান। উক্ত তীর্থদ্বয়দর্শনান্তে তিনি সম্ভবতঃ আলমোড়ায় আসেন।

১—আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই। কেহ সাধক বা বদ্ধ নহে। কেহ মুমুক্ষু নহে, কেহ মুক্ত নহে। ইহাই পরমার্থদৃষ্টি।

কুরুক্ষেত্রে*

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের সূর্যগ্রহণের সময় স্বামী তুরীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী গুরুদাসের সহিত কুরুক্ষেত্রে গমন করেন। সেবার কুরুক্ষেত্রের মেলায় প্রায় অর্ধ লক্ষ যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। সন্ধ্যার সময় তিনি ট্রেন হইতে নামিয়া দেখিলেন, স্থানীয় ধর্মশালাগুলি নরনারীতে পরিপূর্ণ। অস্থায়ী যেসকল তাঁবু ও ছাউনী করা হইয়াছিল সেগুলিতেও তিলধারণের স্থান ছিল না। অগত্যা তাঁহারা দুই জন একটি বৃহৎ বটবৃক্ষের তলায় কম্বল পাতিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। সাধুদ্বয়ের মুখমণ্ডল শ্রান্ত, ক্লান্ত ও শুষ্ক দেখিয়া জনৈকা ভক্তিমতী নারী তাঁহাদের নিকটে আসিয়া করজোড়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনারা কিছু খেয়েছেন কি?' সাধুদ্বয় অনাহারে আছেন জানিয়া মহিলাটি দ্রুতপদে তাঁহার আস্তানা হইতে আটার রুটি কয়েকখানি, একটু দুধ ও তরকারী আনিলেন। সাধুদ্বয় আনীত আহার্য সানন্দে ভক্ষণপূর্বক স্ব স্ব পুঁটুলি মাথায় দিয়া গাছের তলায়ই ঘুমাইয়া পড়িলেন।

রাত্রি একপ্রহর অতীত হইলে স্বামী তুরীয়ানন্দ উঠিয়া বসিলেন। গুরুদাস মহারাজ একটু পূর্বে উঠিয়া নক্ষত্রখচিত নৈশাকাশের দিকে বিস্মিত নয়নে তাকাইতেছিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ উঠিয়া বসিতেই গুরুদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে, মহারাজ?" হরি মহারাজ বলিলেন, "গুরুদাস, এখন তুমি প্রকৃত সন্ন্যাসী।" গুরুদাস উত্তর দিলেন,

* 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় (ফেব্রুয়ারী, ১৯২৫) প্রকাশিত স্বামী অতুলানন্দজীর প্রবন্ধ হইতে সংকলিত এবং 'উদ্বোধন' পত্রিকায় ১৩৫৫ কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত।

"মহারাজ, তাই ত আমি হতে চাই।" এই বলিয়া তিনি স্বামী বিবেকানন্দের 'সন্ন্যাসীর গীতি' হইতে নিম্নলিখিত অংশটি আবৃত্তি করিলেন—

স্থখতরে গৃহ করো না নির্মাণ।
কোন্ গৃহ তোমা ধরে হে ধীমান॥
গৃহছাদ তব অনন্ত আকাশ।
শয়ন তোমার স্থবিস্তৃত ঘাস॥
দৈববশে প্রাপ্ত যাহা তুমি হও।
সেই খাদ্যে তুমি পরিতৃপ্ত রও॥
হউক কুৎসিত কিংবা স্থরন্ধিত।
ভুঞ্জহ সকলি হয়ে অবিকৃত॥
শুদ্ধ আত্মা যেই জানে আপনারে।
কোন্ খাদ্য পেয় অপবিত্র করে।
হও তুমি চল-স্রোতস্বতী মত।
স্বাধীন উন্মুক্ত নিত্য প্রবাহিত॥
উঠাও সন্ন্যাসী, উঠাও সে তান।
গাও গাও গাও এই গান॥

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

স্বামী তুরীয়ানন্দ ইহা শুনিয়া সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক ঠিক। আমরা জগন্মাতার সন্তান। আমাদের ভয় কি? তিনিই দেন এবং তিনিই নেন। তাঁর নাম জয়যুক্ত হোক।" তারপর তিনি স্বামী বিবেকানন্দের মাহাত্ম্য-কীর্তনোদ্দেশ্যে বলিলেন, "তিনি ছিলেন প্রকৃত সন্ন্যাসী। ঐশ্বর্যে ও দারিদ্র্যে তিনি সমান থাকতেন। তিনি জানতেন, তিনি সাক্ষিস্বরূপ নিত্যমুক্ত আত্মা। স্থখ বা দুঃখ তাঁকে বিচলিত করতে

পারত না। দুনিয়াটি ছিল তাঁর কাছে একটি রঙ্গমঞ্চ। কি সুন্দর ভাবেই না তিনি এই রঙ্গমঞ্চে তাঁর অভিনয় ক'রে গেলেন! পরার্থেই ছিল তাঁর জীবন-ধারণ। তাঁতে স্বার্থপরতার লেশমাত্র ছিল না। তাঁর নিজের কোন মতলব বা স্বার্থ ছিল না। ঠাকুরের বাণী ও সাধন-প্রচারই ছিল তাঁর জীবনব্রত। আমাদের ঠাকুর বলতেন, 'সে যথেচ্ছ চলতে পারে, তাতে তার কোন দোষ হবে না।'" স্বামী বিবেকানন্দের প্রশংসায় হরি মহারাজ পঞ্চমুখ হইতেন। একটু থামিয়া তিনি আবার বলিলেন, "কিন্তু আমাদিগকে সাবধান হতে হবে। মায়ার অসীম শক্তি, আমরা সহজেই মায়া দ্বারা আবদ্ধ ও মোহিত হই।" তখন গুরুদাস বলিয়া উঠিলেন, "মা আমাদের রক্ষা করবেন।" হরি মহারাজ বলিলেন, "তুমি ঠিক ব'লেছ, এটি কখনও ভুলো না। তাঁতে অটল বিশ্বাস রাখ। জগন্মাতা ব্যতীত সাধুজীবনের মূল্য কি? মাতৃচিন্তা ব্যতীত জীবন মিথ্যা ও মূল্যহীন। একমাত্র তিনিই সত্য।" একটু থামিয়া আবার বলিলেন, "এখন একটু ঘুমুতে চেষ্টা করো। কাল আমরা আরও ভাল জায়গা পেতে পারি।"

হরি মহারাজ বা গুরুদাস মহারাজ কেহই সে রাত্রে ঘুমাইতে পারিলেন না। মধ্যরাত্রির কিছু পরে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। বট-গাছের পাতায় বৃষ্টি-পড়ার শব্দ শোনা গেল। স্বামী তুরীয়ানন্দ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গুরুদাস মহারাজকে ডাকিয়া বলিলেন, "গুরুদাস, আমাদের অন্যত্র আশ্রয় নিতে হবে।" উভয়ে উঠিয়া স্ব স্ব কম্বলাদি লইয়া আশ্রয়ের সন্ধানে চলিলেন। কিন্তু পূর্ববৎ সকল স্থানই জনাকীর্ণ। হরি মহারাজ কোনও স্থানে ঢুকিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইলেন। সুতরাং যাত্রিগণের উচ্চ প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাঁহারা এক দিকে খোলা চটিতে ঢুকিলেন। যাত্রিগণ তথায় শায়িত অবস্থায় সেই বিনিদ্র রজনীতে গল্পগুজবে প্রমত্ত

ছিল। প্রতিবাদ এত তীব্র হইয়াছিল যে, মনে হইল যেন যাত্রীরা সাধু দুইজনকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবে। কিন্তু হঠাৎ তাহাদের চীৎকার থামিয়া গেল এবং সাধুদ্বয় মাথা গুঁজিবার একটু জায়গা পাইলেন। একটি বাক্সের মধ্যে চারিপাশে জিনিস থাকিলে আর একটি জিনিস মাঝখানে ঢুকাইয়া দিলে যেমন হয়, তেমনি সাধুদ্বয় যাত্রিপরিপূর্ণ স্থানের মধ্যে বৃষ্টি হইতে বাঁচিবার এবং শুইবার একটু জায়গা পাইলেন। ঘরটির তিন দিকে দেওয়াল, এক দিক খোলা এবং উপরে ছাদ। কঠিন মেজের উপর কম্বল পাতিয়া সাধুদ্বয় ঘুমাইয়া পড়িলেন। তাঁহারা ভোরে উঠিয়া দেখিলেন, আকাশে সূর্য উঠিয়াছে। ঘরের অর্ধেক যাত্রী অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। হাতমুখ ধুইয়া তাঁহারা কম্বলের উপর বসিয়া পরস্পর আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। গুরুদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাত্রিগণ তীব্র আপত্তি করা সত্ত্বেও আপনি গতরাত্রে চটির মধ্যে প্রবেশ করতে পারলেন কিরূপে?" স্বামী তুরীয়ানন্দ সহাস্যে বলিলেন, "তুমি এখনও আমাদের (ভারতীয়দের) চেন নি। আমরা খুব জোর চীৎকার করি বটে, কিন্তু এর পেছনে কিছু নেই। পাশ্চাত্ত্যে তোমরা সব ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ কর। এখানে তুমি দেখবে, দুজন লোকে কথা বলে এবং এমন ভাবভঙ্গী দেখায় যে, যেন উভয়ে পরস্পরকে তখনই খুন করবে। কিন্তু পাঁচ মিনিট পরই তারা একত্রে বসে এমনভাবে তামাক খাবে, যেন তারা পুরনো বন্ধু! এই হোল আমাদের ধারা। এই লোকেরা শিক্ষিত নয়, কিন্তু তাদের হৃদয় সৎ। যখন তারা দেখলে যে, আমরা সত্যিই বিপন্ন তখন তারা আমাদের জন্য জায়গা করে দিলে নিজেদের অসুবিধা সত্ত্বেও। আমি তাদের বললাম যে, তুমি বিদেশী, বিদেশে এসেছ এবং তুমি সন্ন্যাসী। তৎক্ষণাৎ তারা কুতূহলী হয়ে উঠল এবং তোমার সম্বন্ধে সব জানতে চাইলে। তখন তারা বললে, 'আপনারা আসুন।

আপনাদের জন্য জায়গা করে দিচ্ছি।' সর্বত্র তুমি এরূপই দেখবে। ভারতের সর্বত্র সন্ন্যাসীরা সমাদৃত হন, বিশেষতঃ গরীব লোকদের দ্বারা। তারা খুব সরল ও সদয়। আমাদের আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মত তারা কুটিল ও কপট নয়। স্বামীজী দরিদ্রদের ভালবাসতেন, তাঁর হৃদয় তাদের জন্য ব্যথিত ও বিদীর্ণ হোত। তিনি বল্‌তেন, 'তারা আমার উপাস্য দেবতা।' সেইজন্য আমাদের মিশন তাদের মধ্যে এত কাজ করে। সমগ্র ভারতে দরিদ্রনারায়ণদের সেবার জন্য আমাদের মিশনের শাখাকেন্দ্র আছে। আমরা তাদের বিনামূল্যে শিক্ষা ও ঔষধ-পথ্যাদি দিয়ে থাকি। আমরা দরিদ্ররূপী নারায়ণের সেবাই করি।"

একটু পরে স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "আমরা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছি, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ গীতা প্রচার করেছিলেন।" তারপর তিনি গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবের সহিত উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিলেন। গুরুদাস সংস্কৃত পদ্যের মাধুর্য ও ছন্দোময়তায় মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার আবৃত্তি শেষ হইতেই একজন ভদ্রলোক আসিয়া কর্কশ বাক্যে জিজ্ঞাসা করায় হরি মহারাজ বলিলেন, "আমরা সাধু। আমরা এখানে আশ্রয় নিয়েছি।" তিনি গুরুদাস মহারাজকে ইংরেজ গুপ্তচর বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন। তাই গুরুদাস মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাহেব কোন্ হ্যায়?" হরি মহারাজ তাঁহাকে সব কথা বুঝাইয়া বলাতে তিনি তখনই শান্ত হইয়া ভদ্রভাবে বলিলেন, "আপনারা উভয়ে আমার অতিথিরূপে এখানে থাকতে পারেন। আমি আপনাদের জন্য খাবার পাঠিয়ে দেবো।" লোকটি একটি ভৃত্যকে ডাকিয়া তাঁহাদের কম্বলের নীচে কিছু খড় বিছাইয়া দিতে বলিলেন। তৎপর তাঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

লোকটি চলিয়া যাইতেই স্বামী তুরীয়ানন্দ গুরুদাস মহারাজকে বলিলেন, "দেখ, মায়ের খেলা। এখন আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারি। তুমি কি মনে কর, এইভাবে থাকতে পারবে?" গুরুদাস বলিলেন, "হাঁ মহারাজ, আমার বিশ্বাস, আমি পারব।" একটু পরে একটি চাকর তাঁহাদের জন্য মোটা আটার রুটি ও গুড় আনিল। প্রত্যহ প্রাতে চাকরটি এইরূপ খাবার আনিত। সন্ধ্যায় সে রুটি ও ঝোল লইয়া আসিত। এইভাবে নয় দিন কাটিল। ভদ্রলোকটি কখন কখন আসিয়া তাঁহাদের সংবাদ লইতেন। ঘরের মধ্যে অন্যান্য যাত্রী থাকিলেও তাঁহারা নিজেদের কম্বল ভালরূপে পাতিবার জায়গা পাইলেন। যাত্রীরা ঘরের মধ্যে মাটির উনুন করিয়া রান্না করিত। ঘরের ধূমনির্গমনের জানালাদি না থাকায় ধোঁয়ার সময় সাধুদ্বয়ের শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইত এবং চোখ জ্বালা করিত। কিন্তু কাহার নিকটই বা তাঁহারা ইহার প্রতীকারার্থ অভিযোগ করিবেন? গুরুদাস মহারাজ এইপ্রকার জীবনযাপনে অনভ্যস্ত থাকায় মাঝে মাঝে তাঁহার জ্বর হইতে লাগিল। জ্বর হইলেও তিনি চলিতে ফিরিতে পারিতেন। যেদিন তাঁহার জ্বর হইত সেদিন তিনি রুটি খাইতে পারিতেন না; সেদিন হরি মহারাজ তাঁহার জন্য এক কাপ দুধ কিনিতেন। হরি মহারাজের পূত সঙ্গলাভের জন্য গুরুদাস মহারাজ এই কষ্ট স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছিলেন।

সন্ধ্যায় অনেকে স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত আলাপ করিতে এবং তাঁহার উপদেশ লইতে আসিতেন। তিনি গভীর রাত্রি পর্যন্ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া সমাগত ধর্মপিপাসুদের সহিত সৎপ্রসঙ্গ করিতেন। ধর্মপ্রসঙ্গ করিতে তাঁহার ক্লান্তিবোধ হইত না। ধর্মপ্রসঙ্গ করিতে তিনি সদা প্রস্তুত থাকিতেন। প্রাতঃকালে স্নানাহার-সমাপনান্তে

গুরুদাস মহারাজের সঙ্গে স্বামী তুরীয়ানন্দ যাত্রীদের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং সাধু ও তীর্থস্থানগুলি সাগ্রহে দর্শন করিতেন। যতীশ্বর (যেখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতা বলিয়াছিলেন), বাণগঙ্গা (যেখানে ভীষ্মদেব শরশয্যায় ইচ্ছামৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন), দ্বৈপায়ন হ্রদ ও সন্নিহিত তালাও প্রভৃতি প্রাচীন পুণ্যস্থানগুলি তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলেন। একটি বিশাল বটগাছে বড় বড় ডালে কয়েকটি কঠোরী সাধু পাখীর মত পাতার বাসা বাঁধিয়া বাস করিতেছিলেন। সেইবার কুরুক্ষেত্রের মেলায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু সন্ন্যাসিব্রহ্মচারীর সমাগম হইয়াছিল। সাধুদের মধ্যে কেহ উলঙ্গ, কেহ কৌপীনমাত্র-পরিহিত, কেহ গেরুয়াধারী, কেহ ধুনিভস্মলিপ্ততনু, কেহ পাগড়িধারী, কেহ জটাজুটমণ্ডিত, কেহ মুণ্ডিতমস্তক, কেহ বা শ্বেতাম্বর। জটাধারীদের মধ্যে কাহার জটা পৃষ্ঠোপরি বা বক্ষোপরি লম্বমান, কাহার বা শিরোপরি সর্পবৎ কুণ্ডলীকৃত। শাস্ত্রজ্ঞ সাধু ও পণ্ডিতগণ বৃক্ষতলে বা স্ব স্ব তাঁবু বা তৃণ-কুটীয়ার সম্মুখে বসিয়া ধর্মপ্রসঙ্গ বা শাস্ত্রাদি পাঠ করিতে-ছিলেন। জনৈক সাধু চিরমৌনব্রত, আর একজন অজগরবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। একজন রক্তবস্ত্রপরিহিত সাধু গাছের ডালে ভর করিয়া নয় দিবস এক পদে দাঁড়াইয়াছিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ গুরুদাস মহারাজকে ঐসকল দেখাইতে লাগিলেন। বিশাল তীর্থক্ষেত্রটি নয় দিন যাবৎ সহস্র সহস্র নরনারীর ধর্মালাপে মুখরিত এবং ধর্মভাবে পরিপ্লুত ছিল।

সূর্যগ্রহণের পূর্ণগ্রাসের সময় ধরণী অন্ধকারাবৃত হইলে স্নানের শুভযোগ আসিল। হ্রদগুলি সুবৃহৎ হইলেও যাত্রীর ভিড় এত অধিক ছিল যে, তাঁহাদের পক্ষে স্নান করা কঠিন হইয়া উঠিল। স্বামী তুরীয়ানন্দজী গুরুদাস মহারাজকে লইয়া অতি কষ্টে তিন ডুব দিলেন। হাজার হাজার

যাত্রীর একত্রে ভক্তিভরে স্নান এক অদ্ভুত দৃশ্য! জগতের অন্যত্র কোথাও এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখা যায় না। ইহা দেখিলে নাস্তিকও আস্তিক হইয়া উঠে। এইরূপ ধর্মমেলা দেখিলে ধর্মহীনের হৃদয়েও ধর্মভাব জাগ্রত হয়। এইজন্যই ত আমাদের মুনিঋষিগণ তীর্থদর্শনাদির এত বিধান দিয়াছেন। স্নানান্তে স্নানাদি ধর্মানুষ্ঠানের উপকারিতা সম্বন্ধে গুরুদাস প্রশ্ন করিলেন। উত্তরে স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "ইহা নির্ভর করে ভক্তিবিশ্বাসের উপর, মনোভাবের উপর। খাঁটি ভক্তি থাকলে সুফল অবধারিত। ইহা দ্বারা চিত্তশুদ্ধ হয়। সারকথা—সর্বভূতে মাকে দেখতে হবে। তা হলেই আমরা প্রকৃত ধর্মপ্রাণ হতে পারব।" তৎপর তিনি শ্রীশ্রীচণ্ডী হইতে এই শ্লোকটি সুর করিয়া আবৃত্তি করিলেন—

'যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥'

অর্থাৎ যে দেবী সকল প্রাণীতে চেতনারূপে অধিষ্ঠিতা তাঁহাকে নমস্কার। স্বামী তুরীয়ানন্দ এই প্রসঙ্গে বলিলেন, "মা-ই সর্বভূতে অবস্থিতা, তিনিই সর্বভূত। তিনিই নদী, তিনিই পর্বত, তিনিই সব। এটি দিব্য দর্শন, অলৌকিক অনুভূতি! আমাদের ঠাকুরের এটি লাভ হয়েছিল। তিনি গঙ্গা দেখতেন না, তিনি গঙ্গায় ব্রহ্মদর্শন করতেন।"

কুরুক্ষেত্রে স্বামী তুরীয়ানন্দ অহরহ এই দিব্যভাবে আবিষ্ট ছিলেন। নয়দিন পর মেলা শেষ হইল। গুরুদাস মহারাজ বেলুড় মঠাভিমুখে যাত্রা করিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ কুরুক্ষেত্রে আরও কয়েকদিন থাকিয়া জনৈক ভদ্রলোকের অতিথিরূপে অনুপশহরে গেলেন।

১৯০৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে স্বামী তুরীয়ানন্দ গঙ্গাতীরবর্তী গড়মুক্তেশ্বরে তপস্যারত ছিলেন। উক্ত মাসে তথা হইতে কাশীধামে

এক সাধুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে উল্লিখিত ছিল যে, তিনি সেই শীতকাল গড়মুক্তেশ্বরেই থাকিয়া তপস্যা করিবেন। সেই পত্রে হরি মহারাজ সাধনরহস্যের গূঢ় তত্ত্ব স্বানুভূতির আলোকে বর্ণনা করেন। তৎপূর্বে তিনি অনুপশহরে তপস্যারত ছিলেন। ইহা হইতে প্রতীত হয় তিনি অনুপশহর হইতে গড়মুক্তেশ্বরে যান।

নাঙ্গোলে

সম্ভবতঃ গড়মুক্তেশ্বর হইতে স্বামী তুরীয়ানন্দ ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষে বা ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে নাঙ্গোলে যান এবং তথায় ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী বা মার্চ পর্যন্ত তপস্যা করেন। নাঙ্গোল গঙ্গা-নদীর তীরবর্তী একটি ছোট গ্রাম। ইহা বিজনৌর জেলার অন্তর্গত এবং হরিদ্বার হইতে প্রায় ষাট মাইল দূরে অবস্থিত। গ্রামের নামানুসারে তত্রস্থ গঙ্গাঘাটকে নাঙ্গোলঘাট বলে। গঙ্গাতীর হইতে ৬০।৭০ হাত উঁচুতে জঙ্গলের মধ্যে সাধুরা থাকিয়া তপস্যা করেন। গ্রামের স্থানে স্থানে নিবিড় জঙ্গল, দিনের বেলায় বাঘে গরুছাগল খায়। স্বামী তুরীয়ানন্দ এইরূপ একটি গভীর জঙ্গলে প্রথমে তিন-চার দিন ছিলেন। তারপর গ্রামবাসীরা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে গঙ্গাতীরস্থ উচ্চ ভূমিতে তাঁহার জন্য বিরক্ত সাধুদের কুটীয়ার পাশে একটি খড়ের চালা করিয়া দেয়। তদবধি সেই চালাঘরে অর্থাৎ পর্ণকুটীরে তিনি বাস করিতে লাগিলেন। স্বামী গঙ্গানন্দ বলেন, "এখান হইতে দেখা যাইত, দিনের বেলায় ব্যাঘ্রী উহার শাবকদের সহিত খেলা করিতেছে।"

স্বামী তুরীয়ানন্দের কুটীরের অনতিদূরে স্বামী সহজানন্দ নামক এক সাধু অন্য একটি কুটীয়ায় থাকিতেন। হরি মহারাজ সহজানন্দজীর খুব প্রশংসা করিতেন এবং বলিতেন, "এই সাধু পূর্বে দারোয়ানী করিতেন। দেখ, এখন কেমন ভাল সাধু হয়েছেন।" হরি মহারাজ নদী পার হইয়া এক মাইল দূরবর্তী লোকালয়ে মাধুকরী করিতে যাইতেন। নদীতে কখন এক হাঁটু, কখন এক কোমর, কখন বা এক গলা জল হইত। তিনি সেই জল ও দূরত্ব অতিক্রম করিয়া পূর্বাহ্ণে ভিক্ষার্থ যাইতেন। সন্ধ্যায় এক পোয়া দুধ খাইয়া রাত্রি কাটাইতেন। স্বামী সহজানন্দ উপস্থিত থাকিলে উহা হইতে অর্ধেক দুধ তাঁহাকে দিতেন। সহজানন্দজী দুধ লইতে অস্বীকার করিতেন, কিন্তু হরি মহারাজ তাঁহাকে জোর করিয়া দিতেন। প্রত্যহ অপরাহ্ণে নিকটবর্তী সাধুরা হরি মহারাজের কুটীয়ায় আসিতেন। তখন তুলসীদাসের (হিন্দী) রামায়ণ পাঠ হইত। হরি মহারাজ রামায়ণের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেন, সাধুরা মুগ্ধ হইয়া শুনিতেন। হরি মহারাজকে সাধুরা খুব সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন এবং কেহ বা পণ্ডিত মহাত্মা, কেহ বা বাঙ্গালী সাধু বলিতেন। তখন হরি মহারাজের জামাকাপড়ও ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, অধিকাংশ সময় পরমহংসবৎ উলঙ্গ থাকিতেন এবং লোকসঙ্গ বিষবৎ পরিহার করিতেন। নদী পার হইয়া কেহ আসিতেছে দেখিলে তিনি কৌপীনটি পরিয়া লইতেন। এবং সম্পূর্ণ অপরিগ্রহ অভ্যাস করিতেন। একবার কৌপীনটি পর্যন্ত ছিঁড়িয়া যায়। কুটীয়ার অদূরে শ্মশানে একটি ভস্মীভূত শবদেহের একখানি কাপড় চিতাপার্শ্বে পড়িয়া ছিল। হরি মহারাজ সেই কাপড়ের এক টুকরা ছিঁড়িয়া গঙ্গাজলে ধুইয়া কৌপীন করিলেন। তাঁহার দেখাদেখি আরও কয়েকটি সাধুও সেই কাপড় হইতে কৌপীন করিয়া লইলেন।

অনেকদিন ধরিয়া এক জাঠ জমিদার স্বগৃহে ভিক্ষা দিবার জন্য স্বামী তুরীয়ানন্দকে অনুরোধ করিতেছিলেন। কিন্তু হরি মহারাজ তাঁহার বাড়ীতে ভিক্ষা লইতে রাজী হন নাই। একদিন হরি মহারাজ মাধুকরীর জন্য নিজ কুটীয়া হইতে গ্রামে গমনার্থ উদ্যত হইয়াছেন। এমন সময় পূর্বোক্ত জাঠ জমিদার চাল, ডাল, আটা, ঘৃতদুগ্ধাদি দ্রব্য লইয়া একটি যুবক ব্রাহ্মণ পাচকসহ উপস্থিত হইলেন। কঠোর তপস্যা, অনিদ্রা, অনাহার প্রভৃতির জন্য হরি মহারাজের শরীর তখন জীর্ণশীর্ণ ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি ভিক্ষার্থ বহির্গত হইলেও দৈহিক দুর্বলতাহেতু কুটীরদ্বারে বসিয়া পড়িলেন। তিনি অনন্যোপায় হইয়া জাঠ ভক্তটি কর্তৃক আনীত আহার্য গ্রহণ করিলেন। তদবধি তাঁহার রান্না সেইখানেই হইতে লাগিল এবং তিনি স্বীয় কুটীয়ায় বসিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন। জাঠ জমিদারও হরি মহারাজের সেবাব্যয় বহনপূর্বক নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন। হরি মহারাজের মুখে জাঠ জমিদারের কথা শুনিয়া স্বামী গঙ্গানন্দ নাঙ্গোলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "উহার দান গ্রহণ না করিবার যে সংকল্প করিয়াছিলেন তাহা ভঙ্গ করিলেন কেন?" সত্যনিষ্ঠ সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন, 'আমার সংকল্প অপেক্ষা দাতার সংকল্প অধিকতর প্রবল ও সুদৃঢ় ছিল।' পাচক যুবকটির বিবাহ হয় নাই বলিয়া হরি মহারাজ দুঃখ প্রকাশ করায় স্বামী গঙ্গানন্দ হাসিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি গঙ্গানন্দজীকে একটু ধমক দিয়া বলিয়াছিলেন, "বাসনাদগ্ধ হৃদয়ের যে কত দুঃখ তা ত জান না!"

একদিন গঙ্গানন্দজী নাঙ্গোলে একটি সাধুর কুটীয়ায় নিমন্ত্রিত হইয়া ভিক্ষার্থ যান। তথায় আরও কয়েকটি সাধু নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ আসিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটি বৃদ্ধ সাধু খাওয়া দাওয়ায়

বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় গঙ্গানন্দজী মনে মনে কিঞ্চিৎ অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। গঙ্গানন্দজী হরি মহারাজের নিকট উক্ত ঘটনা ব্যক্ত করায় তিনি গঙ্গানন্দজীকে ধম্‌কাইয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি বৃদ্ধ সাধুর সমালোচনা করিতেছ কেন? তোমার নৌকা গঙ্গার মাঝখানে। দোষ দেখিতে হয় নিজের দোষ দেখ, অপরের নহে। যে অপরের দোষ দেখে সে নিজেই দোষী হয়। 'তদা দ্রষ্টা দোষী ভবেৎ।'" আর এক ব্রহ্মচারী আসিয়া কোন সাধুর সম্বন্ধে বলিলেন, "না জানি, তাঁর কোন জাত।" তখন হরি মহারাজ বিরক্তভাবে উত্তর দিলেন, "নিজেকে তো সতীপুত্র মনে করিতেছ, আর সব বেশ্যাপুত্র, না!"

আর একদিন কোন আর্যসমাজী লোক আসিয়া বলিলেন, "আমি গঙ্গাকে মানি না।" হরি মহারাজ তাঁহাকে উত্তর দিলেন, "এখন সবল সুস্থ আছ। মানিবে কেন? রক্তের তেজ কমিলে গঙ্গামাকে মানার আবশ্যকতা বুঝিবে। আমার গঙ্গামাকে কত লোকেই মানে না, তাতে কি?" মহাতপা তুরীয়ানন্দ কনিষ্ঠের কাছেও স্বীয় ত্রুটি স্বীকার করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। একদা এক ব্রহ্মচারী তাঁহার কোন কথাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি যা বললেন তাতে আমার মূলোচ্ছেদ হয়। আমি আপনার কাছে এসব কথা শুনতে আসি নি।" তখন হরি মহারাজ বলিলেন, "You are a man of seriousness (তুমি গম্ভীর প্রকৃতির লোক)।" তখন ব্রহ্মচারী বলিলেন, "serious (গম্ভীর স্বভাব), হব না তো কি হব? আমি জীবন নিয়ে খেলা করতে আসিনি। আপনি আমার আদর্শ নষ্ট করছেন। আপনার মুখ দেখতে ইচ্ছা হয় না।" উক্ত ঘটনার পাঁচ সাত ঘণ্টার পর হরি মহারাজ ব্রহ্মচারীর নিকট যাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবার উপক্রম করিলেন। তখন ব্রহ্মচারী তাঁহাকে কড়া

কথা বলার জন্য অনুতপ্ত হইয়া বলিলেন, "আমি আপনার সন্তান, আমার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে না।" কয়েকদিন পরে ব্রহ্মচারীটির জ্বর হয়। হরি মহারাজ তাঁহাকে দেখিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন, "আমি তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি।"

নাঙ্গোলে অবস্থানকালে স্বামী তুরীয়ানন্দ একদিন প্রত্যূষে শৌচে যাইয়া একখানি বড় পাথরের উপর বসিয়াছিলেন। এমন সময় দেখিলেন, একটা খুব বড় বাঘ উচ্চতর স্থানে বসিয়া চারিদিক দেখিতেছে। উহার দৃষ্টি ও গতি এত বীরত্বব্যঞ্জক যে সে যেন দুনিয়ার কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেছে না। একদিন কথাপ্রসঙ্গে উক্ত ঘটনা বর্ণনাকালে শ্রোতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, বাঘ দেখিয়া আপনার ভয় হয় নাই?" স্বামী তুরীয়ানন্দ উত্তর করিলেন, "ভয় কি হে? আমি অবাক্ হইয়া উহার দৃপ্ত তেজ দেখিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে চোখাচোখি হওয়ামাত্র সে কালবিলম্ব না করিয়া নীচে নামিয়া গেল।" তপস্যাকালে স্বামী তুরীয়ানন্দ এত নির্ভীক ছিলেন যে, কোন কিছুর ভয়ে আদৌ ভীত হইতেন না। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ বা দুঃখ-কষ্ট তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারিত না। বৈরাগ্যের হোমানল জীবনে প্রজ্জ্বালিত করিলে সাধুর এইরূপ অবস্থাই হইয়া থাকে। ১৯০৯ সালের শেষে স্বামী তুরীয়ানন্দ ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়া অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়েন। কিন্তু দুর্বল শরীর লইয়াই তিনি মাধুকরীর জন্য নাঙ্গোল গ্রামে যাইতেন। একদিন ভিক্ষায় যাইবার সময় তিনি আছাড় খাইয়া জলে পড়িয়া যান। সেই আর্দ্র বস্ত্রেই তিনি গ্রামে যাইয়া মাধুকরী করিয়া নিজ কুটীরে ফিরিয়া আসেন। তাঁহাকে রক্তহীন ও দুর্বল দেখিয়া এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী তাঁহাকে প্রত্যহই শরীরের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিত। একদিন ব্রাহ্মণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "তোমার শরীর

আগে কেমন মোটা তাজা ছিল, এখন শুকিয়ে গেছে, পা-ও ফুলেছে।" হরি মহারাজ অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুই চারিদিন বৃদ্ধার প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। শেষে বিরক্ত হইয়া একদিন বলিয়াছিলেন, "মৈ তো শরীর কো ভুলনা চাহতা হুঁ, তু খালি মুঝে ইয়াদ দিলা দেতী হৈ। অ্যায়সী বাত ফির মৎ পূছনা।" (আমি তো শরীরকে ভুলতে চেষ্টা করছি, আর তুমি কুশল প্রশ্ন দ্বারা দেহবোধ জাগিয়ে দিচ্ছ। এরূপ প্রশ্ন আর ক'রো না)।

রোগে ও কঠোরতায় নাঙ্গোলে স্বামী তুরীয়ানন্দের শরীর অসুস্থ হইল। কিন্তু তিনি সংঘের কোন কেন্দ্রে বা সন্ন্যাসীকে স্বীয় অসুস্থতার সংবাদ দেন নাই। একটি স্থানীয় স্কুল-ইনস্পেক্টর তাঁহার কাছে যাতায়াত করিতেন। তিনিই কনখল সেবাশ্রমে হরি মহারাজের অসুস্থতার সংবাদ প্রেরণ করেন। সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী কল্যাণানন্দ তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ চিঠি লিখিলেন, তিনি কিন্তু কনখলে গেলেন না। তখন কল্যাণানন্দজী গঙ্গারাম মহারাজকে নাঙ্গোলে পাঠাইলেন। গঙ্গারাম মহারাজ স্বামী তুরীয়ানন্দের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন বেলা দশটা। হরি মহারাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?" গঙ্গারাম মহারাজ—"গ্রামে মাধুকরী করে খেয়েছি।" হরি মহারাজ—"এখানে রান্না হয়, এখানে এসেও খেতে পারতে। তোমার বৈরাগ্য দেখে সুখী হলাম।" কয়েক ঘণ্টা পরে পূর্বোক্ত স্বামী সহজানন্দ হরি মহারাজের ইচ্ছানুসারে গঙ্গারাম মহারাজকে সঙ্গে লইয়া এক মাইল দূরে ঘোর জঙ্গলের মধ্যে একটি জীর্ণ পাকা কুটীরে অন্যান্য সাধুদের নিকট রাখিয়া আসিলেন। পরদিন প্রাতে গঙ্গারাম মহারাজ হরি মহারাজের কাছে যাইয়া দেখিলেন, পূর্বোক্ত হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ-যুবক তাঁহার রান্না করিতেছে; কিন্তু সেই অনভিজ্ঞ পাচকের

রান্না বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর বিশেষতঃ, ভগ্নস্বাস্থ্য তুরীয়ানন্দজীর আদৌ উপযোগী নয়। সেইজন্য তিনি নিজে থালাবাসন ভালরূপে মাজিয়া গঙ্গাস্নানান্তে রান্না করিলেন এবং হরি মহারাজকে খাওয়াইলেন।

গঙ্গারাম মহারাজ মাধুকরীর দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দের কুটীরে আসিতেন। তখন তুরীয়ানন্দজীর শরীর অতিশয় জীর্ণ-শীর্ণ হইয়াছিল, নাক দিয়া রক্ত পড়িত এবং পা-তুটিও ফুলিয়াছিল। গঙ্গারাম মহারাজ রাত দশটা পর্যন্ত হরি মহারাজের কাছে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিতেন এবং তারপর এক মাইল দূরে স্বীয় কুটীরে ফিরিয়া যাইতেন। একদিন হরি মহারাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত অন্ধকারে গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া রাত্রে যাইতে ভয় করে না?" গঙ্গারাম মহারাজ তদুত্তরে বলিলেন, "এখন আপনার সেবা করছি, তাই ভয় হয় না।" যদিও গঙ্গারাম মহারাজ ভিক্ষা করিয়া খাইতেন তথাপি হরি মহারাজ তাঁহাকে স্বীয় কুটীরে মাঝে মাঝে খাওয়াইতেন। একদিন গঙ্গারাম মহারাজ হরি মহারাজের রান্না করিবার জন্য বাজার হইতে ধনিয়া, জিরা প্রভৃতি কিছু মশলা ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছিলেন। ইহাতে হরি মহারাজ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আমার নাম করিয়া কখনও কিছু ভিক্ষা করিও না।" আর একদিন হরি মহারাজের শরীর অত্যন্ত খারাপ দেখিয়া গঙ্গারাম মহারাজ বেলুড় মঠে চিঠি লিখিতে চাহিলেন। হরি মহারাজ ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি মঠে চিঠি লিখিলে আমি এখান হতে চলে যাব।" এই বলিয়া তিনি দাঁড়াইয়া উঠিলেন। গঙ্গারাম মহারাজ স্বীয় প্রস্তাব প্রত্যাহার করায় হরি মহারাজ নিরস্ত হইলেন। একদা কোন ভক্ত আশ্রম করিবার জন্য হরি মহারাজকে কিছু অর্থ ও জমি দিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু হরি মহারাজ তাহা গ্রহণ করেন নাই।

জনৈক স্ত্রীলোক হরি মহারাজের কাছে দীক্ষা গ্রহণের অভিলাষ করেন। কিন্তু নিজে মহিলাটিকে দীক্ষা না দিয়া ত্রিশ, চল্লিশ বৎসরের সাধারণ সাধুকে দিয়া দীক্ষা দেওয়াইলেন। তখন গঙ্গারাম মহারাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এ রকম করিলেন কেন?" তদুত্তরে হরি মহারাজ বলিয়াছিলেন, "দীক্ষা দেওয়া ও গ্রামে যাইয়া মেলামেশা করা কঠিন কাজ। ও আমার তপস্যার হানিকর। কিন্তু ঐ সাধুটির দীক্ষা দিবার এবং ঐ মেয়েটির দীক্ষা নেবার ইচ্ছা হয়েছে। তাই এরূপ যোগাযোগ করে দিয়েছি।" কনখল সেবাশ্রমের স্বামী নিশ্চয়ানন্দ হরি মহারাজের কাছে নাঙ্গোলে যাইয়া বাস করিবার জন্য কয়েকবার লিখিয়াছিলেন। কিন্তু হরি মহারাজ তাঁহাকে আসিতে সম্মতি দেন নাই। গঙ্গারাম মহারাজ ইহা পূর্ব হইতে জানিতেন। সেজন্য তিনি হরি মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি স্বামী নিশ্চয়ানন্দকে আসিতে দিলেন না কেন?" উত্তরে হরি মহারাজ বলিয়াছিলেন, "আমার মাথার উপর বোঝা পড়িবে।" গঙ্গারাম মহারাজ—"আমি তো আপনার কাছে আছি।" হরি মহারাজ—"তুমি কাহার মাথার বোঝা নও।" যখন হরি মহারাজের অসুখ বাড়িয়া গেল তখন নাঙ্গোল গ্রামের কয়েকটি ভক্ত তাঁহাকে গ্রামে লইয়া যাইয়া ভাল কবিরাজের দ্বারা চিকিৎসা করাইবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু হরি মহারাজ চিকিৎসার্থ যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন গঙ্গারাম মহারাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি গ্রামে যাইয়া চিকিৎসিত হইতে সম্মত হইলেন না কেন? গীতায় আছে, 'শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্ নাপ্নোতি কিল্বিষম্ (কেবল শারীরিক কর্ম করিলে পাপ হয় না)।'" তদুত্তরে হরি মহারাজ বলিয়াছিলেন, "এখান থেকে গেলে স্বাধীনতা নষ্ট হবে; আর সঙ্গদোষ আশ্রয়

করবে।” গঙ্গারাম মহারাজ—“আপনার মত মহাপুরুষের সঙ্গদোষে ভয় কি?” হরি মহারাজ—“সঙ্গের যে কি প্রভাব তা তুমি জান না?” গঙ্গারাম মহারাজ—“তবে এখানে জঙ্গলের মধ্যে চিকিৎসা কিরূপে হবে?” তদুত্তরে হরি মহারাজ বৈরাগ্যপূর্ণস্বরে বলিয়াছিলেন, “ঔষধং জাহ্নবীতোয়ং, বৈদ্যো নারায়ণো হরিঃ (আমার চিকিৎসক সাক্ষাৎ ভগবান এবং ঔষধ গঙ্গাজল)।” কথাপ্রসঙ্গে হরি মহারাজ গঙ্গারাম মহারাজকে বলিয়াছিলেন, “গুরুদাস (স্বামী অতুলানন্দ) রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়েছে শুনে ওর বাপ ওকে কিছুই দিলেন না। কিন্তু ওর মা ওকে কিছু টাকা দিয়ে যান। সেই টাকা গুরুদাস আমাকে পাঠিয়েছিল। কিন্তু আমি ঐ টাকা খরচ করছি না জেনে গুরুদাস আমেরিকা হতে আমাকে লিখেছিল, ‘দেখবেন টাকার যেন সুদ বৃদ্ধি না হয়।’ তারপর আমি কাশীর সেবাশ্রম ও অদ্বৈতাশ্রমাদির জন্য সেই টাকা খরচ করতে আরম্ভ করলাম।” ইহা শুনিয়া গঙ্গারাম মহারাজ প্রশ্ন করিলেন, “আপনাকে যে টাকা দেওয়া হল আপনি তা খরচ করলেন না কেন?” তখন হরি মহারাজ বলিয়াছিলেন, “আমি জানতাম ভারতবর্ষের উপর তার যে গভীর টান আছে তার ফলে সে এদেশে না এসে থাকতে পারবে না। কিন্তু এদেশে এলে ভিক্ষা করে খাওয়া তার পক্ষে খুবই কষ্টকর। তাই ওর টাকা ওর জন্যে রেখে দিয়েছি।” কিছুদিন পরে নাজিমাবাদ হইতে এক ভক্ত আসিয়া হরি মহারাজকে তাঁহাদের বাড়ীতে লইয়া যান। সেখানে তাঁহার অসুখ খুব বাড়িয়া যায়। তাঁহার অসুখের সংবাদ তারযোগে কনখল সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী কল্যাণানন্দকে পাঠান হয়। স্বামী কল্যাণানন্দ স্বয়ং নাজিমাবাদে আসিয়া হরি মহারাজকে কনখল সেবাশ্রমে লইয়া যান।

কনখলে[1]

নাঙ্গোলে তপস্যা করিবার সময় স্বামী তুরীয়ানন্দের জ্বর হয়। অসুখ বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁহার অবস্থা অতিশয় উদ্বেগজনক হইয়া উঠে। তাঁহার এক ভক্ত তাঁহাকে নাজিমাবাদে লইয়া গিয়া সেবা-শুশ্রূষা করিতে থাকে; কিন্তু অবস্থা সঙ্গীন হওয়ায় কনখল সেবাশ্রমে জানান হয়। তথাকার অধ্যক্ষ স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী বা মার্চ মাসে কনখল সেবাশ্রমে লইয়া যান। তাঁহাকে দেখিবার জন্য স্বামী প্রেমানন্দ এবং ব্রহ্মচারী গুরুদাস ৭ই এপ্রিল কাশী হইতে কনখলে উপস্থিত হন। তখন স্বামী তুরীয়ানন্দের জ্বর ছাড়িয়া গেলেও শরীর শীর্ণ ও দুর্বল ছিল। সেবাশ্রমে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মচারী গুরুদাস একাকী হরি মহারাজের ঘরে গেলেন। যাইয়া দেখিলেন, হরি মহারাজ শয্যায় সমাসীন; তাঁহার শরীরের তেমন পরিবর্তন হয় নাই, কেবল তাঁহার দাড়ি ও মাথার চুল পাকিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তাঁহার তালুতে টাক পড়িতেছে। তাঁহাকে দুর্বল দেখাইতেছিল, রুগ্ন নহে। তাঁহার মুখে ও চোখে প্রশান্ত ভাব। তাঁহার স্বর ক্ষীণ কিন্তু দৃঢ়। তাঁহার দৈহিক দুর্বলতার পশ্চাতে প্রবল মানসিক শক্তি লক্ষিত হইতেছিল। প্রতি অঙ্গ সঞ্চালনে এবং এমন কি, কণ্ঠস্বরেও ইহা প্রকাশমান ছিল।

পরস্পর অভিবাদনসূচক একটু আলাপের পর স্বামী তুরীয়ানন্দ গুরুদাস মহারাজকে তাঁহার স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। হরি

১ 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় (১৯২৫ মার্চ ও এপ্রিল সংখ্যা) স্বামী অতুলানন্দের প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত এবং 'উদ্বোধন' (১৩৫৫ পৌষ) পত্রিকায় প্রকাশিত।

মহারাজ স্বামী প্রেমানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অস্থির হইয়াছিলেন। গুরুদাস তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন যে, বাবুরাম মহারাজ শীঘ্রই আসিবেন। তখন হরি মহারাজ একটু শান্ত হইয়া গুরুদাস মহারাজকে বলিলেন, "তোমাকে খুব দুর্বল ও শীর্ণ দেখাচ্ছে। কলকাতার কোন ভাল চিকিৎসকের পরামর্শ নাওনি কেন? তোমার সমস্যা ত খাদ্যেরই। আমাদের দেশের খাদ্য তোমাদের সহ্য হয় না। আমরা আমাদের স্বাস্থ্যের প্রকৃত যত্ন নিতে পারি না, তাই আমরা রোগে এত ভুগি। সবল হও, দুর্বল হ'য়ো না। কিন্তু শরীরের দিকে বেশী নজর দিও না। আমি গত ছয়মাস ধরে খুব ভুগছিলাম, কিন্তু ওদিকে খেয়ালই করি নি। আমার কোন ভয়ও ছিল না। আমি মহাযাত্রার জন্য সদা প্রস্তুত। কিন্তু মা এখনও সেটি হতে দেন নি। আরও গভীরভাবে এখন বুঝতে পারছি, তিনিই সব করছেন। আমরা তাঁর হাতে যন্ত্রমাত্র। তাঁর ইচ্ছা না হলে আমরা কিছুই করতে পারি না। আমরা যেন এটি কখন না ভুলি।" গুরুদাস মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা আমাদের দুর্বল করেন কেন?" স্বামী তুরীয়ানন্দ উত্তর দিলেন, "তিনিই জানেন। দুর্বলতায় ভালও হতে পারে। কিছুই একেবারে মন্দ নয়। কিন্তু আমরা এসব কিছুই বুঝতে বা বিচার করতে পারি না।" স্বামী প্রেমানন্দ এই সময় ঘরে আসিলেন। গুরুভ্রাতৃ-যুগলের সপ্রেম সম্মিলন এক অতি সুন্দর দৃশ্য! হাস্যমুখে গুরুদাস বলিলেন, "স্বামী প্রেমানন্দ আপনাকে বেলুড় মঠে নিয়ে যেতে এসেছেন।" স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "না, এখন নয়। শরীর সুস্থ করবার জন্য ডাক্তার আমাকে পাহাড়ে যেতে বলছেন। তিনি আমাকে সমতল প্রদেশে যেতে দেবেন না। এখন ওখানে খুব গরম। আর আমার বিশ্রামও হবে না। সারাদিন লোক ভিড় করবে আমার কাছে।"

বৈকালে গুরুদাস মহারাজ হরি মহারাজকে বলিলেন, তিনি প্রতীক-তত্ত্ব সম্বন্ধে একটি বই পাইয়াছেন। হরি মহারাজ বলিলেন, "প্রতীক-তত্ত্ব সম্বন্ধে এত মাথাঘামাও কেন? আমাদের ঠাকুরের শিক্ষা খুব সহজ ও সরল। ইহা সুগম পথ। একদিন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে প্রায় তু'ঘণ্টা ধরে বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে বললেন। তখন ঠাকুর উত্তর দিলেন, 'মশায়, আপনি যা বললেন তা খুব সুন্দর হতে পারে, কিন্তু আমি এসব বুঝি না। আমি জানি জগদম্বাকে, আর জানি আমি তাঁর সন্তান।' ঠাকুরের কথায় পণ্ডিতের চোখ খুলল। তিনি সানন্দে বলে উঠলেন, 'মশায়, আপনি ধন্য।' ঠাকুরের সরলতা এমনভাবে তাঁর হৃদয় স্পর্শ করল যে, তিনি কাঁদতে লাগলেন।"

সন্ধ্যায় স্বামী তুরীয়ানন্দ আমেরিকা এবং সেখানকার ভক্ত ও বন্ধুদের কথা গুরুদাস মহারাজের সঙ্গে আলোচনা করিতে লাগিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "মা আমাকে কৃপা করে আমেরিকায় নিয়ে গিয়েছিলেন। তোমরা সকলে আমার পরমাত্মীয় ও পরম প্রিয়। প্রায়ই আমি তোমাদের সান্নিধ্য অনুভব করি। আমি চোখ বন্ধ করে মনে মনে এক একটি বন্ধুকে ডাকি। অবশ্য তারা তা জানে না। এটা আমার কল্পনা মাত্র। কিন্তু এরূপ কল্পনা তৃপ্তিদায়ক। সবই ত মানসিক। আত্মস্বরূপে আমরা সব এক।" গুরুদাস মহারাজের প্রতি বিভিন্ন লোকের ধারণা সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "এগুলি আমাদের মনেরই প্রক্ষেপণ। ভালমন্দ আমাদের মনেই আছে। সর্বত্র ভাল দেখতে চেষ্টা করাই ভাল। যখনই আমরা মায়ের সান্নিধ্যে থাকি তখন সবই মঙ্গল। তাঁর অভাবেই সকল কষ্টের উদ্ভব।"

গুরুদাস মহারাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কাশ্মীরে যাইবেন কি না। স্বামী তুরীয়ানন্দ উত্তর দিলেন, "সংকল্প করা

অনাবশ্যক। কারণ, মা পূর্বেই জানেন, কি ঘটবে। আমরা সংকল্প করি, কারণ আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস নেই। সংকল্পশূন্য অবস্থায় থাকতে হলে গভীর বিশ্বাসের প্রয়োজন। কাশ্মীর হোক, বা কলকাতা হোক তাতে কি যায় আসে ? মা সর্বত্রই আছেন।" পরদিন প্রাতে গুরুদাস মহারাজ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলিলেন, "কেউ কেউ মনে করে, আমি একলা থাকতে চাই। তা সত্য নয়। আমি অনুকূল সঙ্গ চাই।" গুরুদাস বলিলেন, "কিন্তু আপনি কোলাহল-পূর্ণ স্থান পছন্দ করেন না।" তুরীয়ানন্দ মহারাজ উত্তর করিলেন, "কোলাহলের জন্য আমি আদৌ ভাবি না, যদি সকলের মন একভাবে ভাবিত হয়—ধর্মভাবে। লোকসমাগম আমি পছন্দ করি, যদি ধর্ম-প্রসঙ্গ চলে। যা আমি জানি তা আমি শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করি। কারণ তাতে এই তৃপ্তি পাই যে, আমি কিছু কাজে লাগছি। অপরকে সেবা করার চেয়ে মহত্তর সুখ আর কি হতে পারে ? আমেরিকায় আমি কি সুখেই ছিলাম ! কিন্তু এখন আর কোন কাজের ভার নিতে ইচ্ছা হয় না। কোন কর্তব্য সম্পাদন করতে হলে মনে হয় যেন আমি বদ্ধ হয়ে পড়লাম। আমি সদা মুক্তভাবে থাকতে চাই, তাতে যা' হবার হোক।"

পরদিন সকালে একজন যুবক জয়রামবাটী হইতে আসিলেন। শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে সন্ন্যাস দিয়া তাঁহার হাতে একখানি চিঠিতে স্বামী তুরীয়ানন্দকে লিখিয়াছেন, আবশ্যক বিরজা-হোমাদি করিবার জন্য। তিনি কনখলের পথে বহুস্থানে নামিয়া দেখিয়াছেন যে, বাংলার বাহিরের খাদ্য তাঁহার সহ্য হয় না। ইহা শুনিয়া হরি মহারাজ বলিলেন, "কখন কখন এই ভেবে আমি আশ্চর্য হই, যৌবনে এত কষ্টে কি করে জীবন কাটিয়েছি। এখন এরূপ করা খুব শক্ত

মনে হয়। কিন্তু মনের জোরে এখন সেরূপ করতে পারি। সত্যই এদিকের খাদ্য খুবই নিকৃষ্ট। তখনকার দিনে ওসব বিষয়ে আদৌ ভাবতাম না। খাদ্য, স্বাস্থ্য বা শরীরের বিবেচনা তখন মনে স্থান পেত না। আমাদের একটিমাত্র লক্ষ্য ছিল, এবং সেই লক্ষ্যের জন্যই জীবনধারণ করেছিলাম। আমরা খুব জপ ধ্যান করতুম। দিনে একবার মাত্র খেতুম, কয়েকটি বাড়ী থেকে ভিক্ষা করে যে কখানি রুটি এবং একটু ঘোল পেতুম তাতেই আমাদের দিন কাটত। এরূপ সামান্য আহারেই সন্তুষ্ট থাকতাম। আমি বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়েছিলাম। বোধহয়, বৃদ্ধবয়সে অধিকতর ভাল খাদ্যের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সে ধারণাও কাল্পনিক। আমরা খাদ্যকে অখাদ্য মনে করি। সেইজন্য তা' থেকে যথেষ্ট পুষ্টি গ্রহণ করতে পারি না। যে যে দিন আমরা শরীরের কথা ভাবি না সেগুলিই সুখের দিন।"

একজন ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, ধ্যানের পক্ষে কোন বিষয়টি উত্তম?" তুরীয়ানন্দজী উত্তর দিলেন, "যে বিষয়টি তোমার ভাল লাগে। সবই এক লক্ষ্যে নিয়ে যায়, পরে সব ঠিক হয়ে যায়।" গুরু-শিষ্যের প্রকৃত সম্বন্ধ বিষয়ে তিনি বলিলেন, "গুরু শিষ্যকে স্নেহে আবদ্ধ করবেন। কিন্তু তিনি তাকে বদ্ধ না রেখে মুক্ত রাখবেন। যিনি অপরকে বদ্ধ করেন তিনি নিজেই বদ্ধ হন। গুরু শিষ্যকে হৃদয়ের (প্রেমের) দ্বারাই শাসন করবেন, মস্তিষ্কের (বুদ্ধির) দ্বারা নয়। শিষ্যের মোহনাশ এবং দৃষ্টি সাফ করাই গুরুর কাজ।" শিষ্যের গুরুর প্রতি আনুগত্য সম্বন্ধে বলিলেন, "শিষ্য প্রেমেই গুরুর আদেশ পালন করবেন, ভয়ে নয়। ভয় হতে যে আনুগত্য হয় তা' দাসত্ব। যারা প্রভুত্বের কাঙাল, তারা আনুগত্য আদায় করে—তারা শাসন করতে চায়। এটা ক্ষুদ্রতা, নীচতা।" পরদিবস

তিনি স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বলিলেন, "তাঁর অদ্ভুত শক্তি ছিল! অনেকের উপর তিনি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। কিন্তু খুব কম লোকেই উহা স্বীকার করে। অনেকে স্বামীজীর বাণীকেই নিজের বাণীরূপে প্রচার করেন। কিন্তু স্বামীজী ছিলেন নির্ভীক।" এই বলিয়া তিনি তৈত্তিরীয় উপনিষদের (২।৪) এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন—"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।" (ব্রহ্মানন্দ লাভ করিলে মানুষ ভয়শূন্য হয়)।

গুরুদাস জিজ্ঞাসা করিলেন—"জ্ঞানিগণের কি পুনর্জন্মের ভয় থাকে না?" স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "তাঁদের ত পুনর্জন্ম হয় না। আর যদি জন্ম হয়ও তাকে জন্ম বলতে পার না। কারণ, তখনও তাঁরা মুক্ত। শিব শিব, ওঁ তৎ সৎ ওঁ। তাঁরা নির্ভয়। কারণ, তাঁরা অনাসক্ত। মাকে জানলেই আসক্তি দূর হয়। এই দুনিয়া তখন কত ক্ষুদ্র, কত নগণ্য, একটা মাটির পুতুলের মত তুচ্ছ।" এই কথা বলিবার পর স্বামী তুরীয়ানন্দের মন কোন্ অতীন্দ্রিয় লোকে চলিয়া গেল; দৃষ্টি কোন্ ঊর্ধ্বলোকে নিবদ্ধ হইল। তিনি নীরবে উপবিষ্ট রহিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল এক দিব্যপ্রভায় ভাস্বর হইয়া উঠিল। অনেকক্ষণ কেহই কথা বলিতে পারিলেন না।

তৎপরদিবস তিনি তাঁহার আমেরিকার অভিজ্ঞতা এবং তথায় স্বামী বিবেকানন্দের সহিত ভ্রমণকাহিনী বর্ণনা করিলেন। তৎপ্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "সবই মায়ের কৃপা। শিব, শিব! মা ব্যতীত সবই দুঃখময়। যখন আমরা তাঁর জন্য কাঁদি, যখন আমাদের হৃদয় তাঁর জন্য আকুল হয় তখনই তিনি আসেন।" একজন আমেরিকান শিষ্যার সম্বন্ধে তিনি বলিলেন, "সেও ছিল নির্ভরশীল। সে শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করে না কেন? আমি ত তাঁরই দাস। তাঁর কাছে

সবাই আস্থক, তা হলে অভী হবে।” পাশ্চাত্ত্য কবি ও দার্শনিক-গণের সম্বন্ধে গুরুদাস মহারাজ মন্তব্য করিলেন যে, তাঁহারা প্রাচ্য ভাবধারার নিকট প্রভূতভাবে ঋণী। স্বামী তুরীয়ানন্দ সহাস্যে বলিলেন, “আমাদের শিবই শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। যখন নারদ তাঁকে উমার মৃত্যু সংবাদ দিলেন, তখন তিনি বললেন, ‘উত্তম। এখন আমি নিশ্চিন্ত মনে ধ্যান করতে পারব।’ এটাই শ্রেষ্ঠ ব্যবহারিক দর্শন।”

কয়েকদিন পরে হরি মহারাজ যখন একটু চলিতে ফিরিতে সমর্থ হইলেন তখন তিনি গুরুদাস মহারাজের ঘরে গেলেন। তাঁহার টেবিলের উপর ঠাকুরের একটি ফটো দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, “তিনি একাকীই দণ্ডায়মান। তিনি অতুলনীয়। কেশব সেন একদিন তাঁকে কোন ফটোগ্রাফারের নিকট নিয়ে যান এবং তাঁকে মুহূর্তের জন্য স্থিরভাবে দাঁড়াতে অনুরোধ করেন। ঠাকুর তাঁর কথা শিশুর মত মানলেন, এবং ফটোগ্রাফটি তোলা হল।” স্বামী তুরীয়ানন্দ গুরুদাস মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি বেশী চিঠিপত্র পাও কি?” গুরুদাস বলিলেন, “বেশী না।” তখন তিনি বলিলেন, “আমরা যেমন দিই তেমন পাই। যদি আমরা অপরকে ভালবাসি, তারাও আমাদের ভালবাসবে।”

বৈকালে গুরুদাস মহারাজ স্বামী তুরীয়ানন্দের ঘরে যাইয়া তথায় স্বামী প্রেমানন্দকে দেখিলেন। হরি মহারাজ তখন খই খাইতেছিলেন। গুরুদাস বলিলেন, “আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আপনার জন্য একটু নুন নিয়ে আসি।” গুরুদাস ফিরিয়া আসিলে হরি মহারাজ বাইবেল হইতে নিম্নোক্ত বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিলেন, “ ‘তোমরাই পৃথিবীর লবণ। কিন্তু লবণ যদি উহার লবণত্ব হারায় তবে কিরূপে উহা নোন্‌তা করা যাইবে?’ যীশুখ্রীষ্টের বাক্যগুলি কি শক্তিশালী!

তিনি বলেছিলেন, 'শৃগালদের গর্ত আছে, আকাশচারী পাখীদেরও বাসা আছে। কিন্তু ঈশ্বর-সন্তানের মাথা গুঁজিবার স্থান নাই।' তিনি ছিলেন যথার্থ সন্ন্যাসী।"

গুরুদাস বলিলেন, "ভারতে বাস করে আমি বাইবেল আরও ভালরূপে বুঝতে পারছি। বাইবেলোক্ত ঘটনা এখানে নিত্যই ঘটছে। এখানে সন্ন্যাসিগণ কিরূপে জীবনযাপন করেন তা দেখে আমি যীশুর জীবন আরও স্পষ্টরূপে মানসপটে চিত্রিত করতে পারি। ভারতবাসে অদ্ভুত অভিজ্ঞতালাভ হয়।" স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "হাঁ, তুমি সন্ন্যাসীর দৃষ্টিতে ইহা দেখছ।" তারপর গুরুদাস তাঁহাকে লেডি মিণ্টোর বেলুড় মঠ-পরিদর্শনের কথা বলিলেন। লেডি মিণ্টো বেলুড় মঠের সাধুগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণের কি বাণী?" একজন সাধু উত্তর দিয়াছিলেন, "তিনি হিন্দুশাস্ত্রমতেই উপদেশ দিতেন।" তাহা শুনিয়া হরি মহারাজ বলিয়া উঠিলেন, "তাঁর উপদেশই শাস্ত্র। শাস্ত্রাতিরিক্ত অনেক কথাও তিনি বলেছেন। তবে তিনি বিনয়পূর্বক বলতেন, তাঁর সব উপদেশ শাস্ত্রেই আছে।"

গুরুদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুরের বাণী কি শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ হতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন নয়?" হরি মহারাজ বলিলেন, "হাঁ, শঙ্কর কেবল মুক্তি বা নির্বাণলাভের পথ নির্দেশ করলেন। আমাদের ঠাকুর প্রথমে মানুষকে মুক্ত করতেন এবং তৎপরে তাকে শিক্ষা দিতেন, কিরূপে সংসারে থাকতে হবে। তাঁর দিব্য স্পর্শে মানুষের সকল বন্ধন ছুটে যেত, মানুষ মুক্ত হত। কিন্তু যাঁরা তাঁর উপদেশ পালন করেন তাঁরাও মুক্ত হবেন। তাঁর বাক্যের মুক্তিপ্রদা শক্তি ছিল। প্রথমে মুক্ত হও। নাম, রূপ এবং সমগ্র বিশ্বকে বিসর্জন দাও। তারপর সর্ব বস্তু ও ব্যক্তিতে মাকে দর্শন কর। তারপর তাঁর খেলার সাথী হও। আমরা

নির্বাণের জন্য ব্যস্ত নই। আমরা প্রভুর সেবা করতে চাই। আমরা বুড়ী ছুঁয়েছি, আর আমাদের চোর হতে হবে না।[১] জীবন যখন যন্ত্রণাদায়ক হয় তখন আমরা জগদম্বার সন্ধান ও স্মরণ করি। মায়ের শরণে ও স্মরণেই প্রকৃত শান্তি, বিমল আনন্দ। প্রাত্যহিক জীবনের সামান্য বিষয় অবলম্বন করে ঠাকুর শিক্ষা দিতেন। সেইজন্য সর্বদা তাঁর কথাই আমাদের মনে পড়ে। গাছপালায়, পত্রপুষ্পে, কীটপতঙ্গে, নরনারীতে—সর্ববস্তুতে তিনি মাকে দেখতে শিক্ষা দিয়েছেন। জীবিত বা মৃত অবস্থায় আমরা মাতৃক্রোড়েই অবস্থিত। প্রথমে ইহা অনুভব কর এবং তারপর এই সত্য সর্বক্ষণ স্মরণ কর। তাহলে জগৎ আমাদের মলিন করতে পারবে না। মাতৃহীন জীবন কী কষ্টকর! তাঁকে পেলে জীবন মধুময় হয়। তখন আমাদের অভীত্ব লাভ হয়।"

এমন সময় ডাক্তার ঘরে আসিলেন। তিনি স্বামী তুরীয়ানন্দকে পরীক্ষাপূর্বক বলিলেন, "যদি ইনি একটু সাবধানে থাকেন, শীঘ্রই সম্পূর্ণ সুস্থ হবেন। ইনি এখনও দুর্বল; সুস্থ হতে সময় নেবেন।" ডাক্তার চলিয়া যাইতেই গুরুদাস মহারাজ স্বামী তুরীয়ানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, শরীর এত দুর্বল হওয়াতে তাঁহার মন দুর্বল হইয়াছে কি-না। তিনি বলিলেন, "না। মনের একটি অবলম্বন আছে।" গুরুদাস—"সেই অবলম্বন কি মা?" তিনি বলিলেন, "হাঁ, ঠিক বলেছ। সাধারণ লোকে মনকে দেহের সহিত অভিন্ন জ্ঞান করে। আমি দেখেছি, আমার মন আমার দেহ থেকে পৃথক। তারপর আর কিরূপে দেহকে মনের সহিত

১ ঠাকুর বুড়ী-চোর খেলার গল্প বলিতেন। উক্ত খেলায় বুড়ীকে ছুঁইলেই আর চোর হইতে হয় না। এই জগৎরূপ ক্রীড়াক্ষেত্রেও একবার ঈশ্বরদর্শন করিতে পারিলেই মানুষ সংসারের দুঃখকষ্ট হইতে চিরতরে মুক্তি পায়।

অভিন্ন ভাবতে পারি? আমার সঙ্কটময় অবস্থা আমি বুঝেছিলাম। কিন্তু আমার সেজন্য কোন ভয় বা দুশ্চিন্তা হয় নি।”

আমেরিকার শান্তি আশ্রমে স্বামী তুরীয়ানন্দ যে গীতাব্যাখ্যা করিতেন, গুরুদাস মহারাজ শ্রবণান্তে ঐগুলির সার লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। সেইগুলি উক্ত দিবস অন্য সময় তিনি হরি মহারাজকে পড়িয়া শুনাইলেন। তিনি উহা শ্রবণে আনন্দিত হইলেন। তারপর তিনি গুরুদাস মহারাজের নিকট তাঁহার কেদারনাথ-যাত্রার অভিজ্ঞতা এইভাবে বর্ণনা করিলেন: তিনি এবং অন্য দুই জন সাধু কয়েকদিন এই তীর্থযাত্রায় অনাহারী ছিলেন। তৎপর তাঁহারা তুষার-ঝড়ের মধ্যে পড়েন এবং ধ্যানে দেহত্যাগের জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অচিরে এক জীর্ণ কুটীর তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। উহাতে সাধুত্রয় রাত্রিযাপন করেন। পর দিবস তাঁহারা একটি গ্রামে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষা পান। গুরুদাস মহারাজ যখন আবার তাঁহার ঘরে আসিলেন, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ বলিতে লাগিলেন, “যা আমরা জানি তা আমাদের অন্ততঃ একবার কার্যে পরিণত করা উচিত। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যেকটি বিষয় তিনবার করে অভ্যাস করতেন। অভ্যাসের দ্বারা, সাধনের দ্বারা নূতন জ্ঞানলাভ হয়। কিছু সাধন কর, কিছু অভ্যাস কর। সাধন স্বভাবগত হলেই সিদ্ধি। বন্ধন ও মুক্তি দুই-ই মনে। আত্মা মনের অতীত।”

গুরুদাস প্রশ্ন করিলেন, “অনুভূতিবান পুরুষ কি অন্যায় কাজ করতে পারেন?” হরি মহারাজ বলিলেন, “কেহ কেহ বলেন, হাঁ, সিদ্ধ পুরুষেরাও প্রারব্ধ কর্মবশে অন্যায় কর্ম করে বসেন। কিন্তু তাঁদের পক্ষে ইহা পাপ নয়। তাঁরা অনাসক্ত। তাঁদের বেলায় কোন নূতন কর্ম সৃষ্ট হয় না। তাঁরা স্বেচ্ছামত কর্মে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হতে পারেন। তাঁরা

সদা মনের অধীশ হন, অধীন হন না। যদি মুক্ত পুরুষদের সঙ্গ করতে না পার তাঁদের চিন্তা কর। যাঁরা মনোজয়ী, তাঁদের সঙ্গলাভের জন্য যত্নবান হও। মনই মনকে বশ করে। পাঠে, গানে, ধ্যানে—বহু উপায়ে মনকে বশীভূত করা যায়। মনের গতি লক্ষ্য করলে মন সংযত হয়। ইন্দ্রিয়-সমূহ ও মনের উপর প্রভুত্ব কর। আমরা যেন সত্য ও শুভ বাক্য শ্রবণ করি। আমরা যেন শুদ্ধ ও সুন্দর বস্তু দর্শন করি। আমরা যেন দেহমনকে আত্মবশে রাখতে পারি। ওঁ তৎ সৎ।”

লাটু মহারাজের কথা উঠিল। সমবেত স্বামীজীদের মধ্যে একজন বলিলেন, “তিনি নিরক্ষর।” গুরুদাস বলিলেন, “কিন্তু তাঁর আধ্যাত্মিকতা অলৌকিক। তিনি শাস্ত্র অনুভব করেছেন। তিনি শাস্ত্রার্থজ্ঞ।” স্বামী তুরীয়ানন্দ বাধা দিয়া বলিলেন, “তিনি শুধু শাস্ত্রজ্ঞ নন, তিনি শাস্ত্রমূর্তি, বেদমূর্তি। তিনি ঠাকুরের সঙ্গ ও সেবা করেছেন।” সন্ধ্যার দিকে একদল তীর্থযাত্রী হরি মহারাজকে দর্শন করিতে আসিলেন। তন্মধ্যে একজন মন্তব্য করিলেন, “গুরু ব্যতীত ধ্যানাভ্যাস বিপজ্জনক।” হরি মহারাজ তাঁহার সঙ্গে একমত হইলেন না। তিনি বলিলেন, “গুরুর যথার্থ উপদেশ ব্যতীত প্রাণায়াম অনিষ্টকর হতে পারে, ধ্যান নয়। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানপদ্ধতি বর্ণিত আছে।” আর একজন তীর্থযাত্রী স্বামী তুরীয়ানন্দের পাশ্চাত্ত্য অভিজ্ঞতার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামীজী হাসিয়া বলিলেন, “পাশ্চাত্ত্য জড়বাদী, ভোগপরায়ণ। কিন্তু ওদেশে অনেক ভাল জিনিস আছে। ওখানে খাদ্য এদেশের চেয়ে অধিকতর পুষ্টিকর। রন্ধনাদি সব বিষয় বৈজ্ঞানিক উপায়ে সম্পন্ন হয়। স্বাস্থ্যরক্ষার ভাল ব্যবস্থা আছে। তারা সবল ও স্বাস্থ্যবান। মেয়েদের অনেক বেশী স্বাধীনতা আছে, তারা সবাই শিক্ষিতা। পাশ্চাত্ত্যে গোপনীয়তা সুরক্ষিত। তাদের পোশাকও কর্মজীবনের উপযোগী।

এদেশে সব কিছুই নিষ্ক্রিয়তার, নিশ্চেষ্টতার অনুকূল। আমরা তাদের মত উদ্যমশীল নই। পশ্চিম দেশে প্রত্যেকেই অনুচ্চ স্বরে কথা বলে এবং চাকরেরা আমাদের দেশের চেয়ে ভাল ব্যবহার পায়। এমন কি, সামান্য ভৃত্যও ভদ্র ব্যবহার পায়। ওদেশে কোন কর্মই নিন্দনীয় নয়। মানুষ মানুষই, তার বৃত্তি যাই হোক না কেন। কিন্তু সে সামাজিক নীতি বা শাসন মানতে বাধ্য। ওদেশে কেহ অস্পৃশ্য নয়। অস্পৃশ্যতা ঘৃণার্হ। ভাবুন, আমাদের দেশের নিম্ন জাতির লোকের সহিত আমরা কিরূপ ব্যবহার করি!"

তীর্থযাত্রীদের মধ্যে একটি তরুণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া স্বামী তুরীয়ানন্দের পরামর্শ চাহিল। তিনি উত্তর দিলেন, "ঈশ্বরচিন্তা কর। তিনিই তোমাকে সুমতি দেবেন।" জনৈক ব্রহ্মচারী হরি মহারাজের খাবার লইয়া ঘরে ঢুকিলেন। যাত্রিগণ প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। তিনি বাইবেলের এই বাক্যটি উদ্ধৃত করিলেন, "মানুষ শুধু আহার গ্রহণ করিয়াই বাঁচে না, কিন্তু ঈশ্বর-মুখ-নিঃসৃত বাক্য পালন করিয়াই বাঁচিয়া থাকে।" তারপর তিনি গুরুদাস মহারাজকে বলিলেন, "সক্রেটিশ সম্বন্ধে যে ছোট বইখানি তুমি আমাকে দিয়েছিলে সেটি খুব সুন্দর। ইহা তত আধ্যাত্মিকভাবপূর্ণ না হলেও সম্ভবতঃ সেই যুগের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। ইহা মানুষগড়ার শিক্ষা। যা স্বীয় জীবনে পালন করতেন তাই তিনি শিক্ষা দিতেন। তিনি একজন মহাপুরুষ ছিলেন এবং তাঁকেই দুনিয়া বধ করল!"

এক ব্যক্তি অপরের নিকট দুর্ব্যবহার পাইয়াছিল। তাহার সম্বন্ধে হরি মহারাজ বলিলেন, "তার দ্বেষ ছিল না। উহাই অদ্ভুত, উহাই খাঁটি খ্রীষ্টান ভাব। ইহা ব্রহ্মময়ীর কৃপা। তিনিই লোকটির হাত ধরে আছেন। সর্বদা মনে রেখো, যা আমাদের ভাগ্যে ঘটে তা আমাদের

মঙ্গলের জন্যই মা করেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মা তাকে রক্ষা করবেন। অবশ্য মাঝে মাঝে সেও ইহা অনুভব করত। কিন্তু সে ভাবত, ইহা তার দুর্বলতা মাত্র। অন্যের দুর্ব্যবহারে আমরা নিজেদের হতভাগ্য মনে করব কেন? প্রত্যেকেই সময়ে সময়ে দুর্বল হয় এবং তখনই আমাদের দুর্ভোগ ঘটে। যখন আমরা মায়ের কাছে থাকি, অন্যাবস্থায় যা দুঃখকর তা তখন তদ্রূপ হয় না। যারা আমাদের অনিষ্ট বা অন্যায় করে তাদের সম্বন্ধে আমাদের মন্দভাব পোষণ করা উচিত নয়। মায়ের উপর বিশ্বাস হারাবে না। বিশ্বাসই প্রকৃত বন্ধু ও রক্ষক। প্রত্যেকেই সময়ে সময়ে হতাশ হয়ে পড়ে, কিন্তু তা সকলে প্রকাশ করে না।"

পরে স্বামী তুরীয়ানন্দ গুরুদাস মহারাজকে বলিলেন, "যখন আমি তোমার কোন পত্র পাই তখন তোমার মানসিক অবস্থার একটি ছবি আমি মানসনেত্রে দেখি এবং অধিক চিন্তা না করেই যেন দিব্য প্রেরণার বশে উত্তর দিয়ে থাকি।" পরবর্তী দিবস স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী কল্যাণানন্দ প্রভৃতি সাধুগণ তাঁহার ঘরে গেলেন পাশ্চাত্ত্যে স্বামী বিবেকানন্দের কার্য সম্বন্ধে কথা উঠিল। স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "তিনি ছিলেন অত্যন্ত নির্ভীক। তিনি কোন আপস না করেই সর্বোচ্চ সত্য প্রচার করেছিলেন। তিনি কেবল দিতেন, প্রতিদান কিছু চাইতেন না। অপরে এক ফোঁটা দেয় এবং তার পরিবর্তে এক বাল্‌তি চায়।" স্বামী প্রেমানন্দ মন্তব্য করিলেন, "আমরা দু'জন মহাপুরুষকে দেখেছি—আমাদের ঠাকুর ও স্বামীজী। তাঁদের সঙ্গে অন্য কারো তুলনা হয় না।" স্বামী তুরীয়ানন্দ উক্ত মত সমর্থনপূর্বক কহিলেন, "যখন আমি সর্বপ্রথম ঠাকুরকে দেখি তখন তিনি শীর্ণ ছিলেন; কিন্তু তাঁর মুখমণ্ডল ভাস্বর ছিল। তিনি কলকাতায়

এলেন একটি ঘোড়ার গাড়ীতে। যখন তিনি গাড়ী থেকে নামলেন তখন মাতালের মত টলছিলেন। তখন তিনি সমাধিস্থ। আমি ভাবলাম ইনি কি পুনরাবির্ভূত শুকদেব? একবার তিনি সমাধি হতে ব্যুত্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আমি কে? আমি কোথায়?' তারপর তিনি কিছু খেতে চাইলেন। কিন্তু খাবার পূর্বেই পুনরায় সমাধিস্থ হলেন।"

ঠাকুর যেসকল বাংলা গান গাহিতেন তাহাদের কয়েকটি স্বামী প্রেমানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ উভয়ে একসঙ্গে গাহিলেন। তন্মধ্যে একটি গান সাধক কমলাকান্তের। গানটি এই—

"মজ্‌লো আমার মন-ভ্রমরা শ্যামাপদ-নীলকমলে।
যত বিষয়-মধু তুচ্ছ হ'লো কামাদি কুসুমসকলে॥
চরণ কালো ভ্রমর কালো, কালোয় কালো মিশে গেল।
পঞ্চতত্ত্ব প্রধান মত্ত রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে॥
কমলাকান্তের মনে, আশা পূর্ণ এত দিনে।
সুখদুঃখ সমান হলো আনন্দ-সাগর উথলে॥"

স্বামী প্রেমানন্দ ঠাকুরের গান করিবার ভাবভঙ্গীগুলি অনুকরণ করিয়া দেখাইলেন এবং বলিলেন, "ঠাকুর খুব সুন্দর গান করতে পারতেন। অপরে সুরপূর্ণ অথচ ভাবশূন্য গান করলে তিনি সহ্য করতে পারতেন না।"

বৈকালে হরি মহারাজ ভগিনী নিবেদিতার 'গুরুকে যেমনটি দেখিয়াছি' নামক ইংরেজী পুস্তকখানি পড়িতেছিলেন। গুরুদাস মহারাজ তাঁহার ঘরে ঢুকিতেই তিনি বইখানি একপাশে রাখিয়া বলিলেন, "মাকে সর্বভূতে দেখা, সকলকে সমানভাবে ভালবাসা এবং

সকলের সহিত সমানভাবে ব্যবহার করাই ভগবদ্দর্শন। সেই জ্যোতির্ময় পুরুষকে সকলের মধ্যে দর্শন করাই দিব্য জীবন।"

পরদিন প্রাতে হরি মহারাজের শরীর ভাল ছিল না। তাঁহার একটু জ্বর এবং দাঁতের ব্যথা হইয়াছিল। তিনি অসুস্থ অবস্থাতেই গুরুদাস মহারাজকে বলিলেন, "মা দয়া করেই দুঃখ দেন। এতে আমাদের কর্মক্ষয় হয়, কল্যাণ হয়। আমরা এত সুখপ্রিয় যে, ইহা হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম। একমাত্র তাঁর উপরই আমাদের নির্ভর করা উচিত, অন্য কিছুর বা কারও উপর নয়।" গুরুদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের বাহ্য অভাবের জন্যও কি তাঁর উপর নির্ভর করা উচিত?" তিনি উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "নিশ্চয়ই। প্রত্যেক বস্তুর জন্য। আমাদের শরীর, মন, প্রাণ মাতৃচরণে উৎসর্গীকৃত। তা না হ'লে আর কার উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত হতে পারি? তিনি এগুলি রক্ষণ বা গ্রহণ করুন—একই কথা। আমাদের ভাববার কি আছে? যা একবার সমর্পণ করেছি তা আবার ফিরিয়ে নিই কিরূপে? যিনি ইহা বুঝতে পারেন তিনিই ধন্য।"

স্বামী তুরীয়ানন্দ কনখলে বহুবার অবস্থান করেন। তথায় অবস্থান-কালে তিনি মহিম্নঃস্তোত্র নিত্য পাঠ করিতেন। উক্ত স্তোত্র তাঁহার অতি প্রিয় ছিল। মধুসূদন সরস্বতীকৃত টীকাসহিত এই স্তোত্র পাঠাইবার জন্য কনখল হইতে কোন ভক্তকে বোম্বাইতে তিনি লিখিয়াছিলেন।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের শেষে স্বামী তুরীয়ানন্দ কনখল হইতে বেলুড় মঠে আসেন এবং তথায় কিছুদিন থাকিয়া ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে পুরীধামে যান। পুরীতে তাঁহার বহুমূত্ররোগ প্রথম ধরা পড়ে। পুরীধামে স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে কয়েক মাস থাকায় তাঁহার শরীর ভাল হয়। সেবার পুরীর ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট অটলবিহারী মৈত্রের বাড়ীতে প্রতিমায় দুর্গাপূজা হয়। উহাতে বেলুড় মঠের জনৈক ব্রহ্মচারী পূজক এবং হরি মহারাজ প্রধান তন্ত্রধারক ছিলেন। উক্ত বৎসর জুন মাসে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ যখন চিকিৎসার্থ মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় আসিতেছিলেন, তখন হরি মহারাজ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর সহিত খুরদা রোড স্টেশনে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের শেষে তিনি বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসেন এবং পরবর্তী বৎসরের কয়েক মাস থাকেন। একদিন বেলুড় মঠে জ্ঞান মহারাজের ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া তিনি দেখিতেছিলেন, যুবক ব্রহ্মচারীরা গঙ্গা হইতে মাটি কাটিয়া আনিয়া মঠের নীচু জায়গাগুলি ভরাট করিতেছে। তাহা দেখিয়া তিনি ব্রহ্মচারীদের বলিয়াছিলেন, "তোমাদের অদ্ভুত energy and perseverance (উদ্যম ও অধ্যবসায়) দেখছি। এই energy (উদ্যম) যদি তোমরা ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য লাগাও, আমি বলছি তোমরা নিশ্চয়ই সিদ্ধ হবে। কিন্তু শুধু এই নিয়ে থাকলে একটি useful active (উপযোগী কর্মঠ) কুলীতে গিয়ে দাঁড়াবে।" তিনি দৈহিক কর্মের জন্য সাধুদের কাহাকেও বাহবা দিতেন না।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধে স্বামী তুরীয়ানন্দ বেলুড় মঠ হইতে

কাশীতে যান। স্বামী ব্রহ্মানন্দও তখন কাশীতে ছিলেন। কাশীতে উভয়ে একদিন বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা-দর্শনে গিয়াছিলেন। দেবতা-দর্শনে তাঁহারা এক পথে গেলেন, অন্য পথে ফিরিলেন। যে পথ দিয়া গেলেন সেই পথে একস্থানে সকলে জুতা রাখিয়া যান। অন্য পথে ফিরিয়া মহারাজ বলিলেন, 'জুতা ?' এই কথা শুনিয়াই হরি মহারাজ ব্রহ্মানন্দ মহারাজের জুতা আনিবার জন্য দ্রুতপদে চলিলেন। অবশ্য তিনি বেশীদূর অগ্রসর না হইতেই বিশ্বরঞ্জন মহারাজ ও সনৎ মহারাজ প্রভৃতি অন্য যাঁহারা সঙ্গে ছিলেন তাঁহারা ছুটিয়া যাইয়া তাঁহাদের জুতা আনিলেন। শেষবার যখন হরি মহারাজ কাশীতে ছিলেন তখন মহারাজও তথায় রহিয়াছেন। সেবককে লক্ষ্য করিয়া মহারাজ একদিন বলিলেন, "একটু জল দে ত; হাতটা ধুই।" সনৎ মহারাজ অবিলম্বে কমণ্ডলু আনিয়া মহারাজকে দিলেন, কিন্তু তাড়াতাড়িতে হাত মুছিবার জন্য তোয়ালেটি দিতে ভুলিয়া গেলেন। ইহা হরি মহারাজের দৃষ্টি এড়াইল না। অমনি তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তোয়ালে দিলে না? সব মন দিয়ে মহারাজের সেবা করবে। তিনি কখন কি আদেশ করেন তা শোনবার জন্য কান খাড়া করে থাকবে।" উপরি উক্ত ঘটনাদ্বয় হইতে প্রমাণিত হয় স্বামী ব্রহ্মানন্দের প্রতি হরি মহারাজের কি গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা ছিল।

কাশী হইতে স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে কনখলে যান। সেবার কনখল সেবাশ্রমে প্রতিমায় দুর্গাপূজা হয়। দুর্গাপূজার অঙ্গীভূত চণ্ডীপাঠ করিয়াছিলেন হরি মহারাজ। প্রায় সমস্ত চণ্ডীখানি তাঁহার মুখস্থ ছিল এবং বই না দেখিয়াই তিনি এক ঘণ্টায় সমগ্র চণ্ডীপাঠ করিতে পারিতেন। শাস্ত্রমতে এইরূপ চণ্ডীপাঠকই উত্তম। চণ্ডীপাঠে তাঁহার কত নিষ্ঠা ছিল তাহা একটি ঘটনা হইতে জানা যায়। ১৯২০

খ্রীঃ কাশীতে অবস্থানকালে দৈহিক অসুস্থতা ও দুর্বলতার জন্য তিনি চণ্ডীপাঠ করিতে পারেন নাই। তখন তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "এই বৎসর ব্যতীত আর কখনও নবরাত্রিতে চণ্ডীপাঠ ফাঁক গেছে বলে মনে পড়ে না।" কনখলে তিনি অনিদ্রাদিতে বিশেষ কষ্ট পাইতেছিলেন। কোন প্রকার চিকিৎসায় উপসর্গের উপশম না হওয়ায় ডাক্তার বন্ধুগণ তাঁহাকে আফিম-সেবনের পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি নশ্বর দেহের জন্য এই কুৎসিত অভ্যাসের বশবর্তী হন নাই। যিনি পরবর্তী জীবনে ক্লোরোফর্ম-আঘ্রাণ দ্বারা সংজ্ঞাহীন হইতে অস্বীকার পূর্বক অস্ত্রোপচারের অসহ্য যন্ত্রণা বরণ করিয়াছিলেন, তিনি অনিদ্রা দূরীকরণার্থ আফিম-সেবনে স্বীকৃত হইবেন কিরূপে?

স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য স্বামী তুরীয়ানন্দ কনখল হইতে দেরাদূনে যান। স্বামী ব্রহ্মানন্দ কাশী হইতে ব্রহ্মচারী কানাইকে তাঁহার সেবকরূপে পাঠান এবং এক পত্রে হরি মহারাজকে লিখেন, তিনি যেন দেরাদূনে একটি ছোট বাড়ী ভাড়া লইয়া স্বতন্ত্রভাবে গ্রীষ্মের কয়মাস অবস্থান করেন। ইহাতে যা খরচ হইবে তাহা মহারাজ স্বয়ং বহন করিবেন, এই প্রতিশ্রুতিও উক্ত পত্রে ছিল। কিন্তু হরি মহারাজ গুরুভ্রাতার অনুরোধে ব্যয়সাধ্য কর্মে প্রবৃত্ত হন নাই। তিনি দেরাদূনে একটি ভক্তের আলয়ে অবস্থান করিলেন। সেই ভক্তটি অনেককে হোমিও-প্যাথিক ঔষধ বিতরণ করিতেন। ভক্তটির অনুরোধে তিনি তাঁহার নিকট কিছুদিন হোমিও ঔষধ সেবন করিয়াছিলেন। ঔষধ-সেবনে ও বায়ু-পরিবর্তনে তিনি একটু সুস্থ বোধ করিলেন। শরীর অসুস্থ থাকিলেও তিনি সাধন-ভজনে ও শাস্ত্রপাঠে কখনও অবহেলা করিতেন না। ১৯১৪ খ্রীঃ ১৪ই এপ্রিল তিনি দেরাদূন হইতে কোন সাধুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মনোভাব সুব্যক্ত। উক্ত পত্রে তিনি

লিখেন, "শরীর ভাল থাকুক আর নাই থাকুক, তাঁকে ডাকতে যেন ভুল বা অবহেলা না হয়। কারণ 'দুঃখ জানে আর শরীর জানে মন তুমি আনন্দে থেকো'—এ ঠাকুরের উপদেশ। যে মনে করে যে, শরীর ভাল হোক, তারপর ভগবানকে ডাকব তার আর কোনকালে ভগবানকে ডাকা হবে না। ব্যাসদেব বলছেন—

য ইচ্ছতি হরিং স্মর্তুম্ ব্যাপারান্তর্গতৈরপি।
সমুদ্রে শান্তকল্লোলে স্নাতুমিচ্ছতি দুর্মতিঃ॥

অর্থাৎ যে মনে করে, এই গোলটা মিটে যাক্ তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে ভগবানকে স্মরণ মনন করব, তাহার দশা কিরূপ? যেমন কোন ব্যক্তি সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে ভাবছে, তরঙ্গগুলো থামুক, তারপর আমি স্নান করব। সমুদ্রে তরঙ্গথামা হতেই পারে না। সুতরাং তাতে স্নান কিরূপে হবে? যিনি তরঙ্গের মধ্যেই স্নান করে নিতে পারেন, তারই স্নান করা হবে। সেইরূপ যিনি সুখ-অসুখ, রোগ-শোক, দুঃখ-দারিদ্র্য প্রভৃতির মধ্যেই ভগবদ্‌ভজন করে নিতে পারেন, তাঁরই ভজন করা হবে। নচেৎ যে বলবে আগে সুযোগ আসুক তবে ভগবানকে ডাকব, তাঁর আর ভগবানকে ডাকা হবে না। কারণ জীবনে সম্পূর্ণ সুযোগ অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটে থাকে। রোগ-শোক, জ্বালা-যন্ত্রণা ত জীবনে লেগে থাকবেই। তাঁকে যে-কোন অবস্থাতেই হোক যে ডাকতে পারবে, তারই তাঁকে ডাকা হবে। নচেৎ হওয়া সুদুষ্কর।"

দেরাদুনে শরীর সুস্থ হইলে স্বামী তুরীয়ানন্দ পুনরায় তপস্যার্থ হৃষীকেশে গমন করেন। স্থানীয় নাথ ছত্র হইতে তাঁহার জন্য কাঁচা আহার্য আনিয়া সেবক পাক করিয়া দিতেন। তথায় অবস্থানকালে স্বামীজীর গ্রন্থাবলী তিনি বিশেষভাবে পুনরায় অধ্যয়ন করেন। কিছুদিন

তথায় থাকিয়া তিনি কনখল সেবাশ্রমে আসেন। সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক স্বামী কল্যাণানন্দকে তিনি অতি স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তাই শিষ্যস্থানীয় সন্ন্যাসীর সশ্রদ্ধ প্রার্থনা তিনি অগ্রাহ্য করিতেন না। কনখলে সেইবার গীতাভাষ্য-সমাপনান্তে তিনি বেদান্তদর্শনের অধ্যাপনা করেন। তিনি যেখানে থাকিতেন সেখানেই শাস্ত্রচর্চা ও সাধনভজনের স্রোত বহিত। সেবাশ্রমের লাইব্রেরীতে বসিয়া তিনি আশ্রমের সাধুব্রহ্মচারীদিগকে শাস্ত্রাদি পড়াইতেন। সেইবার বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণ স্বয়ং পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। রামায়ণের একস্থানে আছে, রাম বনবাসী ও ভরত রাজা হইয়াছেন। ভরত রামচন্দ্রের সন্দর্শনার্থ বনে গিয়াছেন। রাম ও ভরত পর পর ভরদ্বাজের আশ্রমে গিয়াছিলেন। মুনি রামকে আহারার্থ ফলমূল ও উপবেশনার্থ কুশাসন দিলেন; কিন্তু ভরতকে রাজভোগদানে সৎকার করেন। ইহা দেখিয়া লক্ষ্মণ মর্মাহত হন এবং ইহার কারণ রামকে জিজ্ঞাসা করেন। রামের নির্দেশে লক্ষ্মণ ভরদ্বাজকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে মুনি বলেন, 'অবস্থা পূজ্যতে রাজন্ ন শরীরঃ ক্বচিদপি।' অর্থাৎ অবস্থাই সর্বত্র পূজিত হয়, শরীর নহে। এই স্থানটি স্বামী তুরীয়ানন্দ মর্মস্পর্শিভাবে ব্যাখ্যা করিতেন। তাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যা যিনি শুনিতেন তিনিই মুগ্ধ হইতেন। শাস্ত্রব্যাখ্যারত তুরীয়ানন্দজীকে দেখিলে বৈদিক ঋষি বলিয়া মনে হইত। ১৯১৪ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে হরি মহারাজ স্বামী ব্রহ্মানন্দের আহ্বানে কালীপূজা দেখিবার জন্য কনখল হইতে কাশীতে আসেন এবং তথায় মার্চ মাস পর্যন্ত ৫।৬ মাস অবস্থান করেন।

স্বামী শিবানন্দের প্রীতিপূর্ণ আহ্বানে স্বামী তুরীয়ানন্দ ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল কাশীধাম হইতে একজন গুরুভ্রাতার সহিত আলমোড়ায় গমন করেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন সেবক ব্রহ্মচারী কানাই। বহুমূত্র

রোগের উপশম এবং স্বাস্থ্যোন্নতিলাভ ছিল তাঁহার আলমোড়াযাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য। তথায় তাঁহার অবস্থানকালে স্বামী শিবানন্দের উদ্যম ও উৎসাহে একটি আশ্রমনির্মাণকার্য আরম্ভ হয় এবং শিবানন্দজীর অনুপস্থিতিতে স্বামী তুরীয়ানন্দ উহা সমাপ্ত করেন। এই আশ্রম-নির্মাণ সম্বন্ধে উভয়ে আগ্রহান্বিত ছিলেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত হরি মহারাজ আলমোড়ায় আসিয়াছিলেন। তখন স্বামীজী তাঁহাকে স্বীয় ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে অন্তরের অনেক কথা বলিয়াছিলেন। সেই সময় স্বামীজী তাঁহাকে ইহাও বলিয়াছিলেন যে, কোন কোন গুরুভ্রাতা এই সম্বন্ধে তাঁহাকে ভুল বুঝিতেছেন। আলমোড়ায় একটি আশ্রমস্থাপনও স্বামীজীর আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ছিল। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে আলমোড়ায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার স্বতঃই মনে হইল, কলম্বো হইতে আলমোড়া পর্যন্ত স্বামীজী বেদান্ত প্রচার করিলেন এবং 'প্রবুদ্ধ ভারত' কার্যালয়ও আলমোড়ায় প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং এখানে তাঁহার শুভাগমনের স্মৃতিচিহ্নরূপে একটি আশ্রম হওয়া উচিত। আলমোড়া প্রায় ছয় হাজার ফুট উচ্চ পর্বতের উপরে অবস্থিত জেলা শহর এবং কৈলাস ও মানসসরোবর-যাত্রার দ্বারস্বরূপ। উহার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য সুমনোহর। এখান হইতে চিরতুষারাবৃত হিমালয়শ্রেণী চর্মচক্ষুর দৃষ্টি-গোচর হয়।

স্বামী তুরীয়ানন্দ ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে আলমোড়া হইতে একটি ভক্তকে লিখিয়াছিলেন, "স্বাস্থ্য এখানকার সব সময়েই ভাল। তবে শীতকালে খুব ভাল থাকে, গ্রীষ্মকালেও ভাল। শীত এখানে খুব বেশী, গ্রীষ্মকালে এস্থান অতি মনোরম। অনেকেই সে সময় এখানে আসিয়া থাকেন। পথে অত্যন্ত কষ্ট হয়, সন্দেহ নাই। তবে

এখানে আসিয়া পড়িলে সকল কষ্ট দূর হয়—পর্বতীয় শোভা দর্শন করিয়া এবং সর্বোপরি বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিয়া। কাশী হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানের ন্যায় ইহার শাস্ত্রীয় প্রখ্যাতি বিশেষ আছে বলিয়া জানি না। তবে ইহা হিমালয়ের মধ্যে উত্তরাখণ্ড প্রদেশ, হরপার্বতীর স্থান। স্বামীজীর স্মৃতির জন্য এস্থান আমাদের বড় আদরের, সন্দেহমাত্র নাই।"

গুরুভ্রাতৃদ্বয় আলমোড়া যাইয়া প্রথমে উঠিলেন শহরে চিল্কাপিটায় বড় রাস্তার নীচে চিড় জঙ্গলের পাশে স্বামী শিবানন্দের পরিচিত লালা বদ্রিসার বাংলোতে। বদ্রিসারা পরম ভক্ত হইলেও তখন অর্থকষ্টে পড়িয়াছিলেন। সেজন্য গুরুভ্রাতৃদ্বয় বিনা ভাড়ায় বৃহৎ বাংলোটি অধিকার করিতে সঙ্কুচিত হইলেন। উক্ত বাংলোর নাম ছিল চিল্কাপিটা হাউস। তাঁহারা উহার আউট হাউসে উঠিয়া গেলেন এবং নিজ ব্যয়ে উহার পার্শ্বে একটি পায়খানা ও স্নানাগার নির্মাণ করাইলেন। পূর্বে বহুবার তাঁহার এবং তাঁহাদের অন্যান্য গুরুভ্রাতা আলমোড়া শহরের অন্য প্রান্তে পাতালদেবীতে থাকিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। স্থানটি তপস্যা ও স্বাস্থ্যের বিশেষ অনুকূল বলিয়া তাঁহারা তথায় একটি আশ্রম-স্থাপনের সংকল্প করিলেন। স্বামী শিবানন্দের প্রচেষ্টায় ক্ষুদ্র একখণ্ড জমি সংগৃহীত হইল এবং বদ্রিসার ভাই মনোহরলালও আশ্রমের গৃহনির্মাণাদি কার্যের তত্ত্বাবধায়ক হইতে প্রস্তুত হইলেন।

তখন রেঙ্গুনের হেল্‌থ অফিসার ডাঃ ডিমেলো বায়ুপরিবর্তনার্থ আলমোড়ায় বাস করিতেছিলেন। ডাঃ ডিমেলো গোয়াবাসী খ্রীষ্টান হইয়াও হিন্দু-ভাবাপন্ন ছিলেন এবং গীতাদি হিন্দুধর্মশাস্ত্র পাঠ করিতেন। হরি মহারাজের পূতস্পর্শে আসিবার পর তাঁহার জীবনে বিশেষ পরিবর্তন ঘটে এবং তিনি তাঁহার পরম ভক্ত হইয়া যান। তিনি হরি মহারাজের শুভসঙ্কল্প জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বাটীনির্মাণের জন্য তিনশত

টাকা দেন। ডাঃ ডিমেলো পরে পুরীতে ও কাশীতে হরি মহারাজের পূতসঙ্গলাভে ধন্য হন এবং তৎপ্রভাবে সংসারত্যাগ-পূর্বক রামকৃষ্ণ সংঘে ব্রহ্মচারী হইয়াছিলেন এবং কাশীধামে প্রায় তিন বৎসর হরি মহারাজের সঙ্গে থাকিয়া ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। আশ্রমের গোড়াপত্তন করিয়া এবং গৃহনির্মাণার্থ অর্থসংগ্রহের প্রতিশ্রুতি দিয়া স্বামী শিবানন্দ নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে শ্যামাপূজা দেখিবার জন্য কাশীধামে আসিলেন। ক্রীত জমির উপর আশ্রম-গৃহ-নির্মাণকালে হরি মহারাজ চিন্তাপিটা হাউস হইতে সকালে বিকালে যাইয়া ভীষণ রৌদ্রে ছাতা মাথায় দিয়া সকল কার্য পরিদর্শন করিতেন।

এই কার্যে তিনি কত ব্যস্ত থাকিতেন নিম্নোক্ত পত্রাংশ হইতে জানা যায়।—"শ্রীরামকৃষ্ণ কুটীরের নির্মাণকার্য লইয়াই সর্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয়। একটি পায়খানা তৈয়ার হইতেছে। উহা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। আবার কুটীরের সম্মুখে যে মাঠ আছে, তাহাতে এবার প্রাচীর তুলিতে হইবে। নহিলে, বর্ষায় যদি উহা ধ্বসিয়া যায় তাহা হইলে ইমারতের বিশেষ ক্ষতি হইবে। সুতরাং উহা উপেক্ষা করিবার যো নাই। যত শীঘ্র হয় ইহা করিতে হইবে। আরও কত কাজই বাকী রহিয়াছে। প্রভুর ইচ্ছায় ক্রমে সেসব হইবে।··· যদি এই কুটীর নির্মিত হওয়ায় কাহারও উপকার হয় তাহা হইলে শ্রম সফল হইবে। স্থানটি ছোট হইলেও বেশ সুন্দর হইয়াছে।"

সেবক ব্রহ্মচারী কানাই তাঁহার গর্ভধারিণীকে দেখিবার জন্য আলমোড়া হইতে দুইবার কাশী আসিলেন। তখন স্বামী শ্যামানন্দ, স্বামী রাঘবানন্দ প্রভৃতি সাধুগণ কিছুকাল হরি মহারাজের সেবা করিয়াছিলেন। সেই সময় হরি মহারাজ যেসকল ধর্মপ্রসঙ্গ করিতেন তাহার কিয়দংশ স্বামী রাঘবানন্দ লিখিয়া রাখিয়াছেন। আশ্রমগৃহের

জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহের প্রচেষ্টা প্রধানতঃ স্বামী শিবানন্দই করিতেন ; হরি মহারাজ কাহারও নিকট টাকা চাহিতেন না। অর্থ-ভিক্ষা করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। তবে আশ্রমগৃহের নির্মাণকার্য কতদূর অগ্রসর হইতেছে তাহা ভক্তদের নিকট সবিস্তারে জানাইতেন। ইহাতেই টাকা আসিত। রামকৃষ্ণ কুটীরের নির্মাণকার্য সমাপ্ত করিবার জন্য হরি মহারাজ কত চিন্তিত থাকিতেন তাহা মহাপুরুষজীকে লিখিত নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশ হইতে জানা যায়।—"এ মাসে কুটীরের জন্য খরচ আসে নাই বলিয়া মোহনলাল স্ফূর্তিহীন। কাজকর্মে তত উৎসাহ নাই। প্রায় চারমাস হইয়া গেল এখনও কুটীরের বিশেষ কিছু হইল না ; আরও দুই-এক মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ হইবে কিনা সন্দেহ। ...একশত টাকা নিজের কাছ থেকে দিয়ে কাঠের দেনা শোধ করিয়াছে। এখন যেমন টাকা পাইবে সেইরূপ কাজ করিবে, এইরূপ ভাব। আমি কিছুই বলি না। যেমন করে করুক। আমরা উহাকে আজ পর্যন্ত ছয়শত টাকা দিয়াছি। করোগেট শিট প্রভৃতিতে ভুবনরা দুইশত একত্রিশ টাকার বিল দিয়াছে। করোগেট শিট প্রভৃতির জন্য রেলভাড়া ও মুটে খরচ বাবদ প্রায় পঞ্চাশ টাকা লাগিয়াছে। যেরূপ কাজ এখনও হইবে তাহাতে আরও তিনশত টাকা খরচ করিলে কুটীর বাসোপযোগী হইতে পারিবে। প্রভুর ইচ্ছায় যেমন হয় হইবে।" মোহনলালই প্রধানতঃ কুটীরের নির্মাণকার্য তত্ত্বাবধান করিতেন। গৃহনির্মাণ সমাপ্ত হইলে স্বামী প্রেমানন্দকে হরি মহারাজ এই সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "মোহনলাল, গাঙ্গী সা কত পরিশ্রম ও উদ্যোগ করিয়া এ কাজটি সম্পন্ন করিয়াছে। তাহারা এইরূপ না করিলে কিছুতেই ইহা সম্পন্ন হইত না।"

স্বামী তুরীয়ানন্দের যে একশত নব্বইখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে পঁচাত্তরখানি ১৯১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দে আলমোড়া হইতে লিখিত।

সেই পত্রগুলি পড়িলে আলমোড়ায় অবস্থানকালে তাঁহার মনোভাবের সহিত পরিচিত হওয়া যায়। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে মে শ্রীরামকৃষ্ণ কুটীরে পূজা-হোমাদি করিয়া হরি মহারাজ গৃহপ্রবেশ করেন। তাঁহার সময়ে আশ্রমে উপরে দুইটি ঘর এবং নীচে দুইটি ঘর এবং ভৃত্যদের জন্য একটি ঘর নির্মিত হয়। কুটীরপ্রতিষ্ঠার পর তিনি কোন ভক্তকে জুন মাসে লিখিয়াছিলেন, "আলমোড়ায় প্রভুর স্থান ছিল না। স্বামীজীর কৃপায় এই স্থানের এত প্রসিদ্ধি। মিশনের একটি নিজের জায়গা হওয়ার প্রয়োজন ছিল। প্রভুর কৃপায় তাহা হইল। ইহাতে অনেকের উপকার হইবে মনে হয়।" উক্ত বৎসর পূজার সময় নবরাত্রিতে তিনি রামকৃষ্ণ কুটীরে চণ্ডীপাঠ এবং মহানবমীর দিন একটু হোম ও অর্চনা করিয়া ও অল্পস্বল্প ভোগরাগ দিয়া মহামায়ার পূজা করেন।

স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য স্বামী তুরীয়ানন্দ আলমোড়ায় যাইলেও আশ্রম-প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহাকে খুব খাটিতে হইয়াছিল। সেইজন্য তথায় তাঁহার স্বাস্থ্য আশানুরূপ ভাল হয় নাই। ১৯১৬ খ্রীঃ মার্চ মাসে তাঁহার শরীর খুব খারাপ হইয়াছিল। সেই সময় কোন ভক্তকে তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমার জ্বর হইয়া কয়েকদিন হইতে কষ্ট দিতেছে। তারপর দক্ষিণ স্কন্ধে একটা বেদনার মত হইয়া নেহাৎ ব্যথিত করিয়াছে। ঠাণ্ডা লাগিয়া বোধ হয় এই বেদনা হইয়া থাকিবে। আজকাল এখানে বেলা দশটার পর বেশ গরম হয়, আবার সন্ধ্যায় ঠাণ্ডা আরম্ভ হইয়া পরদিন সকাল তক বেশ ঠাণ্ডা থাকে। সুতরাং বেশ সাবধান না থাকিলে ঠাণ্ডা লাগিয়া অনেকেরই এইরূপ ব্যথা হইয়া থাকে। আজ একটু ব্যথা কম। জ্বরও তেমন ভেড়েফুঁড়ে হয় না। ঘুসঘুসে জ্বর একদিন অন্তর হয়। এইরূপে চার-পাঁচটা আক্রমণ হইয়া গিয়াছে। আর প্রস্রাবের উপদ্রব তো আছেই। প্রভুর ইচ্ছা যেমন হয় হইবে।

ইহা ছাড়া আমাদের আর বলিবার কিছু নাই। স্থানপরিবর্তন করিতে পারিলে বোধ হয় ভাল হইত। কিন্তু কলিকাতা অঞ্চলে যাইবার আর সময় নাই, অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। নীচে এখন অত্যন্ত গরম। শরীর খুব দুর্বল না হইলে মায়াবতী যাইতে চেষ্টা করিতাম। যেমন হয় হইবে।”

স্বামীজীর মার্কিন শিষ্য এফ. আলেকজাণ্ডার ফ্রাঙ্ক হরি মহারাজের পূত সঙ্গলাভের জন্য মায়াবতী হইতে আলমোড়ায় আসিয়া নবনির্মিত আশ্রমে কিছুদিন ছিলেন। তিনি সেখান হইতে লক্ষ্ণৌ ও কলিকাতা হইয়া আমেরিকা ফিরিয়া যান। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে স্বামী প্রেমানন্দ বেলুড় মঠের বহু সাধুর স্বাক্ষরসহ বিস্তৃত পত্র স্বামী তুরীয়ানন্দকে লিখিয়াছিলেন মঠে আসিবার জন্য। হরি মহারাজ বাবুরাম মহারাজের পত্র পাইয়া পাহাড় হইতে নামিয়া আসিতে সম্মত হন। স্বামীজীর মার্কিন শিষ্যা মিস্ জোসেফাইন ম্যাকলিয়ডের অনুরোধে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ মায়াবতী হইতে আলমোড়ায় আসেন এবং তথা হইতে ৫ই ডিসেম্বর হরি মহারাজকে লইয়া লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হন। লক্ষ্ণৌতে তিন দিন থাকিয়া হরি মহারাজ কাশীতে আগমন করেন। তখন কাশীতে স্বামী প্রেমানন্দ ও শিবানন্দ ছিলেন। কাশীতে আসিয়া হরি মহারাজ আমাশয়, গলাব্যথা, পায়ে বাত প্রভৃতিতে খুব কষ্ট পান।

স্বামী প্রেমানন্দ হরি মহারাজের শরীর অসুস্থ দেখিয়া বলিলেন, “দুই-এক দিন দেরী করে একটু সুস্থ হয়ে এলে না কেন ?” হরি মহারাজ সহাস্যে উত্তর দিলেন, “আমার আর কি, আপনাদের হুকুম তামিল করেছি।” কাশীতে কিছুদিন থাকিয়া তিনি স্বামী শিবানন্দের সহিত ২৫শে জানুয়ারী মিহিজামে আসেন। পথে উভয়ে জামতাড়া স্টেশনে নামিয়া আশ্রমের জন্য প্রস্তাবিত জমি পরিদর্শন করেন। মিহিজামে

তাঁহারা ভূষণ বাবু ও ভুবন বাবুদের ভাড়া বাড়ীতে থাকিতেন। চন্দন-নগরের ভূষণ পাল এবং বরাহনগরের ভুবন দাস শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে মিলিতভাবে বাড়ী ভাড়া করিয়া বায়ুপরিবর্তনের জন্য তখন মিহিজামে থাকিতেন। তাঁহারা আলমোড়ায় রামকৃষ্ণ কুটীর-নির্মাণের জন্য কিছু টাকা দিয়াছিলেন এবং জিনিসপত্র কিনিয়া পাঠাইতেন। হরি মহারাজের কোন কোন পত্রে তাঁহাদের নাম ও প্রশংসা দেখা যায়। তাঁহাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে হরি মহারাজ কিছুদিন জামতাড়ায় থাকিতে সম্মত হন। তাঁহাদের একটি বাহিরের ঘরে সাধুদ্বয় থাকিতেন। হরি মহারাজ বাড়ীর লোকদের সহিত, বিশেষতঃ ছেলে-মেয়েদের সহিত আত্মীয়ভাবে মিশিতেন। তিনি কখন গুরুভ্রাতার সহিত, কখন বা একাকী বেড়াইতে যাইতেন এবং পথে সাঁওতাল ছেলেদের সহিত কথা বলিতেন।

সেই সময় স্বামী সুবোধানন্দ রাঁচি হইতে আসিয়া মিহিজামে ছিলেন। তখন সাঁওতালদের গ্রামে সরস্বতীপূজা হইয়াছিল। স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রভৃতি সকলে সেই পূজা দেখিতে গিয়াছিলেন। মিহিজাম হইতে হরি মহারাজ একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন, "ভুবন-ভূষণদের যত্নও অপরিসীম। স্থানটি বেশ নির্জন, মনোহর ও স্বাস্থ্যকর। তবে আমার বিশেষ উপকারবোধ এখনও কিছু হয় নাই। বোধ হয় কাশীতে ইহাপেক্ষা ভাল ছিলাম।" মিহিজামে প্রায় তিন সপ্তাহ থাকিয়া হরি মহারাজ ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যভাগে শিবরাত্রির পূর্বে বেলুড় মঠে আসেন। সেইবার শিবরাত্রিতে বেলুড় মঠে স্বামী প্রেমানন্দ ও স্বামী শিবানন্দ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন এবং অন্যূন পঞ্চাশ জন উপবাসী ব্রতী সমস্ত রাত্রি শিবের পূজা, স্তব, ভজনগানে জাগ্রত থাকিয়া প্রহরে প্রহরে মহাদেবের যথাশাস্ত্র ও ভক্তিপূর্ণ পূজনাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সেই

সম্বন্ধে হরি মহারাজ কোন ভক্তকে লিখিয়াছিলেন, "এখানে শিবরাত্রিতে বড়ই আনন্দ হইয়া গিয়াছে।… সে দিব্য দৃশ্য না দেখিলে বুঝা সুকঠিন।" বেলুড় মঠে প্রায় ৩॥০ মাস থাকিয়া তিনি ৩রা জুন পুরীধামে গমনপূর্বক তথায় 'শশি-নিকেতনে' স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিত অবস্থান করেন।

পুরীধামে

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে বেলুড় মঠ হইতে স্বামী তুরীয়ানন্দ পুরীধামে গিয়াছিলেন স্নানযাত্রার পূর্বে। যথাসময়ে তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা দর্শন করেন। এবার পুরীতে যাইয়া তিনি সমুদ্রস্নান আরম্ভ করেন। কিন্তু কয়েক দিন সমুদ্রস্নানের ফলে তাঁহার কান পাকিয়া উঠে। তাই তাঁহাকে সমুদ্রস্নান বন্ধ করিতে হয়। উক্ত বৎসরের শেষে বহুমূত্র রোগের ফলে তাঁহার রক্ত বিষাক্ত হয় এবং গাত্রে ফোড়া উঠে। ডাক্তার উক্ত ফোড়াকে বিস্ফোটক বলিয়া ঘোষণা করেন। উহার উপর অস্ত্রোপচার করিতে হয়। এইজন্য স্বামী সারদানন্দ ডাঃ দুর্গাপদ ঘোষকে লইয়া অক্টোবরের শেষে পুরীধামে গমন করেন। গুরুদাস মহারাজ এবং রেঙ্গুনের ডাক্তার ডিমেলো প্রভৃতিও সঙ্গে গিয়াছিলেন। বিলাতফেরৎ ডাক্তার এম. বি মিত্র অস্ত্রোপচার করেন। যদিও উহা খুব গভীর ছিল, তথাপি হরি মহারাজের নির্দেশে অস্ত্রোপচার ক্লোরোফরম ব্যতীত নিষ্পন্ন হয়।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ সদলবলে মাদ্রাজ হইতে পুরীধামে আসিয়া 'শশি-নিকেতন'-এ অবস্থান করিতেছেন। স্বামী তুরীয়ানন্দও তখন উক্ত ভবনে ছিলেন। তখন কলিকাতা হইতে জনৈক ভক্ত স্বামী ব্রহ্মানন্দের

নিকট একটি রেলওয়ে পার্শেল পাঠাইয়াছেন। স্বামী শঙ্করানন্দ স্বামী প্রভবানন্দকে রেলওয়ে রসিদটি দিয়া বলিলেন, "যাও, রেলওয়ে স্টেশনে।" স্বামী প্রভবানন্দ রসিদ লইয়া স্টেশনে চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "তাইত, জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেলুম, রসিদ নিয়ে কাকে দিতে হবে বা কি করতে হবে।" এই ভাবনা লইয়া রাস্তা দিয়া তিনি চলিতেছিলেন, এমন সময় ব্রহ্মচারী শ—এর সঙ্গে দেখা হইল। তাঁহাকে রসিদটি দেখাইয়া স্বামী প্রভবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, তুমি ত এসব কাজ কর। কি করতে হবে বল ত?" ব্রহ্মচারী বলিলেন, "রসিদটি স্টেশন মাস্টারকে দেবে। তারপর পার্শেলটি এলে স্টেশন মাস্টার পাঠিয়ে দেবেন।" তদনুযায়ী স্বামী প্রভবানন্দ স্টেশন মাস্টারকে রসিদটি দিয়া 'শশি-নিকেতনে' ফিরিলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ উদ্‌গ্রীব হইয়া পার্শেলটির জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে শূন্য হাতে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া বকুনি আরম্ভ করিলেন। সারাদিন এইভাবে তাঁহার বকুনি চলিল। রাত্রে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ আহারে বসিয়াছেন বাহিরের বারান্দায়। স্বামী প্রভবানন্দ তাঁহাদের কাছে থাকিয়া পাখা দিয়া পোকা মাছি তাড়াইতেছিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ পুনরায় পার্শেলটির কথা তুলিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ হাস্যমুখে স্বামী প্রভবানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অবনী, তুমি বুঝতে পারছ মহারাজ কেন তোমাকে বকছেন?" স্বামী প্রভবানন্দ উত্তরে বলিলেন, "না মহারাজ, আমি ত বুঝতে পাচ্ছি না কি দোষ হয়েছে।" তখন স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "দেখ, শিষ্য তিন প্রকার। উত্তম শিষ্য গুরুর মনে চিন্তা উদিত হবার পূর্বেই গুরুর মন বুঝতে পেরে তা পূর্ণ করে। মধ্যম শিষ্য গুরুর অব্যক্ত মনোভাব বুঝতে পেরে তা পূর্ণ করে। আর অধম শিষ্য গুরু আদেশ

ব্যক্ত করলে তা পালন করে। মহারাজ চান যে, তোমরা উত্তম শিষ্য হও।" স্বামী প্রভবানন্দ চুপ করিয়া আছেন। তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বামী তুরীয়ানন্দকে বলিলেন, "হরিভাই, আমি বুড়ো হয়ে গেছি। তাই এরা আমার কথা শোনে না। আপনি এদের একটু বুদ্ধিশুদ্ধি দিন।"[১]

পুরীধামে অবস্থানকালে স্বামী তুরীয়ানন্দ একদিন ৺জগন্নাথদেব-দর্শনে যান। অরুণস্তম্ভের পাশ দিয়া তিনি সিঁড়িতে উঠিতেছিলেন। এমন সময় দেখিলেন সিঁড়ির অন্য পাশ দিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নামিতেছেন। গলায় ফুলের মালা এবং দেহে সাধারণ জামাকাপড়। ঠাকুরকে দেখিবামাত্রই তিনি ছুটিয়া গিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। কিন্তু যখন তিনি প্রণামান্তে ঠাকুরের পাদস্পর্শ করিবার জন্য হাত বাড়াইলেন তখন ঠাকুর অদৃশ্য হইলেন! ইহাতে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। মনে পড়িল, ঠাকুর ত সশরীরে নাই! যাঁহাকে তিনি দর্শন করিতে মন্দিরে যাইতেছিলেন তিনি পূর্বেই তাঁহাকে কৃপাপূর্বক দর্শন দিলেন। হরি মহারাজ অনুভব করিলেন, ৺জগন্নাথদেবই রামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এইজন্যই বোধ হয় ঠাকুর পুরী যান নাই। তিনি বলিতেন, পুরী গেলে তাঁহার শরীরত্যাগ হইবে।

পুরীধামে রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় হরি মহারাজ এক রাত্রে এক দিব্যদর্শন লাভ করেন। রাত্রি দুটা-তিনটার সময় তিনি জাগ্রত আছেন। দেখিলেন, স্বামীজী আসিয়া বলিতেছেন, "হরিভাই, চল আমার সঙ্গে। এখনি চল।" হরি মহারাজ তাড়াতাড়ি উঠিয়া স্বামীজীর পশ্চাদ্‌গমন করিলেন। স্বামীজী এত জোরে যাইতেছিলেন যে, হরি মহারাজ তাঁহাকে ধরিতে বা তাঁহার পাশাপাশি যাইতে পারিতেছিলেন না, দুই-তিন পা পেছনে ছিলেন। এইভাবে উভয়ে

১ ঘটনাটি স্বামী প্রভবানন্দ-কথিত এবং 'উদ্বোধনে' (কার্তিক, ১৩৩৫) প্রকাশিত।

সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী সমুদ্রে নামিলেন। হাঁটুর উপর জল হইল। হরি মহারাজও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে জলে নামিলেন। এমন সময় একটি নৌকা আসিল। স্বামীজী নৌকায় উঠিয়া অদৃশ্য হইলেন। হরি মহারাজ আর নৌকায় উঠিতে পারিলেন না। তিনি বিষণ্নমনে ফিরিয়া আসিলেন। সেবকের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামীজীকে দেখলে ? এই যে তিনি এসেছিলেন।" সেবক বলিলেন, "আমি দেখি নাই।" ব্যাপারটি বুঝিয়া তিনি অন্য প্রসঙ্গ তুলিলেন।

সেই সময় পুরীধামে হরি মহারাজের আর একটি অলৌকিক দর্শন হইয়াছিল। এক রাত্রে দুইটা-তিনটার সময় তিনি দেখিলেন, কে তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিল। শরীরের মধ্যে যিনি আছেন তাঁহার সঙ্গে নবাগতের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। অনেকক্ষণ সংগ্রামের পর অনধিকারপ্রবেশকারী পরাজিত ও দেহ হইতে বিতাড়িত হইল। হরি মহারাজ অর্ধ-জাগ্রত অবস্থায় স্পষ্ট দেখিলেন শত্রুর প্রবেশ, সংগ্রাম ও পলায়ন। পলায়িত শত্রুকে দেখাইয়া হরি মহারাজ সেবককে বলিলেন, "এই দেখ, বেরিয়ে গেল।" সেবক বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করাতে তিনি ঘটনাটির বর্ণনা দিয়া বলিলেন, "এবার শরীর যাবে না। ঠাকুরের কৃপায় আক্রমণকারী রোগ বিতাড়িত হইল। আরও কিছুদিন শরীর থাকবে। একথা কাহাকেও বলিও না।" উপরি উক্ত অলৌকিক দর্শনবর্ণনান্তেও তিনি এই মন্তব্য করিয়াছিলেন। এই দর্শনদ্বয়ের পর সকলের আশঙ্কা তিরোহিত হইল এবং তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

উপরি উক্ত অনুভূতির কথা হরি মহারাজ বহুবার কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন। তৎপ্রদত্ত দুইটি বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইহা হইতে অনুভূতির গভীরার্থ উদ্‌ঘাটিত হইবে। প্রথমটি বর্ণনাত্মক ও আলমোড়ায়

প্রদত্ত, এবং দ্বিতীয়টি ব্যাখ্যামূলক ও কাশীধামে ১৯২০ খ্রীঃ কথিত।
(১) "পুরীতে একদিন দেখলাম, দেহের ভিতরের প্রাণটা বাহিরের আর একটা শক্তির সঙ্গে তুমুল লড়াই করছে। দুজনে অনেকক্ষণ খুব হুটোপাটি করলে। একবার এ জিতছে, আর একবার ও। বাইরের শক্তিটা চাইছে প্রাণটাকে দেহের ভিতর থেকে নিয়ে চলে যেতে, কিন্তু প্রাণ যেতে চাচ্ছে না। শেষে দেখলাম, বাইরের শক্তিটা হেরে চলে গেল। কাজেই প্রাণটা দেহের ভিতরেই রয়ে গেল। কিন্তু লড়াইয়ে হারলে প্রাণকে তার সঙ্গে যেতে হত। তখন এদিকে দেহটা পড়ে থাকত, আমার মৃত্যু হত। আমি অবাক্ হয়ে যেন দূর থেকে এই লড়াই দেখলুম। ওটা হেরে চলে যেতেই আমি ওদের ডেকে বললাম, 'ওরে, এবার বেঁচে গেলুম, এবার মরব না।'"
(২) "মৃত্যুকালে বাইরের একটা শক্তি অন্তরের শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে। এই শক্তিদ্বয় পৃথক নয়, একটি বৃত্তের মধ্যে অন্য একটি বৃত্তের মত। বড় বৃত্তটা ছোট বৃত্তকে ভেঙ্গে ফেলতে চায়। আমি যখন পুরীতে একবার মরমর হয়েছিলাম, তখন এটা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম—যেন ঘরের ভিতর এক পা, বাইরে এক পা। দুই দিকই দেখতে পাচ্ছি।"

পুরীতে জগন্নাথদেবের মন্দিরে দেবদর্শনে গিয়া একদিন তাঁহার কাণে হঠাৎ একটা গম্ভীর আওয়াজ আসে। আওয়াজ শুনিয়া তাঁহার হৃদয় এত উল্লসিত হইল যে, হাওয়ার উপর দিয়া হাঁটিতে ইচ্ছা করিল। এই সম্বন্ধে তিনি নিজে বলিয়াছিলেন, "আওয়াজটা কখনও গমগম করিল, কখনও বা একটা সুরের ভিতর আর একটা সুর বাজিয়া উঠিল। সুরের বৈচিত্র্য ও মাধুর্য সমস্ত মনটাকে মোহিত করিল। তারপর মনে হইল, শাস্ত্রে যে অনাহত ধ্বনির কথা আছে ইহা তাহাই।"

সত্যই সেদিন স্বামী তুরীয়ানন্দ জগন্নাথমন্দিরে অনাহত ধ্বনি শুনিয়াছিলেন। ঠাকুরও এইরূপ অনাহতধ্বনি শুনিতে পাইতেন। প্রত্যেক মানবহৃদয় এবং সমগ্র বিশ্ব হইতে এই অনাহতধ্বনি সর্বদা উঠিতেছে। ধ্যানীর ইহা কর্ণগোচর হয়। গ্রীক দার্শনিক পাইথাগোরাস এই ধ্বনি শুনিতে পাইতেন এবং ইহাকে 'music of the spheres' (বিশ্বসঙ্গীত) বলিতেন।

পুরীধামে অসুস্থ অবস্থায়ও হরি মহারাজের হৃদয়ে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের ভাব পূর্ববৎ তীব্র ছিল। উক্ত বৎসর জুলাই মাসে কোন ভক্তকে পত্রে লিখিয়াছিলেন, "বশিষ্টদেব রামচন্দ্রকে বলিতেছেন, 'একং বিবেকমাদায় বিহরন্নেব সঙ্কটেষু ন মুহ্যতি।' অর্থাৎ এক বিবেকবিচাররূপ বন্ধুকে সঙ্গে রাখিয়া বিচরণ করিলেই মানুষ মোহপ্রাপ্ত হয় না।" এই বাক্যে স্বামী তুরীয়ানন্দের জীবনের অনুভূতি অভিব্যক্ত। উক্ত পত্রে প্রকৃত ত্যাগের সম্বন্ধে হরি মহারাজ লিখিয়াছিলেন, "যোগবাশিষ্ঠে ত্যাগের একটি গল্প আছে। কোন ব্রহ্মচারী আপনাকে ত্যাগী মনে করে বাহ্যিক সমস্ত ত্যাগ করে অতি সামান্য বস্ত্র, আসন, কমণ্ডলু নিয়ে থাকত। তাহার গুরু তাহাকে চৈতন্য করাবার জন্য বললেন, 'তুমি কি ত্যাগ করেছ, কিছু ত ত্যাগ কর নাই?' ব্রহ্মচারীটি ভাবিল, 'আমার ত কিছুই নাই, মাত্র পরিধেয় বস্ত্র, আসন ও কমণ্ডলু আছে। গুরুদেব কি এইসকল মনে করছেন?' এই ভাবিয়া ব্রহ্মচারী ঐসকল ত্যাগ করিবার ইচ্ছা করতঃ সম্মুখে অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিয়া তাহাতে একে একে ঐসকল বস্তু অর্পণ করিয়া বলিল, 'এবার আমার সমস্ত বস্তু ত্যাগ হয়েছে।' গুরু বলিলেন, 'তোমার কি ত্যাগ হয়েছে? বস্ত্র? ওটা ত তুলা হতে নির্মিত। এইরূপ আসন, কমণ্ডলু প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তু হতে নির্মিত। ওগুলি

ত্যাগ করে তোমার কি ত্যাগ করা হল?' তখন ব্রহ্মচারী ভাবিল, 'আমার আর কি আছে? অবশ্য আমার শরীর আছে। আচ্ছা, এই শরীরকে অগ্নিতে আহুতি দিব।' ইহা স্থির করিয়া যখন ব্রহ্মচারী সম্মুখস্থ অগ্নিতে আপনার শরীর ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইল তখন তাহার গুরুদেব বলিলেন, 'কি করছ বিচার কর দেখি। এই শরীরে তোমার কি আছে? ইহা তো পিতামাতার শুক্রশোণিতে উৎপন্ন এবং আহার দ্বারা পুষ্ট ও বর্ধিত। ইহাতে তোমার কি?' তখন ব্রহ্মচারীর চক্ষু উন্মীলিত হইল। গুরুকৃপায় সে বুঝিতে পারিল, মাত্র অভিমানই যত অনিষ্টের মূল। এই অভিমান ত্যাগ করিতে পারিলেই ঠিক ঠিক ত্যাগ হয়। নচেৎ বাহ্যিক বস্তু, এমন কি, শরীর পর্যন্ত ত্যাগ করিলে কিছুই ত্যাগ করা হয় না।" হরি মহারাজ নিজে এইরূপ ত্যাগী ছিলেন। পুরীধামে যে নবীন সাধু-ব্রহ্মচারিগণ হরি মহারাজের সেবার্থ গিয়াছিলেন তাঁহাদের জীবনগঠনের জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতেন এবং ধ্যানভজন, শাস্ত্রপাঠাদি হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ গৃহকর্ম পর্যন্ত যথাযথ করিতে শিক্ষা দিতেন। এই-সকল বিষয়ের শিক্ষাদানের পর যদি কোন সেবক তৎসমুদয়পালনে অবহেলা করিতেন তাহা হইলে তিনি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইতেন। তিনি যাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইতেন, তাঁহার সহিত কথা বলিতেন না, বা তাঁহার সেবা লইতেন না। এইরূপ করিবার পর যখন সেবক দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইতেন এবং তাঁহার আদেশপালনে দৃঢ়পণ হইতেন তখন আবার তাঁহার সহিত কথা বলিতেন ও তাঁহার সেবা লইতেন। এইভাবে সেবা না লইলে পাছে হরি মহারাজের অসুখ বাড়িয়া যায়, সেইজন্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ কোন সেবককে হরি মহারাজের নিকট পাঠাইবার সময় বলিয়াছিলেন, "দেখ, তিনি যদি তোর উপর অসন্তুষ্ট হন তো তুই

হাত জোড় করে বলবি, মহারাজ, আমায় ক্ষমা করুন।" উক্ত সাধুটি সেবা করিবার সময় হরি মহারাজ তাঁহার প্রতি একবার অসন্তুষ্ট হন। তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দের শিক্ষানুসারে করজোড়ে প্রার্থনা করায় হরি মহারাজের রাগ যেন জল হইয়া গেল। পরে অনুসন্ধানে যখন তিনি জানিলেন ইহা স্বামী ব্রহ্মানন্দের শিক্ষা, তখন তাঁহার দূরদর্শিতার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

পুরীধামে অবস্থানকালে ১৯১১ খ্রীঃ স্বামী তুরীয়ানন্দের চক্ষু-রোগ হইয়াছিল। সেইজন্য প্রত্যহ দুই-চারিবার ১০।১৫ ফোঁটা ঔষধমিশ্রিত গোলাপ-জল একটি শিশি হইতে তাঁহার চক্ষে দেওয়া হইত। জনৈক সন্ন্যাসী এই কাজটি করিতেন। একদিন চক্ষে ঔষধপ্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই হরি মহারাজ বলিয়া উঠিলেন, "এ ত গোলাপ জল নয়!" সন্ন্যাসী শশব্যস্ত হইয়া শিশির লেবেল দেখিয়া বুঝিলেন, ইহা নাইট্রিক এসিড! ভুলক্রমে কয়েক ফোঁটা নাইট্রিক এসিড তিনি হরি মহারাজের একটি চক্ষে ঢালিয়া দিয়াছিলেন! তিনি ভয়ে ও দুঃখে অভিভূত হইয়া কাঁদিতে ও কাঁপিতে লাগিলেন। অবিলম্বে চক্ষুটি গোলাপ জলে ধুইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু হরি মহারাজ বিন্দুমাত্র অধৈর্য বা বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিলেন না। কিঞ্চিৎ পরে সন্ন্যাসীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিয়াছিলেন, "দেখ, ঔষধ চক্ষে পড়িবামাত্র মনে হইল, সর্বশরীরে যেন আগুণ লাগিয়া গিয়াছে। তখন ভাবিলাম, তবে কি মা, আমার চক্ষুটি লইবার ইচ্ছা তোমার হইয়াছে? তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক।" ৺জগন্নাথের কৃপায় স্থিতধীর চক্ষুটি রক্ষা হইল। এইরূপ ভাবে নিশ্চিন্ত হওয়া, ভীষণ বিপদের মধ্যে পড়িয়াও ভগবদিচ্ছাতেই সব হইতেছে মনে করা এবং ঈশ্বরের ইচ্ছায় কায়মনো-বাক্যে আত্মসমর্পণ করা স্থিতপ্রজ্ঞ জ্ঞানীর পক্ষেই সম্ভব। মনোবৃত্তির

প্রবাহ কিরূপ গভীরভাবে নিরন্তর ভগবন্মুখী থাকিলে এইরূপ আচরণ সম্ভব তাহা ভাবিবার বিষয়। ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ হইলে সাধক এইরূপ গুরু দুঃখেও বিচলিত হন না।

দ্বিতীয়বার পুরীতে অবস্থানকালে স্বামী তুরীয়ানন্দের দেহত্যাগের সম্ভাবনা হইয়া উঠিয়াছিল। একদিন বহুক্ষণ diabetic coma (বহুমূত্র-জনিত মূর্চ্ছা)-তে আচ্ছন্ন ছিলেন। ডাক্তারগণ তাঁহার আরোগ্যের আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, এবং সেবকগণও শেষ মুহূর্তের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি চোখ খুলিয়া পার্শ্বে উপবিষ্ট স্বামী শঙ্করানন্দকে বলিলেন, "অমূল্য, এবার যাওয়া হল না।" তাহার পর হইতে তিনি আস্তে আস্তে সারিয়া উঠিলেন। কয়েক বৎসর পরে কাশী সেবাশ্রমে বসিয়া এক গ্রীষ্মকালীন সন্ধ্যায় উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে স্বামী নির্বেদানন্দ প্রমুখ সাধুগণকে অনেক কথা বলিলেন। সেই অবস্থায় যখন তিনি বাহিরে বেহুঁশ ছিলেন তখন তাঁহার অন্তরে যেসব অনুভূতি হইতেছিল সেইসব এইভাবে বর্ণনা করিলেন—"প্রথমটা অনেক সাধুসন্ত ও দেবদেবী দেখতে লাগলাম। তারপর হঠাৎ দেখি প্রাণ উৎক্রমণ করছে। সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে আর একটা শক্তি প্রাণকে টেনে রাখবার চেষ্টায় নিযুক্ত। প্রাণের সঙ্গে এই শক্তির একটা tug of war (টানাটানি) লেগে গেল। তারপর দেখি, প্রাণ যুদ্ধে জয়ী হয়ে বেরিয়ে যেতে উদ্যত। এমন সময় স্বামীজী এসে বলছেন, 'হরি ভাই, কোথায় যাচ্ছ? এখন ত সময় হয় নি।" তখনি ভিতরে পরাভূত শক্তিটার তেজ বেড়ে গেল এবং সে প্রাণকে একটান মেরে স্বস্থানে বসিয়ে দিলে। তারপরই আমি চোখ খুলে অমূল্যকে বলেছিলাম যে, সে যাত্রায় আমার যাওয়া হবে না।" পুরীধামে অবস্থানকালে স্বামী তুরীয়ানন্দ শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও ঘুমের ব্যাঘাত করিয়া কোন কোন রাত্রে দুইটার সময়

৺জগন্নাথদেবের আরাত্রিকদর্শনে যাইতেন। স্বামী শঙ্করানন্দ প্রায়ই তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। তিনি একদিন হরি মহারাজকে নিদ্রিত নিস্তব্ধ দেখিয়া একাকী মন্দিরে যাইবার উদ্দেশ্যে 'শশি-নিকেতন'-এর বাহিরে পদক্ষেপ করিতেছেন এমন সময় হরি মহারাজ বলিয়া উঠিলেন, "কি অমূল্য, যাচ্ছ নাকি?" এই বলিয়া তিনি অমূল্য মহারাজের সঙ্গে মন্দিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কোন কোন দিন হরি মহারাজ একাধিকবারও জগন্নাথমন্দিরে দেবদর্শনে যাইতেন। একদিন সম্ভবতঃ স্নানযাত্রা ছিল। সেদিন অমূল্য মহারাজ একাকী তিনবার জগন্নাথদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি দিনান্তে হরি মহারাজকে আনন্দ-প্রকাশপূর্বক বলিলেন, "আপনি আজ মন্দিরে ক'বার গিয়েছিলেন? আমি তিনবার গেছি।" হরি মহারাজ সহাস্যে হাতের পাঁচটি আঙ্গুল দেখাইয়া বলিলেন, "পাঁচবার।" সিদ্ধাবস্থাতেও তিনি সাধকের মত প্রচলিত ধর্মানুষ্ঠানে সানন্দে যোগদান করিতেন।

১৯১৭ খ্রীঃ স্নানযাত্রার সময় হইতে অক্টোবর পর্যন্ত পাঁচ-ছয় মাস পুরীধামে অতিবাহিত করিয়া হরি মহারাজ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতির সঙ্গে ১০ই নভেম্বর কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। তাঁহার হাতে ও পায়ে অস্ত্রোপচারজনিত ব্যাণ্ডেজ ছিল। তাই তাঁহাকে ষ্ট্রেচারে করিয়া ট্রেন হইতে নামান হইল। ষ্টেশন হইতে তাঁহাকে এ্যাম্বুলেন্স মোটর-গাড়ীতে উদ্বোধন মঠে লইয়া যাওয়া হয়। এবার তিনি মায়ের বাড়ীতে স্বামী সারদানন্দের কক্ষে রহিলেন। তখন শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটীতে ছিলেন এবং স্বামী প্রেমানন্দ বলরাম মন্দিরে কালাজ্বরে আক্রান্ত হইয়া শায়িত।

বেলুড় মঠে

বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় হইতেই স্বামী তুরীয়ানন্দ বহুবার তথায় ছিলেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের বড়দিনের সময়ে তিনি পুনরায় বেলুড় মঠে আসেন। একদিন সকাল নয়টা-দশটার সময় গঙ্গার দিকে মঠবাড়ীর পশ্চিম বারান্দায় বেঞ্চির উপর তিনি পূজনীয় মাস্টার মহাশয়ের সহিত বসিয়া আছেন, নিম্নে মেজের উপর দুই-একটি ভক্ত উপবিষ্ট। পূর্বদিকের বারান্দায় শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, অন্যান্য সাধু ও ভক্তগণ ছিলেন। মাস্টার মহাশয় হরি মহারাজকে বলিলেন, "তুমি অনেক তপস্যা করেছ, আমাদের কি করা উচিত বল।" উত্তরে হরি মহারাজ নিম্নোক্ত হিন্দী দোঁহাটি আবৃত্তি করিলেন—

দুয়ার ধনীকে পড়া রহে, ধাক্কা ধনীকা খায়।
কহীঁ ধনী ন নিভায়া দুয়ার ছাড়ি ন যায়॥[১]

দোঁহাটি বলিয়া মন্তব্য করিলেন, "তাঁর নাম নিয়ে পড়ে থাকা আর কি! সংসারে সুখ-দুঃখ, বিপদ-আপদ ত আছেই। কোনক্রমেই যেন তাঁকে না ভুলে যাই। এই প্রসঙ্গে স্বামী তুরীয়ানন্দ অন্য একজনকে বলিয়াছিলেন, "গৌ কা মাফিক গুরুকে ঘরমে পড়া রহো।" অর্থাৎ গুরুর দ্বারে গরুর মত পড়ে থাকাই উচিত।

ইতোমধ্যে শরৎবাবু এই স্বরচিত গানটি গাহিলেন,—'গাওরে জয় জয় রামকৃষ্ণ নাম।' গানের শেষ লাইন দুটি ছিল,

১—ধনপ্রার্থী ধনীর দ্বারেই পড়িয়া থাকে এবং ধনীর ধাক্কা খায়। সে ধনীর দ্বার ছাড়িয়া অন্য কোথাও যায় না।

'সে বিবেকানন্দে প্রাণ দিয়ে বলিদান।
ইন্দু নির্বাণের পথে হয় আগুয়ান॥'

তখন স্বামী তুরীয়ানন্দ আখর দিলেন, "জয় রামকৃষ্ণ বলে, প্রেমানন্দে বাহু তুলে।" আবার তিনি মন্তব্য করিলেন, "শুনুন, শুনুন, এদিকে গাইছেন, 'নির্বাণের পথে হয় আগুয়ান', আবার বলছেন, 'জয় রামকৃষ্ণ বলে, প্রেমানন্দে বাহু তুলে।' কিন্তু যাই হোক, ভারী বিভোর হয়ে গাইছেন।"

মঠবাড়ীর গঙ্গার দিকে বারান্দায় হরি মহারাজের সহিত স্বামী প্রজ্ঞানন্দের কথাবার্তা হইতেছিল প্রেমানন্দজী সম্বন্ধে। হরি মহারাজ বলিলেন, "দেখছ না, কিরূপ মহাশক্তি এখন ওঁর মধ্যে খেলা করছে? পূর্ববঙ্গে, মেদিনীপুরে হাজার হাজার লোক ওঁকে দেখবার জন্য ছুটছে। ভেতরে আত্মাশক্তির প্রকাশ না হলে জীবে কখনও এরূপ আকর্ষণ-শক্তি দেখা যায় না। ওঁর মধ্যে এখন ঠাকুর খেলছেন। তিনি বলতেন, "ওঁর রাধার অংশে জন্ম।"

১৯১১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিবেকানন্দ সোসাইটীর বাৎসরিক অধিবেশনের দিন বেলুড় মঠে নানা দার্শনিক প্রবন্ধ পাঠ হইতেছিল। সবই শুষ্ক, নীরস বোধ হইতে লাগিল। সময় বৃথা যাইতেছে বলিয়া কেহ কেহ খুব অস্বস্তি বোধ করিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ উক্ত অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় তিনি উঠিয়া কয়েকটি কথা বলিলেন। আশ্চর্য ব্যাপার, তাঁহার অল্প কয়েকটি কথায় সকলে প্রচুর আনন্দ পাইলেন। বক্তার বক্তৃতায় বিদ্যার আড়ম্বর বা ভাষার লালিত্য ছিল না, অথচ বক্তৃতার ভাব সকলের মর্ম স্পর্শ করিল। স্বামী তুরীয়ানন্দ দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে ২।৪টি মাত্র কথা বলিয়াই দার্শনিক বিচার শেষ করিলেন। তিন দেখাইলেন, বিশিষ্টাদ্বৈত দ্বৈত এবং

অদ্বৈতের মধ্যবর্তী বাদ এবং তন্মতে জগৎ ও জীব ব্রহ্মের শরীর বলিয়া বিভিন্নও নহেন এবং একও নহেন—যেমন খোলা, শাঁস ও বীচি লইয়া বেল হয়। তিনি বলিলেন, "সকল মতাবলম্বীরাই উপাসনার পক্ষপাতী। বিবাদ ভুলিয়া যাইয়া উপাসনাপরায়ণ হও। ঈশ্বরের সমীপস্থ হইতে চেষ্টা কর। মা সম্বোধনে তাঁহাকে ডাক। পিতা বলিলে কাঠিন্যভাব আসিতে পারে। মা বলিলে ভাব একেবারে কোমল হইয়া যায়। সংকোচ-দ্বিধার লেশও রহিল না। মহাসমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ইহাই শিক্ষা। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।"

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে শিবরাত্রির দিন স্বামী তুরীয়ানন্দ বেলুড় মঠে ছিলেন। পূর্বাহ্ণে বেলা ৯।১০ টার সময় মঠবাড়ীতে গঙ্গার দিকের বারান্দায় বেঞ্চিতে স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দ এবং শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি উপবিষ্ট আছেন। এমন সময় বেলুড় গ্রামের 'জয় মা কালী' নামক ভক্তটি আসিয়া নাচিতে নাচিতে গান ধরিলেন—

"তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা বম্ বম্ বাজে গাল।
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে দোলে কপালমাল॥
গরজে গঙ্গা জটামাঝে উগরে অনল ত্রিশূলরাজে।
ধক ধক ধক মৌলীবন্ধ জ্বলে শশাঙ্কভাল॥"

স্বামীজীর উক্ত শিবসঙ্গীতটি স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রভৃতি গুরুভ্রাতাগণের হৃদয়ে সুগভীর ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি করিল। হরি মহারাজের শরীর তখন অসুস্থ। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, ভাবাবেগে দাঁড়াইয়া উঠিয়া গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে গানটি গাহিতে ও নাচিতে লাগিলেন। সমবেত ভক্তগণ এই দিব্য দৃশ্য দেখিয়া পরম আনন্দিত হইলেন। জ্ঞানীর হৃদয়ে ভক্তির উৎস! ঠাকুরের মত তৎশিষ্যগণও জ্ঞান এবং ভক্তির সমন্বয়মূর্তি ছিলেন।

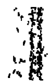
বেলুড় মঠে অবস্থানকালে স্বামী তুরীয়ানন্দ পূর্বাহ্নে কখন কখন সাধু-ব্রহ্মচারীদের সহিত বসিয়া তরকারী কুটিতেন। একবার উক্ত কার্যে নিযুক্ত কোন সাধুর শৌচের বেগ হওয়ায় তাঁহাকে উঠিয়া যাইতে হয়। সাধুটিকে লক্ষ্য করিয়া তখন হরি মহারাজ বলিলেন, "এতটুকু সংযম নেই? অসময়ে শৌচের বেগ হবে কেন? কুট্‌নো-কোটা শেষ করে যেতে তর সয়না? আমার তো ঐরূপ কখন হয় না।" যাহাই হউক, সাধুটি শৌচের বেগ সামলাইতে না পারিয়া দ্রুতপদে পায়খানার দিকে গেলেন এবং শৌচান্তে ফিরিয়া আসিলেন। ঐ দিন যে সময়ে পূর্বোক্ত সাধুটির শৌচের বেগ হইয়াছিল, পরদিন ঠিক সেই সময়ে হরি মহারাজেরও শৌচের বেগ হইল। তিনিও বেগ সামলাইতে না পারিয়া শৌচার্থ চলিলেন। তিনি তখন পূর্বোক্ত সাধুটিকে বলিয়াছিলেন, "দেখ, কাল তোমাকে বলেছিলাম, আমার ওরূপ হয় না। মহামায়া আমার এই অহঙ্কার রাখতে দেবেন না। তাই আজ আমার হঠাৎ এই রকম হল, নইলে আমার তো কখনও এরূপ হয় না।" এইরূপ অকপট স্বীকৃতি অহঙ্কার-রাহিত্যের লক্ষণ।

আর একদিন স্বামী তুরীয়ানন্দ বেলুড় মঠে কয়েকজন সাধু-ব্রহ্মচারীর সহিত কুট্‌না কুটিতেছিলেন। কুট্‌না-কোটা শেষ হইতে কিছু বাকী আছে, এমন সময় জলখাবারের ঘণ্টা বাজিল। তখন স্বামী তুরীয়ানন্দ সকলকে বলিলেন, "কুট্‌না-কোটা সামান্য বাকী আছে। আমরা এইটা শেষ করে গিয়ে জলখাবার খাব।" তাঁহার নির্দেশমত সকলে উক্ত কার্য সমাপনান্তে যাইয়া দেখেন, জলখাবারের জন্য যে হালুয়া প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা ফুরাইয়া গিয়াছে। তখন তিনি ভাণ্ডারীকে বলিলেন, "কই গো, আমাদের জলখাবার?" সেইসময় প্রত্যেকের ভাগ আলাদা থাকিত। যাঁহারা খান নাই, তাঁহাদের ভাগ থাকিবার কথা। কিন্তু একজনেরও

ভাগ না দেখিয়া হরি মহারাজ ভাণ্ডারীকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ভাণ্ডারী উত্তর দিলেন, "বাবুরাম মহারাজ আপনাদের অংশগুলি ভক্তদের দিয়েছেন।" এই উত্তর শুনিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি বললে না কেন, সেগুলি আমাদের ভাগ?" ভাণ্ডারী সবিনয়ে জানাইলেন, "তাঁহাকে কি করিয়া জানান যায়?" তাহাতে হরি মহারাজ বলিলেন, "কেন বলা যাবে না? ভালবাসা থাকলেই বলা চলে। তোমরা বুঝি তাঁকে ভালবাস না? ভালবাসা থাকলে ভয় থাকে না, তখন সব কথা বলা চলে।" একথা শুনিয়া উপস্থিত সকলে অবাক হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, সত্যই তো আমরা ভালবাসি না বলিয়াই অপরকে ভয় করি।

স্বামী তুরীয়ানন্দ যখন বেলুড় মঠে থাকিতেন তখন সাধু-ব্রহ্মচারীদের নিকট গীতা-উপনিষদাদি শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতেন সাধারণতঃ অপরাহ্নে। তাঁহার ব্যাখ্যা খুব প্রাঞ্জল ও প্রাণস্পর্শী হইত। যদিও তাঁহার ব্যাকরণ-জ্ঞান সামান্য ছিল, তথাপি তিনি শাঙ্করভাষ্য, শ্রীমদ্ভাগবত এবং অন্যান্য সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ সুন্দররূপে বুঝিতেন ও বুঝাইতেন। বাঙ্গালীর সংস্কৃতবর্ণোচ্চারণ প্রায়ই অশুদ্ধ হয় এবং ঐরূপ শাস্ত্রাধ্যাপক অল্পই পাওয়া যায়। সেইজন্য স্বামী তুরীয়ানন্দ তপস্যাকালে যোগ্য ব্যক্তির নিকট শুদ্ধ উচ্চারণ-শিক্ষা ও শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শাস্ত্রোক্ত তত্ত্ব তাঁহার উপলব্ধ ছিল বলিয়া তিনি জটিলাংশের উপর নবালোকসম্পাত করিতে পারিতেন। বেলুড় মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীদের তিনি বিশুদ্ধ উচ্চারণপূর্বক শাস্ত্রপাঠ করিতে শিক্ষা দিতেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি তাঁহাদিগকে নিয়মিত সাধনভজন করিতে উপদেশ দিতেন।

নিবেদিতা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা সুধীরা বসু এবং সমগ্র সংঘের সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ তিনটি মহিলাকে কাশী সেবাশ্রমের মহিলা বিভাগের সেবিকারূপে পাঠান। তাঁহাদের সহিত কার্যক্রম সম্বন্ধে মতভেদ হওয়ায়



সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী শুভানন্দ তাঁহাদিগকে অন্যত্র চলিয়া যাইতে বলেন। নিরুপায় হইয়া সেবিকাত্রয় স্বামী সারদানন্দকে পত্র লিখেন এবং তাঁহার নির্দেশের অপেক্ষা করেন। স্বামী সারদানন্দ তাঁহাদের পত্র পাইয়া কাশীধামে উপস্থিত হন এবং সেবিকাত্রয়কে তথায় থাকিবার নির্দেশ দেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ তখন কাশীধামে শেষবারে অসুস্থ অবস্থায় আছেন। সেবিকাত্রয় স্বামী সারদানন্দের শুভাগমনের পূর্বে হরি মহারাজের পরামর্শ-প্রার্থিনী হন। হরি মহারাজ সেবিকাগণকে তথায় থাকিতে বলিয়া আশ্বস্তা করেন এবং কথাপ্রসঙ্গে নিম্নোক্ত ঘটনাটি বলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ যখন বেলুড় মঠে ছিলেন তখন এই ঘটনাটি ঘটে। কোন মার্কিন মহিলা চল্লিশ হাজার টাকা আনিয়া স্বামী বিবেকানন্দকে বলেন, "এই টাকা দিয়ে আপনি আপনার পরিকল্পনা অনুসারে মেয়েদের জন্য একটি মঠ করুন।" কিন্তু স্বামীজী উক্ত অর্থ লইতে অস্বীকৃত হওয়ায় হরি মহারাজ তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। স্বামীজী তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "হরিভাই, তুমি ত জান, নারীমঠ স্থাপন করবার জন্য আমি কত ব্যগ্র! বিনা সর্তে এই টাকা দিলে আমি কখনও প্রত্যাখ্যান করতাম না। কিন্তু টাকাটি দিয়েই এ সারা জীবন মোড়লিটি করতে চায়। তাতে আমার পরিকল্পনা ঠিক ঠিক কার্যে পরিণত হবে না। তাই টাকা নিলাম না।"

১৯১৭ খ্রীঃ স্বামী তুরীয়ানন্দ আলমোড়া হইতে কাশী এবং মিহিজাম হইয়া দীর্ঘকাল পরে বেলুড় মঠে আগমন করেন। এক বৈকালে ৪টা-৫টার সময় মঠবাড়ীর দোতলার বারান্দায় স্বামীজীর ঘরের সামনে তিনি বসিয়া আছেন। এমন সময় কতকগুলি বি. এ., এম. এ.-পাশকরা যুবক আসিয়া হরি মহারাজকে প্রণাম করিয়া বসিলেন। তাঁহারা স্বামী তুরীয়ানন্দকে বলিলেন, "মহারাজ! বাবুরাম মহারাজ আমাদিগকে

আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন ; বললেন, 'যা, তোরা সব হরি মহারাজের কাছে গিয়ে বস্‌গে আর সব জিজ্ঞাসা করবি।' " হরি মহারাজ যুবকদের সঙ্গে হাসি-তামাসা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ একজন বলিলেন, "মহারাজ! আমাদের কিছু বলুন। আমাদের সংস্কার খারাপ। আমাদের ভাল সংস্কার কিছুই নাই।" এতক্ষণ হরি মহারাজ শুইয়া ছিলেন। কথা শুনিয়া উঠিয়া বসিলেন ও বলিলেন, "হঁা, ঠিক কথা বল্‌ছ। সংস্কার খারাপ—এই যদি বুঝতে পেরে থাক, তাহলে আর ভাবনা নাই। আজ থেকে সংস্কার ভাল করতে লেগে যাও। যা হবার হয়ে গেছে। ওদিকে আর তাকিও না। আজ থেকে নূতন ভাল সংস্কার গড়তে আরম্ভ করে দাও। যখন বুঝতে পেরেছ ভাল সংস্কার দরকার, তখন একদিনও আর সময় নষ্ট না করে উঠে পড়ে লেগে যাও। কিছুদিন পরে দেখবে, সব সংস্কার ভাল হয়ে গেছে। Do it here and now (এখনই, এখানেই আরম্ভ কর)। একদিনও নষ্ট করা চলবে না। দেখ, তোমরা যে বি. এ., এম. এ. পাশ করেছ সেজন্য কত খাটতে হয়েছে ; কতদিন ধরে লেখাপড়া করার ফলে তবে পরীক্ষায় পাশ করতে পেরেছ। কত চেষ্টায়, কত উদ্যমে তবে সফল হয়েছ। এম. এ. পাশ করতে তোমদিগকে যত খাটতে হয়েছে ; অন্ততঃ তত চেষ্টা ও শক্তি ধর্মসাধনে দেবে ত ? ধর্মরাজ্যে অন্ততঃ ততখানি মনোযোগ না দিলে চলবে কেন ? ও যেমন তোমরা চেষ্টা করে এম এ. পাশ করেছ, এ পথেও তেমনি চেষ্টা করলে কৃতকার্য হবে। সংস্কার ভাল করতে হলে অভ্যাসযোগ দরকার। যেমন, একটা ছুরি রোজ যখন তখন ব্যবহার করছ এবং যথাস্থানে রেখে দিচ্ছ। ঐ অভ্যাসও তজ্জনিত সংস্কারের ফলে। রাত্রে অন্ধকারে হাত দিলেই ছুরিটা পাওয়া যাবে। হঠাৎ যদি ছুরিটা ঐ স্থান থেকে অন্য স্থানে নেড়ে রাখা যায়, তাহলে প্রথম প্রথম দেখবে, ভ্রমবশতঃ ঐ পুরান

স্থানে আগে খুঁজবে। মনে হবে, অহো! এখান থেকে অন্যত্র সরিয়ে রেখেছি। তখন সেখানে হাত যাবে ও ছুরিটা পাবে। একেই বলে সংস্কার, একেই বলে অভ্যাসযোগ। যা অভ্যাস করবে তা-ই সংস্কারে পরিণত হবে। যদি তোমরা ঠিক ঠিক বুঝে থাক তোমাদের সংস্কার খারাপ, এবং ভাল সংস্কার আবশ্যক, তাহলে এক ঘণ্টাও, এক মুহূর্তও আর দেরী করো না। তোমাদের উৎকৃষ্ট সময় চলে যাচ্ছে, আর ফিরে আসবে না। দেখবে, অল্পদিনেই সব পরিষ্কার ও সহজ হয়ে যাবে, সব শুভ সংস্কার গড়ে উঠবে। কিছু না করলে কি করে হবে? এখনই আরম্ভ করে দাও। করবো ভেবে ফেলে রাখলে আর হবে না। 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীরপতন।' এরূপ দৃঢ় সংকল্প চাই।

"স্বামীজী তোমাদের দেখলে, তোমাদের পেলে কতই না আহ্লাদ করতেন! তিনি তোমাদের মত young man (যুবক)-দের ভয়ানক ভালবাসতেন এবং তোমরা কিছু কর, এই চাইতেন। যখন এসে পড়েছ তখন আর বিলম্ব করো না, কাজে লেগে যাও। তোমরা বাবুরাম মহারাজের মত মহাপুরুষের সঙ্গ করছ, তাঁর কাছে সর্বদা যাওয়া আসা করছ, তাঁর ভালবাসা পেয়েছ, তোমাদের আর কোন চিন্তাই নাই। এখন খালি অভ্যাস করে যাও, এগিয়ে পড়।" সমবেত যুবকদের মধ্যে দুই-তিন জন পরে বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী হইয়াছেন।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষে পুরী হইতে ফিরিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ কিছুকাল উদ্বোধনে অবস্থান করেন। তখন তাঁহার পায়ে অস্ত্রোপচার হয়। বলরাম মন্দিরে তদানীন্তন বিখ্যাত সার্জন সুরেশ ভট্টাচার্য অস্ত্রোপচার করেন। মেডিকেল কলেজের প্রসিদ্ধ ইংরেজ সার্জন মেজর বার্ড সাহেব ডাক্তার সুরেশ বাবুর অনুরোধে হরি মহারাজকে দেখিতে আসেন। তাঁহারা হরি মহারাজকে দেখিয়া বলেন, "যদি উনি বাঁচিয়া উঠেন, তবে সারাজীবন

পঙ্গু থাকিবেন।" ইহা শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "Invalid (অক্ষম) হয়ে সম্পূর্ণ পরতন্ত্র হয়ে বেঁচে থাকবার ইচ্ছা নেই। তাহলে শরীর যাক্।" হরি মহারাজের এই মন্তব্য সংঘজননীর কর্ণগোচর হইল। শ্রীমা উদ্বোধন অফিসে থাকিয়া অসুস্থ সন্তানের সংবাদ রোজ একটি সেবকের কাছে শুনিতেন। উক্ত সেবকের মারফৎ তিনি হরি মহারাজকে বলিয়া পাঠাইলেন, "শরীর যাবে কেন? শরীর থাকলে ঠাকুরের অনেক কাজ হবে। তুমি এরূপ ইচ্ছা করো না।" আর একদিন সেবক মাকে প্রণাম করিতে গিয়াছেন। সেদিন সেবককে মা বলিলেন, "বাবা, খুব মনোযোগ দিয়ে হরির সেবা করো। হরির সেবা করলে ধন্য হয়ে যাবে। উনি হলেন দেবতা, ঠাকুরের সঙ্গে এবার এঁরা সব দেবলোক থেকে এসেছেন।"

উদ্বোধন মঠে অবস্থানকালে কপিল মহারাজ হরি মহারাজকে চণ্ডী-দাসের পদাবলী পড়িয়া শুনাইতেন। কঠোর বেদান্তী হইয়াও হরি মহারাজ সেইসকল প্রেমরসাত্মক পদাবলী শুনিতে শুনিতে ভাবে গদ্‌গদ হইয়া যাইতেন এবং তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে প্রেমাশ্রু পড়িত। কাশীতে শেষবারে অবস্থানকালে এক কথক ঠাকুরের মুখে তিনি এই গানটি শুনিতেছিলেন—'কৈ গো কুটিলে কুটিল কাল।' গান শুনিতে শুনিতে তিনি অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন। সেদিন স্বামী প্রেমানন্দ ও স্বামী শিবানন্দ উপস্থিত ছিলেন। গান শুনিয়া প্রেমানন্দজীর মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিল এবং শিবানন্দজী ঘাড়টি হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন; আর তুরীয়ানন্দজী কাঁদিতে লাগিলেন।

পুরীতে ও উদ্বোধনে অস্ত্রোপচারের সময় দেখা গিয়াছে, হরি মহারাজ দেহ হইতে মনকে আলাদা করিয়া লইতে পারিতেন। কলিকাতায় অস্ত্রোপচারকালে মনকে দেহ হইতে তুলিয়া লইবার জন্য গান ধরিলেন, 'ডুব দেরে মন কালী বলে।' উদ্বোধনে একবার ইহার কারণ জিজ্ঞাসা

করায় তিনি বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরেরও এরূপ হ'ত। গলার ঘা পরিষ্কারের সময় দেহ থেকে মন তুলে নিতেন। ঠাকুর বলতেন, 'যীশুর খোল ও শাঁস আলাদা হয়ে গিয়েছিল। যখন তাঁকে ক্রুশ-বিদ্ধ করলে, গায়ে বর্শা ফুটিয়ে দিলে খোলে লাগল, শাঁসে কিছু হয় নি।' "

উদ্বোধনে সারা শীতকাল থাকিয়া হরি মহারাজ সম্ভবতঃ মার্চ মাসে বেলুড় মঠে আসেন। আসিবার সময় পাছে শ্রীমা স্বয়ং তাঁহার ঘরে আসেন এইজন্য নিজেই মায়ের ঘরে যাইয়া মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন, "আপনার আশীর্বাদে এবার সেরে গেলাম ; নচেৎ এযাত্রা রক্ষা ছিল না।" তখন হরি মহারাজের পায়ে এত ব্যথা যে, তিনি অতিকষ্টে দুই-এক পা চলিতে পারিতেন। কিন্তু মায়ের কাছে যাইবার সময় দ্রুতপদে গেলেন ও আসিলেন। উদ্বোধন হইতে বেলুড় মঠে আসিয়া তিনি মঠের অতিথি-ভবনের নীচের তলায় প্রায় তিন সপ্তাহ ছিলেন। বেলুড় মঠ হইতে গিয়া তিনি বলরাম মন্দিরে প্রায় দশমাস অবস্থান করেন। বলরাম মন্দিরে সদর দরজা দিয়া ঢুকিয়া ডানদিকে যে ঘরটি দেখা যায় তাহাতে তিনি থাকিতেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ দোতলার ছোট ঘরে এবং স্বামী প্রেমানন্দ হল-ঘরের একপাশে থাকিতেন।

তথায় অবস্থানকালে তিনি একদিন স্বামী নির্বেদানন্দকে বলিয়াছিলেন, "স্বামীজী একবার আমাদের বল্লেন, তোমরা আগে আমাকে বোঝো, তারপর তাঁকে (ঠাকুরকে) বোঝবার চেষ্টা করবে।" তখন জনৈক শ্রোতা প্রশ্ন করিলেন, "কেন মশায়, স্বামীজীকে না বুঝলে কি ঠাকুরকে বোঝা যায় না ?" এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "দেখ, স্বামীজী আর কিছু না হলেও একটা সম্পূর্ণ (perfect) মানব। এইরূপ সম্পূর্ণ মানবের ধারণাই যদি না করা যায় তবে ভগবানের ধারণা করা কি সম্ভব ? তাই স্বামীজী বলতেন, আগে আমাকে বোঝো, পরে ঠাকুরকে

বুঝবে।" আর একদিন হরি মহারাজ ঠাকুরের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "তিনি এখানে বহুবার এসেছিলেন। একবার তিনি চকমকি পাথর ও ভিজে দেশলাই প্রভৃতির উপমা দিয়ে কথা বলেছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আপনি কি এসব উপমা আগে থেকে তৈরী করে রাখেন?' তিনি বল্লেন, 'না, রাখিনা। মা সব জায়গায় আছেন। যখন যেখানে থাকি তখন সেখানেই মা সব বলে দেন। তিনি জ্ঞানের রাশ ঠেলে দেন।' "

বলরাম মন্দিরে অবস্থানকালে হরি মহারাজকে জনৈক সেবক খাওয়াইয়া দিতেন। কেননা, তাঁহার হাত তখন শক্ত হইয়া গিয়াছিল এবং সর্বদা বেদনাযুক্ত ও ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা থাকিত। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁহার পথ্য সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন লইতেন। স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ তাঁহার জন্য রান্না ও বাজারাদি করিতেন। স্বামী শ্যামানন্দ ব্রহ্মানন্দজীর নির্দেশে অসময়ে ৬৲।৮৲ সেরের পটল আনিতেন। ব্রহ্মানন্দজী সেবক আত্ম-প্রকাশানন্দজীকে বলিয়া দিলেন, "রান্না করে চেখে রোগীকে খেতে দিও। ভাল না হলে দিও না।" সেবক ব্রহ্মানন্দজীর আদেশ রোজ পালন করিতেন! হরি মহারাজ এই ব্যাপার একদিন জানিতে পারিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমাকে এঁটো খাওয়াচ্ছ?" পরে ব্রহ্মানন্দজীর সুগভীর ভ্রাতৃভক্তি স্মরণ করিয়া স্বগতোক্তি করিলেন, "মহারাজের কি ভালবাসা!"

বলরাম মন্দিরের হল-ঘরের একপাশে পর্দা দ্বারা আলাদা করিয়া দিয়া অসুস্থ বাবুরাম মহারাজকে রাখা হইয়াছিল। বাবুরাম মহারাজ কালাজ্বরে ভুগিয়া ভুগিয়া কঙ্কাল-সার হইয়াছিলেন। তাঁহার দেহত্যাগের পূর্বদিন হরি মহারাজ তাঁহাকে দেখিতে যান। বৈকাল পাঁচটার সময় বাবুরাম মহারাজ হরি মহারাজকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ

করিলেন। হরি মহারাজ উপরে যাইয়া বাবুরাম মহারাজের খাটে বসিলেন এবং মুমূর্ষু গুরুভ্রাতার হাতে হাত দিয়া রহিলেন, গভীর দুঃখে মুহ্যমান হইয়া একটি কথাও বলিতে পারিলেন না। বাবুরাম মহারাজ ইসারা করিয়া চেয়ার দেখাইয়া দিলেন এবং ক্ষীণকণ্ঠে 'চেয়ার' বলিয়া উহাতে বসিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু হরি মহারাজ চেয়ারে বসিলেন না, পূর্ববৎ খাটেই নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। বাবুরাম মহারাজ একটু পরে অনুচ্চ স্বরে বলিলেন, 'কৃপা, কৃপা, কৃপা'। এইভাবে সাত আট মিনিট কাটিয়া গেল। তখন বাবুরাম মহারাজ সেবককে বলিলেন, 'এঁকে নিয়ে যাও।' হরি মহারাজ গম্ভীর হইয়া নীচের তলায় স্বীয় কক্ষে ফিরিলেন। কে বলিবে কি গভীর অন্তর্দাহ এই নির্বাক অবস্থা আনিয়াছিল। পরদিন বেলা দুইটার সময় বাবুরাম মহারাজের শরীর গেল।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের ইচ্ছা হইল, শ্রীশ্রীমাকে চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর হাস্য-কৌতুক শুনাইবেন। বলরাম মন্দিরে উহার ব্যবস্থা করা হইল। গোলাপ-মা বলিলেন, শ্রীমা বলরাম মন্দিরে আসিলে তাঁহাকে হরি মহারাজের ঘরে আনিবেন। তখন হরি মহারাজ অতিকষ্টে দুই-এক পা চলিতে পারিতেন। তিনি পাশের ঘরে কমোডে পায়খানা করিতেন এবং বারান্দায় তাঁহার জন্য যে রান্না হইত তাহা দেখিতে যাইতেন। এর বেশী তিনি যাইতে পারিতেন না। শ্রীশ্রীমা ঘোড়ার-গাড়ীতে বলরাম মন্দিরে আসিলেন। গাড়ী আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইতেই হরি মহারাজ নিজ ঘরের বাহিরে আসিলেন। শ্রীশ্রীমা দরজা পার হইয়া ৫।৬ ফুট ভিতরে আসিতেই হরি মহারাজ সিঁড়িতে নামিয়া স্ত্রীভক্তদের ভিড় ঠেলিয়া মায়ের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং মায়ের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিয়া নিজ ঘরে ফিরিলেন।

কলিকাতায় আট-দশ মাস চিকিৎসাদি করা সত্ত্বেও স্বামী তুরীয়ানন্দের স্বাস্থ্য আশানুরূপ ভাল হইল না। ১৯১৮ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে দুইখানি পত্রে এই সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমার শরীর মধ্যে খারাপ হইয়াছিল। এখন ঈশ্বরেচ্ছায় অনেকটা ভাল। তবে এখনও স্বচ্ছন্দে উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে পারি না। হাতে পায়ে আড়ষ্টভাব, বেদনা এখনও খুব রহিয়াছে। প্রস্রাবের পীড়াও বেশ আছে। গতবারের পরীক্ষায় ২৭ গ্রেণ সুগার (sugar) পাওয়া গিয়াছে।" ·· "আমি অল্প-স্বল্প হাঁটিতে পারি। বাটীর বাহিরে যাইতে সাহস করি না। সিঁড়ি নামিতে গেলে কষ্ট হয়। তাই ঘরের মধ্যে ও বাহিরে যে সমতল স্থান আছে তাহাতেই বেড়াইয়া থাকি।

১৯১৯ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে স্বামী তুরীয়ানন্দের শরীর পূর্ববৎই ছিল। এই মাসে এক পত্রে স্বীয় স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমার শরীর সেই একরূপই চলিতেছে। বাঁ নাকের মধ্যে একটা ফোঁড়া হইয়া দিনকয়েক খুব কষ্ট দিয়াছিল, এখন তাহা সারিয়াছে; কিন্তু আবার পায়ের বেদনা ও ফুলা বাড়িয়াছে।" বলরাম মন্দিরে নয়-দশ মাস থাকিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ ১৯১৯ খ্রীঃ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী কাশীধামে গমন করেন।

অষ্টম অধ্যায়

কাশীধামে

সুপ্রাচীন মোক্ষতীর্থ কাশীধামের সহিত স্বামী তুরীয়ানন্দের জীবন-সন্ধ্যার বহু পুণ্যস্মৃতি জড়িত রহিয়াছে। শিবপুরী বারাণসীর প্রতি তাঁহার একটি গভীর আকর্ষণ ছিল। অনেকবার তিনি একা এবং কোন কোন গুরুভ্রাতার সহিত কাশী আসিয়া কিছুকাল কাটাইয়া গিয়াছেন। সাধারণতঃ তিনি সেবাশ্রমেই থাকিতেন। সেই সময়ে ধ্যান ভজন তপস্যা বেদান্তালোচনা ভগবৎপ্রসঙ্গের একটা জোয়ার যেন বহিয়া যাইত। কাশীর উভয় আশ্রমের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী কর্মিবৃন্দ ব্যতীত বাহিরেরও বহু সাধু এবং তত্ত্বজিজ্ঞাসু এই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের পাবনসঙ্গলাভের জন্য সেবাশ্রমে উপস্থিত হইতেন। হরি মহারাজের তেজোদীপ্ত মূর্তি, উদার ও সপ্রেম ব্যবহার এবং জ্ঞানগর্ভ হৃদয়গ্রাহী কথাবার্তায় সকলেই আকৃষ্ট না হইয়া পারিতেন না। ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারী হইতে জীবনের শেষ সাড়ে তিন বৎসর তিনি একটানা কাশীতেই ছিলেন। কঠিন ব্যাধিতে দেহ দিন দিন ভাঙিয়া পড়িতেছিল, কিন্তু সেদিকে তিলমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তিনি জ্ঞান, ভক্তি, তপস্যার অভ্যাস ও আলোচনায় দিবারাত্র আধ্যাত্মিকতার জমাট ভাব জাগাইয়া রাখিয়াছিলেন।

গুরুভ্রাতৃদিগের প্রতি তাঁহার ভালবাসা ও শ্রদ্ধা কত গভীর ছিল তাহা কাশীধামের কয়েকটি ঘটনা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে স্বামী প্রেমানন্দ যখন কাশীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহার আহ্বানে হরি মহারাজও আলমোড়া হইতে

কাশীতে উপস্থিত হইলেন। বাবুরাম মহারাজের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হইলে হরি মহারাজ তাঁহার পাদস্পর্শপূর্বক প্রণাম করিলেন। ইহাতে প্রেমানন্দজীও তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। হরি মহারাজ হাসিয়া বলিলেন—"নিরভিমানিত্বে আপনাকে অতিক্রম করবার সাধ্য কি আমার আছে ?"

হরি মহারাজ তখন পায়ে বাত ও গলাফোলায় কষ্ট পাইতেছিলেন। শীতকালে খালি পায়ে মেজের উপর চলিলে ঠাণ্ডা লাগিয়া অসুখ বাড়িত। মহাপুরুষজী বাবুরাম মহারাজকে একজোড়া লাল কাপড়ের নেপালী জুতা দিয়াছিলেন ঘরের মধ্যে ও বারান্দায় ব্যবহারের জন্য। বাবুরাম মহারাজ উহা ব্যবহার করেন নাই। তিনি হরি মহারাজকে বলিলেন, "তোমার যা পা ফুলেছে, তুমি বরং ঐ জুতাজোড়া ব্যবহার কর।" জনৈক ব্রহ্মচারী জুতা জোড়াটি আনিয়া হরি মহারাজের কাছে রাখিলেন। হরি মহারাজ উহা হাতে তুলিয়া নিজ মাথায় রাখিয়া বলিলেন, "তোমার দান মাথায় রাখবার, পায়ে দেবার নয়।" ইহাতে বাবুরাম মহারাজ ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আরে কর কি ? জুতা পায়ে দাও। নইলে এই ঠাণ্ডায় তোমার কষ্ট হবে।" উভয়ের মধ্যে এইরূপ অদ্ভুত ভালবাসা দেখিয়া সমবেত সকলে বিস্মিত হইলেন।

১৯১৯ সালের একটি ঘটনা। অদ্বৈত আশ্রমে দুর্গাপূজা হইতেছে। মহাষ্টমীর দিন দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে স্বামী অদ্ভুতানন্দ পূজা-মণ্ডপে আসিয়াছেন। অঞ্জলি দিবার পর তিনি হরি মহারাজকে দেখিতে সেবাশ্রমে গেলেন। তাঁহার ঘোড়ার গাড়ী সেবাশ্রমের দ্বিতীয় ফটক দিয়া প্রবেশ করিল। হরি মহারাজ তাঁহার ঘরের বারান্দায় আরাম কেদারায় বসিয়া ছিলেন। দূর হইতে গুরুভ্রাতাকে আসিতে

দেখিয়া তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিবার জন্য ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং নিজের চেয়ারটি ঠেলিয়া ঠেলিয়া অন্য একটি চেয়ারের কাছে আনিলেন। লাটু মহারাজ নিকটে আসিতেই তিনি তাঁহাকে উহাতে বসাইলেন এবং পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। ইহাতে লাটু মহারাজ ব্যস্ত হইয়া হরি মহারাজকে হাত ধরিয়া তুলিলেন এবং তাঁহাকে চেয়ারে বসাইয়া কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। পরস্পরের দৈহিক কুশলাদির কথা কিন্তু অল্প সময়েই সমাপ্ত হইল। হরি মহারাজের মুখে বারে বারে ঠাকুরের এই কথাটি শোনা গেল, "শরীর জানে আর দুঃখ জানে, মন তুমি আনন্দে থাক।" লাটু মহারাজ বলিতে লাগিলেন, "হরি ভাই, আর কেন?" এই বলিয়া সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার মহা সমাধির আসন্নতা ইঙ্গিত করিলেন। ইতোমধ্যে সাধুব্রহ্মচারিগণ আসিয়া তপস্বিদ্বয়কে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। অনেকে লাটু মহারাজকে প্রণাম করিলেন। কিন্তু তিনি সাধারণতঃ কাহারও প্রণাম গ্রহণ করিতে চাহিতেন না। সেইজন্য তিনি কিঞ্চিৎ অস্বস্তিবোধ করিতে লাগিলেন। এমন সময় একটি স্ত্রীভক্ত আসিয়া লাটু মহারাজকে প্রণাম করিলেন। ইহাতে লাটু মহারাজ চমকিত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। তাঁহাকে অস্থির দেখিয়া হরি মহারাজ সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এঁর যাতে অস্বস্তি বা অসুবিধা হয় তা তোমরা কোরো না।" কিছুক্ষণ পরে লাটু মহারাজ গুরুভ্রাতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্বস্থানে যাইবার জন্য ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিলেন।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ সেবাশ্রমের কার্যপরিদর্শনার্থ কাশীধামে আসেন। দুজনকে একত্র পাইয়া স্বামী তুরীয়ানন্দের আনন্দের সীমা রহিল না। এই তিন মহাপুরুষের অবস্থানে কাশীর আশ্রম দুইটিতে সাধু, ব্রহ্মচারী ও

ভক্তগণের মন উৎসাহ-উদ্দীপনায় মাতিয়া উঠিয়াছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যারতির পর সকলে ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট সমবেত হইতেন। মহারাজ গুরুভ্রাতাদের সহিত সাধনরাজ্যের গূঢ় তত্ত্ব এবং ঠাকুর-স্বামীজীর কথা আলোচনা করিতেন। সেই বৎসর অদ্বৈতাশ্রমে ঠাকুর ও স্বামীজীর জন্মোৎসবে চল্লিশ জন সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত হন।

গুরুভ্রাতারা স্বামী তুরীয়ানন্দকে কত শ্রদ্ধা করিতেন তাহা নিম্নোক্ত ঘটনা* হইতে বুঝা যায়। একদিন গঙ্গাস্নানের পর স্বামী সারদানন্দ-প্রমুখ সন্ন্যাসিগণ অদ্বৈতাশ্রমে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে প্রণামান্তে তৎপার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন। তখন মহারাজ কহিলেন, "দেখ শরৎ, ইচ্ছা হচ্ছে হরি মহারাজকে প্রণাম করি। এমন মহাপুরুষ দুর্লভ। দুরারোগ্য ব্যাধির অসহ্য যন্ত্রণা বিস্মৃত হয়ে তিনি কিরূপ স্বস্থ আছেন! এরূপ দেখা যায় না।" কিছুক্ষণ পরে স্বামী সারদানন্দ উঠিলেন, সঙ্গে কয়েকজন ছিলেন। সিঁড়িতে নামিবার কালে তিনি বলিলেন, "এ সুযোগ ছাড়তে ইচ্ছে হচ্ছে না। হরি মহারাজকে প্রণাম করে আসি।" গরমের দিন, হরি মহারাজের ঘরে পর্দা দেওয়া ছিল। তখন কেবলমাত্র তাঁহার আহার শেষ হইয়াছে। তিনি হাত মুখ ধুইয়া জলচৌকির উপর বসিয়াছেন মাত্র। চৌকির নিকটেই মুখ ধুইবার জল পড়িয়াছিল। তাহা তখনও পরিষ্কার করা হয় নাই। স্বামী সারদানন্দ স্বামী গৌরীশানন্দের পশ্চাদ্বর্তী ছিলেন। অগ্রবর্তী স্বামী পর্দা একটু উঠাইতেই হরি মহারাজ বলিলেন, "কে?" শরৎ মহারাজ গৌরীশানন্দজীকে একটু টিপিয়া দিলেন। শরৎ মহারাজের ইঙ্গিতে গৌরীশানন্দজী নিরুত্তর রহিলেন। অধিকন্তু সেবক সনৎ মহারাজ হরি মহারাজের সম্মুখে ছিলেন। শরৎ মহারাজ নির্বাক হইয়া অতি সন্তর্পণে ঘরে ঢুকিয়াই সেই উচ্ছিষ্ট জলময়

---

* স্বামী গৌরীশানন্দ-কথিত।

স্থানে একেবারে সাষ্টাঙ্গ হইয়া হরি মহারাজের পা ধরিয়া প্রণাম করিতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে প্রণাম করিতেছ ?" শরৎ মহারাজ তখন বলিলেন, "আমি শরৎ। তুমি এখানে আছ। মহারাজের ইচ্ছা, তোমাকে প্রণাম করেন। আমি ত ভাই সে প্রলোভন ছাড়তে পারলাম না।" হরি মহারাজ অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া বেদনার সুরে বলিলেন, "শরৎদা, আমি অন্ধ হয়ে পড়েছি। তাই তুমি আমাকে এইভাবে অপ্রস্তুত করলে! আমি কি জানি না, তুমি কে? নীলকণ্ঠ পাহাড়ের[১] ঘটনা কি আমি ভুলে গেছি ?"

একবার হরি মহারাজের পায়ে একটি বিস্ফোটক হয়। উহা সারিয়া গেলেও কিছুদিন তাঁহার পায়ে ব্যথা ছিল এবং হাঁটিতে কষ্ট হইত। সেই সময়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ কাশীতে। একদিন তিনি সেবাশ্রমের মাঠে পদচারণ করিতেছেন—হরি মহারাজও তাঁহার সঙ্গ লইলেন। বেশ কিছুক্ষণ বেড়াইবার পর হরি মহারাজকে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া চলিতে দেখিয়া রাজা মহারাজ বলিলেন, "একি হরি মহারাজ, আপনি খুঁড়িয়ে হাঁটছেন ?" হরি মহারাজ উত্তর দিলেন—"হাঁ, পায়ে একটা ব্যথা আছে, বেশী হাঁটলে কষ্ট হয়।" রাজা মহারাজ দুঃখিত হইয়া

১ স্বামী সারদানন্দ ১৮৯০ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে শিবরাত্রির দিন হৃষীকেশ হইতে নীলকণ্ঠেশ্বর শিব দর্শন করিতে যান। তাঁহার সঙ্গে ২।৩ জন গুরুভ্রাতা ছিলেন। স্থানটি পর্বতবেষ্টিত, জঙ্গলাকীর্ণ ও শ্বাপদসঙ্কুল। ফিরিবার সময় শিবভাবে বিভোর হইয়া আসিতেছিলেন। নির্জন বনপথে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। সঙ্গিগণ অগ্রগামী ছিলেন; সারদানন্দজী তাঁহাদের সহিত মিলিতে না পারিয়া পথভ্রষ্ট হইলেন। বিপদে ধীর স্থির থাকা তাঁহার স্বভাব ছিল। শীতপ্রধান বনভূমে সঙ্গিহীন হইয়া একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া পড়িলেন এবং শিবধ্যানে মগ্ন হইলেন। ধ্যানমগ্ন অবস্থায় সারারাত্রি কাটিল। আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখেও স্বামী সারদানন্দ বিচলিত হইলেন না, ঈশ্বরের ধ্যানে ডুবিলেন। পরদিন প্রভাতে সঙ্গিগণ তথায় তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়া নিরুদ্বেগ হইলেন।

বলিলেন—"আহা, আগে বলেন নি কেন পায়ে ব্যথা আছে ও কষ্ট হচ্ছে! তা হলে বসতুম।" হরি মহারাজ বলিলেন—"সে কি মহারাজ, আমার জন্যে আপনি বসবেন! আর আপনার সঙ্গে ও কথায় এত আনন্দ হচ্ছিল যে পায়ের ব্যথার কথা ভুলে গিছলাম।" গুরুভ্রাতার উপর কি ভালবাসা!

জনৈক সাধু স্বামী তুরীয়ানন্দকে পুনঃ পুনঃ তাঁহার তপস্যা ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেন। হঠাৎ একদিন তিনি তদুত্তরে বলিলেন, "কি আর করেছি ও কি আর হয়েছে? একবার ইচ্ছা হল, ঘুমটা কমান যাক্ এবং সর্বদা ঈশ্বরের অনুধ্যান করি। ইহার পর দিনের বেলা আদৌ ঘুমাতাম না। ঘুম আমার এমনি কম ছিল। রাত্রেও ঘুম কমাতে লাগলাম। ঘুম কমাতে কমাতে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দেড় ঘণ্টার বেশী ঘুম হত না। কিছুদিন পরে দেখি, ঘুমের তত আর প্রয়োজন হচ্ছে না, ধ্যান খুব গভীর ও দীর্ঘ হচ্ছে এবং শরীর-মনের বিশ্রাম ধ্যানেই পাওয়া যাচ্ছে। তখন ধ্যান strain (জোর) করে করতে হত না, আপনা আপনিই তৈলধারাবৎ ধ্যান চলত। শেষে রাত্রে ঘুম আদৌ হত না, আমিও চেষ্টা করতাম না। বহুঘণ্টাব্যাপী গভীর ধ্যান হতে লাগল। দিবারাত্রি আদৌ ঘুম নাই, নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানচিন্তার স্রোত চলছে। নিদ্রার অভাবে মনের বা দেহের ক্লান্তি হত না। এইরূপে সাত-আট দিন বেশ কাটল। তারপরে ভাবনা হল, ঘুমটা কমাতে গিয়ে একেবারে চলে গেল নাকি! তখন স্বামীজীর কথা মনে পড়ে গেল। তাঁর ভাল ঘুম হত না, অতিকষ্টে অল্পস্বল্প হত। সেজন্য তাঁর খুব strain (ক্লান্তি) হত, এবং শরীর ভেঙ্গে গিছল। গভীর রাত্রে একদিন মনে হল, ঘুমটা একেবারে যাওয়া ভাল নয়। চেষ্টা করে ঘুমোতে হবে। চোখ বুজে ঘণ্টাখানেক শুয়ে

রইলুম। দুই-তিন দিন এইরূপ চেষ্টা করতে করতে অল্প তন্দ্রা এল। পরদিন একটু ঘুমও এল। ঘুম চেষ্টা করে বাড়াতে বাড়াতে পূর্বাভ্যাস ফিরে এল। ধ্যানকালে তখন ধ্যেয় ও ধ্যাতার মধ্যে মাত্র কাঁচের মত ব্যবধান থাকত। ঠাকুর যাকে নির্বিকল্প সমাধি বলতেন তাতে কাঁচ-ব্যবধানও থাকে না, ধ্যেয় ও ধ্যাতা একীভূত হন। একবার সে সময়ে সেই অবস্থাও হয়েছিল। জীবনে যখন যা ধরেছি, তা শেষ পর্যন্ত দেখেছি। কোন বিষয় একটু একটু বা আস্তে আস্তে করতে পারতাম না। খুব পুরুষকার ছিল, সর্বদা sure success (নিশ্চিত সাফল্য) দেখতে পেতাম। চেষ্টা করে কোন বিষয়ে অকৃতকার্য হই নি।"

বৃদ্ধ বয়সে রোগাক্রান্ত হইয়া হরি মহারাজ একরূপ শয্যাশায়ী ছিলেন। তখন অপরের সেবার উপর তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইত। এই অবস্থায় একজন অল্পবয়স্ক সাধুকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা আমাদের কি দেখলে? একটি শিশু জন্মিয়াই দেখে তার পিতামহ লাঠি ভর দিয়া বেড়ায় এবং প্রায়ই শুইয়া থাকে। তোমরা আমাদের এইটা মাত্রই দেখলে। সারাজীবন আমরা যে কঠোর তপস্যা করেছি, তা ত আর দেখ নাই।" আমেরিকায় অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে তুরীয়ানন্দজীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াও তিনি বহু বৎসর কঠোর তপস্যা করেন। ইহার ফলে তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া যায় এবং তিনি শয্যাশায়ী হন। এই শয্যাশায়ী অবস্থায়ও কাশীধামে তাঁহার আধ্যাত্মিক উপলব্ধির বিরাম ছিল না। ঐসময়ে স্বামী অচলানন্দকে একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, "কেদার বাবা! মা কি ঘুমিয়ে আছেন? তিনি এইখানে (নিজের বুকে হাত দিয়া) সদা জেগে আছেন। অর্থাৎ, আমি যা বলি তা মৌখিক নহে, সর্বদা প্রত্যক্ষ অনুভূত।"

স্বামী তুরীয়ানন্দ যখন বৃন্দাবনে কঠোর তপস্যা করিতেন তখন একটি ব্রজবাসী যুবক তাঁহার নিকটে মাঝে মাঝে আসিতেন। পরে শেষ জীবনে যখন তিনি কাশীধামে ছিলেন তখন উক্ত ব্রজবাসী ঘটনাক্রমে কাশী আসিয়া তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করেন। তখন হরি মহারাজ তোষক-পাতা খাটের উপর তাকিয়া হেলান দিয়া বসিয়া আছেন। ব্রজবাসী তাঁহার বৃন্দাবনের অবস্থা স্মরণ করিয়া বলিলেন, "সে এক অভিনব দৃশ্য, পরমহংসমূর্তি!" যুবকটি চলিয়া যাইতে হরি মহারাজ বলিলেন, "ও কি বুঝেছে? (নিজেকে লক্ষ্য করিয়া) পরমহংস ত এই!" কাশীধামে স্বামী তুরীয়ানন্দ অনুরক্ত সেবকগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া স্বীয় জীবন এবং স্বামীজী সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছিলেন—"ছেলেবেলা থেকেই আমার আদর্শ সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করবার এবং সেইভাবে চলবার চেষ্টা ছিল। সর্বদা মনে হ'ত আদর্শ জীবন ঠিক চলছে কিনা এবং ভেবেও দেখতাম। সদাই মন ঘড়ির কাঁটার মত সব দিক লক্ষ্য করে চলবার চেষ্টা করত। অভ্যাসও হয়ে গেল সর্বদা তাঁকে নিয়ে থাকা। শাস্ত্রচর্চা মানে তাঁর আলোচনা। ধর্মপ্রসঙ্গ প্রভৃতি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতে পারতাম এবং এখনও পারি। শরীর অপটু হয়ে পড়লেও মন ঠিক আছে। মন বুঝতেই পারে না যে, শরীর বৃদ্ধ ও অক্ষম হয়ে পড়েছে। সে সর্বদা **highest** (সর্বোচ্চ) জিনিস শুনতে ও বলতে চায়।

"মনটা কোন সময়ই আদর্শ থেকে বেশী নেমে যেতে চায় না। **Intelligent** (বুদ্ধিমান) লোক ও ভক্ত হলে কথা কয়ে বেশ সুখ হয়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা চর্চা করতে ইচ্ছা করে। তখনকার মত সব ভুল হয়ে যায়।

"তাঁতে ডুবে থাকাই আসল কাজ। 'এই যদি না হ'ল তবে

মনুষ্যজীবন বৃথা। ঠাকুরের কৃপায় আমাদের মন অন্যদিকে যায়ই না গেলেও তৎক্ষণাৎ আবার তাঁতেই ফিরে আসে, যেন চুম্বকে টেনে রেখে দিয়েছে। স্বামীজীর সঙ্গে থাকলে সব মনটা স্বামীজীর দিকেই পড়ে থাকত। তাঁর সঙ্গে কথা কইবার সময় সমস্ত মনটা দিয়েই কথা কইতে হ'ত। তাঁর কথাও অদ্ভুত, কাজও অদ্ভুত! তাঁর কথা আর বলে শেষ করা যায় না। এত অধিক সর্বতোমুখী প্রতিভা কোথাও দেখতে পাই নাই। সব বিষয়ে তাঁর foresight (ভবিষ্যৎ দৃষ্টি) ছিল। তাঁর ভাব, তাঁর ভাষা বহুদূর পর্যন্ত মনকে টেনে নিয়ে যেত। আর কারু সঙ্গে কথা কয়ে বা মিশে এত সুখ, এত আনন্দ আর কখনও পাই নাই। সে জিনিস ভোলা অসম্ভব, বলা অসম্ভব। তাঁর কথা আমাদের কাছে দেবাদেশের মত ছিল। তাঁর সঙ্গে এত ভালবাসা ছিল যে, তাঁকে ছেড়ে যেন থাকতে কষ্ট হ'ত। যদিও শেষ ২।৩ বৎসর তাঁর কাছে থাকবার সুযোগ হয় নি, তথাপি বেঁচে আছেন মনে হলেই দেখাও হবে, কথাও হবে, এই আশা ছিল। তাঁর শরীরত্যাগের সংবাদ শুনে খুব shock (আঘাত) পেয়েছিলাম। তাঁর কথা ও কাজ যেন এ জগতের নয়, মনে হ'ত। স্বামীজী আমায় বলেছিলেন, 'হরি ভাই, আমি যা কিছু করলাম, সবই ঠাকুরের কাজ, মার কাজ। আমার দ্বারা তিনি জোর করে করিয়ে নিলেন। এ করব, ও করব, তা করব—এরূপ অনেক কথাই ভেবেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি যা করিয়ে নিলেন তাই হ'ল। এসব কাজ বিবেকানন্দ করেন নি, তিনি জোর করে করিয়ে নিয়েছেন। আমি যন্ত্রস্বরূপ হয়েই করতে বাধ্য হয়েছি। অন্যরূপ করবার ইচ্ছা থাকলেও করতে পারি নি। যা হয়েছে তাতেই আমি খুব খুশী। এখন কাজ ছেড়ে দিয়েও খুব খুশী। তোমরা যা করছ এও তাঁর কাজ। এখন ঐরূপই চলুক।'"

স্বামী তুরীয়ানন্দ শাস্ত্রজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞ সন্ন্যাসী হইয়াও পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি বলিতেন, "জ্ঞানলাভের পর আবার এমন অবস্থা হয়েছিল যে, মা মা বলে কেঁদে ভাসিয়েছি ও বলেছি—মা, সব শাস্ত্রজ্ঞান ভুলিয়ে দাও। 'দে মা আমায় পাগল করে, আর কাজ নাই জ্ঞানবিচারে।'" তাঁহার মুখে শ্রীশঙ্করাচার্যকৃত বিষ্ণুষট্‌পদী স্তোত্রের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি প্রায়ই শুনা যাইত। ইহাতে ভগবদ্‌ভক্তির মহিমা কীর্তিত হইয়াছে।—

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বং।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ ॥[১]

এই সম্বন্ধে এক পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, "মুক্ত হইয়াও কেহ কেহ প্রভুর লীলাসহচররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা নিত্যমুক্ত। ভাগবতে (১।৭।১০) তাঁহাদের সম্বন্ধেই এই কথা বলিয়াছেন—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিং ইত্থংভূতগুণো হরিঃ ॥[২]

স্বামী তুরীয়ানন্দ সম্ভবতঃ স্বীয় বিমুক্ত অবস্থার ইঙ্গিত দিতেছেন। পূর্ণ জ্ঞানের পরও জন্ম হয়, একথা তিনি বলিতেন এবং ঠাকুরের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইতেন। 'পাকা খেলোয়াড়ের ভয় নেই। সে পাকা ঘুঁটি কাচিয়ে খেলে। পাশার দান নিজের হাতে। কচ্চে বার চাইলেই তার কচ্চে বার পড়ে।' স্বামী জগদানন্দ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এইরূপ অবস্থায় জ্ঞানীর জ্ঞানের কিছু অল্পতা

১ —হে নাথ, তোমার সহিত আমার ভেদ অপগত হইলেও আমি তোমার, তুমি আমার নহ। তরঙ্গ সমুদ্রেরই হয়, সমুদ্র কখন তরঙ্গের হয় না।

২ শ্রীহরির এইরূপ মহিমা যে, বন্ধনমুক্ত ও আত্মারাম মুনিগণও উরুক্রম বিষ্ণুতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

থাকে কি না।" তদুত্তরে স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিয়াছিলেন, "না, জ্ঞানের আদৌ অল্পতা থাকে না। পূর্ণ জ্ঞানলাভের পর এরূপ হয়।" এইসব কথা স্বামী জগদানন্দ-প্রমুখ সাধুদের সম্মুখে বহুবার তিনি বলিয়াছিলেন। পুনর্জন্ম সম্বন্ধে হরি মহারাজ বলিতেন, "স্বার্থে জন্মগ্রহণই দূষণীয়। স্বার্থ না থাকলে জন্মগ্রহণে দোষ কি?" স্বামী কমলেশ্বরানন্দ তাঁহার সাক্ষাতে 'যোগবাশিষ্ট রামায়ণ' পাঠ করিতেন। উক্ত গ্রন্থের 'নির্বাণ-প্রকরণ' শ্রবণ-সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন, "কখন কখন ধ্যানকালে মনে হইয়াছে, জগৎটা দূরে একখণ্ড মেঘের মত।" 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'র বর্ণনা শুনিয়া কোন কোন সময়ে তাঁহার এইরূপ অনুভূতি হইত। যখন মহাভারতের 'শান্তিপর্ব' তাঁহার সম্মুখে পাঠ হইত, তখন প্রহ্লাদের পাতাল-গমনের পর তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ পঠিত হয়। তাহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "উক্ত অনুভবটি তাঁহার হইয়াছে।" প্রহ্লাদের উপদেশে 'জগৎ নাস্তি, অস্তি, ভবিষ্যতি' প্রভৃতি কথা আছে। এই তত্ত্ববাক্যে প্রথমে তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। পরে তত্ত্বটি স্বানুভূত হইলে তাঁহার বিশ্বাস হয়।

স্বীয় অনুভূতির কথা স্বামী তুরীয়ানন্দ কাশীতে একদিন এইভাবে বলিয়াছিলেন—"এক সন্ধ্যায় গঙ্গাধর প্রভৃতির সঙ্গে গঙ্গাতীরে বসে আছি। একে একে সবাই বাড়ী চলে গেল। তখন একাকী ধ্যান করতে বসলাম। রাত প্রায় দুটো বেজে গেছে, তখন কে বললে—চল, বাড়ী যাই। এই কথায় যেন আমার মাথায় লাঠি মারলে। তখন বুঝলাম সবটা মনের। বাড়ী-টাড়ী তো কিছুই নেই, মনে ভেবে এসেছি একটা বাড়ী আছে সেখানে যেতে হবে। তখন সঙ্কল্প করলাম—মনের এই ভাব নাশ করতে হবে। তারপর ক্রমে বাড়ী-টাড়ী সব গেল। এখন দেখছি ওসব কিছুই নেই। এই realisation (অনুভূতি) আর কি!'

Realisation-এর কি আর মাথামুণ্ডু আছে? সেটা ideal রাজ্যের জিনিস, সেটাকে real (বাস্তব) করাই realisation (অনুভূতি)।”

কাশীধামে থাকাকালে হরি মহারাজ শীতকালে ভোর চারটায় এবং গরমকালে পাঁচটায় প্রত্যহ উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য-সমাপনান্তে ধ্যানে বসিতেন। সেই সময়ে তাঁহার ঘরে ভগবদ্ভাব যেন জমাট বাঁধিয়া যাইত। সাধুগণ যখন ঐ কক্ষে তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিতেন তাঁহাদের চিত্তও যেন স্বতঃই ভাবে অন্তর্মুখ হইয়া যাইত। সকলের মনকে টানিয়া উচ্চভাব-ভূমিতে লইয়া যাইবার তাঁহার অসীম ক্ষমতা ছিল। কয়েকজন সেবক বলেন, হরি মহারাজের কাছে তাঁহারা যতক্ষণ থাকিতেন ততক্ষণ তাঁহাদের মন অন্য চিন্তা করিতে পারিত না, ইষ্টচিন্তায় তৎপর থাকিত।

প্রতি সন্ধ্যায় হরি মহারাজ নিজে যেমন ধ্যানে বসিতেন, তেমনি সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলিলে সাধুগণ স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া আসনে ধ্যানে বসিবেন, ইহাই ছিল তাঁহার অভিপ্রেত। সন্ধ্যার পর তাঁহার সেবকগণ আশ্রমের বাহিরে থাকিলে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। গরমের দিনে স্নানান্তে কপাল বুক বাহু কণ্ঠ কোমর ও পিঠ তিনি চন্দনচর্চিত করিতেন, তাহার পর ধ্যানে বসিতেন। সমস্ত ঘরটি একটি চমৎকার সুগন্ধে আমোদিত হইত।

স্বামী তুরীয়ানন্দের অন্যতম সেবক স্বামী অনন্তানন্দ বলিয়াছিলেন—“হরি মহারাজের সমস্ত কাজ যেন কলের মত পর পর ঠিক একই সময়ে নিষ্পন্ন হত। রাত থাকতে ওঠা এবং প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে ধ্যান, ধ্যানের পর কিছুক্ষণ পায়চারী করে পড়তে বসা। তাঁর কি অধ্যয়ন-নিষ্ঠা ছিল! এত যে অসুখ—তাতেও নিয়মিত পড়াটি চলত। পড়তে পড়তে বেলা হয়ে যেত—আমরা সতর্ক করে দিতুম, ‘মহারাজ বেলা হয়ে যাচ্ছে, নাইতে হবে।’ ‘হু’, বলে তিনি আবার পড়তে লেগে যেতেন। এ রকম দু’-তিন বার ডাকার পর তিনি বই ছেড়ে উঠতেন। তেল

মাখাবার আগে উরুতে হাত চাপড়ে পালোয়ানের মত সহাস্যে বলতেন—'এস, তোমাদের সঙ্গে কুস্তি লড়ি।' কয়েকবার এইরকম হাত-পা ছুঁড়ে তেল মাখতে বলতেন। যা পড়েছেন তা আমাদের তখন শোনাতেন, বলতেন—'দেখ, স্বামীজী যা যা পড়তেন তা খাবার সময় বা অন্য সময় আমাদের শোনাতেন। তাতে তাঁর পুনরাবৃত্তি হত এবং বিষয়টি একেবারে চিরকালের জন্য আয়ত্ত হয়ে যেত। আর আমাদেরও শেখা হত।' বিকালে বেড়িয়ে এসে জুতাজোড়াটি পর্যন্ত একইভাবে রাখা চাই, একটু এদিক ওদিক হবার যো নেই।"

হরি মহারাজ সাধারণতঃ শীতকালে এগারটায় এবং গ্রীষ্মকালে দশটায় খাইতেন। আহারান্তে বিছানায় শুইয়া একটু বিশ্রাম করিতেন। ঘুম বড় হইত না। ঘরের মধ্যে কে আসিল বা কে গেল টের পাইতেন। দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া শুইলেও কেহ ঘরে আসিলে তাঁহার নাম ধরিয়াই ডাকিতেন, তাঁহার নিদ্রা স্বভাবতঃই খুব কম ছিল। একদিন হরি মহারাজ স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দকে একখানি বিদেশী চিঠিতে টিকিট লাগাইয়া ডাকে ফেলিতে বলেন। চিঠিখানি এবং টিকিটগুলি লইয়া জ্ঞানেশ্বরানন্দ চলিয়া আসিবার সময় বাতাসে একটি টিকিট উড়িয়া খাটের নীচে পড়ে। তিনি টের পাইলেন না—কিন্তু উহা হরি মহারাজ লক্ষ্য করিলেন। পথে টিকিট কম দেখিয়া জ্ঞানেশ্বরানন্দ সেবাশ্রমের অফিস হইতে পূরণ করিয়া চিঠি ডাকে দিলেন। হরি মহারাজকে এই কথা জানাইবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল না—কিন্তু তাঁহার সম্মুখে আসিয়া প্রকাশ না করিয়া পারিলেন না। হরি মহারাজ ভূপতিত টিকিটটি আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিলেন—"সামান্য সামান্য বিষয়ে আবশ্যকীয় মনোযোগ না থাকলে, বড় বড় বিষয়ে কি করে মনোযোগ দেবে? ব্রহ্মবস্তুতে দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে খুঁটিনাটি বিষয়েও নজর থাকে।"

একদিন কথাপ্রসঙ্গে হরি মহারাজ স্বামী অনন্তানন্দকে বলিয়াছিলেন, "দক্ষিণেশ্বরে একদিন ঠাকুর আমাকে বললেন, 'ওরে, যা ত পঞ্চবটীতে। ওরা সব চড়ুই-ভাতি খেয়ে গেছে। দেখ ত, কিছু ফেলে-টেলে গেছে কি-না। কিছু পড়ে থাকলে নিয়ে আয়।' আমি পঞ্চবটীতে গিয়ে দেখি, এখানে একটা ছাতা, ওখানে একটা ছুরি প্রভৃতি পড়ে রয়েছে। তারা সব চলে গেছে। আমি সব নিয়ে এলুম। ছুরিটা তাকের উপর রাখতে যাচ্ছি, এমন সময় ঠাকুর বল্‌লেন, 'কোথায় রাখছিস্? ওখানে নয়। এই ছোট খাটটার নীচে রাখ। ঐটে ওর জায়গা। যার যে জায়গা সেখানে ওকে রাখতে হয়। তুই তো তোর মতলব মত এক জায়গায় রাখলি। রাত্রির অন্ধকারে যদি আমার দরকার হয়, তখন কি আমি সমস্ত ঘর হাতড়াব, না তোকে ডেকে বেড়াব, কোথায় রেখেছিস্ বলে।' তোমরা যে সেবা কর ওতো সেবা নয়; তোমরা নিজেদের মতলব অনুযায়ী কাজ করে সেব্যের বিরক্তি উদ্রেক কর। ঠিক ঠিক সেবা করতে হলে নিজেকে একেবারে ভুলে যেতে হয়।"

হরি মহারাজ যেমন গম্ভীর ছিলেন তেমন রসিকও ছিলেন। মাঝে মাঝে নিজে সামান্য ব্যাপারে এমন হাসিতেন যে, হাসির ছটায় সেবক নিজেকে সংযত করিতে না পারিয়া ঢলিয়া পড়িতেন। আবার সেবক অধিক হাসিলে বলিতেন, "যত হাসি তত কান্না, বলে গেছে রাম শর্মা।" পরে সেবককে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য ডাকিতেন, "এই রাম শর্মা, এস ত।" তিনি গম্ভীর হইলেই সেবকের মনও অন্তর্মুখীন হইত। তখন তিনি বলিতেন, "কম্পাসের কাঁটা যেমন সর্বদা উত্তর মুখে থাকে সেরূপ অনবরত আমার মন তাঁর সঙ্গে যুক্ত। কম্পাসের কাঁটা যেমন জোর করে অন্যদিকে টেনে আবার ছেড়ে দিলে চুম্বকের আকর্ষণে পুনরায় উত্তরমুখী হয়, সেরূপ আমার মনকে তাঁর চিন্তা হ'তে জোর করে নামিয়ে কিছুক্ষণ

রঙ্গ-রস করলেও আবার ছেড়ে দিলেই সে ভগবচ্চিন্তায় মগ্ন হয়। হাস্য-কৌতুকের সময়ও মনের সামান্য অংশমাত্র নামে, অধিক অংশ যোগযুক্ত থাকে।" বৈকাল তিনটা হইতে চারটার মধ্যে হরি মহারাজ একটু ফলের রস খাইতেন। চারটা হইতে পাঁচটার মধ্যে স্বামী জগদানন্দ আসিয়া তাঁহাকে প্রায়ই মহাত্মা গান্ধীর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পড়িয়া শুনাইতেন। ইহার পূর্বেও তিনি চোখে চশমা লাগাইয়া এই কাগজটি পড়িতে ভালবাসিতেন। মহাত্মা গান্ধী তখন যে স্বাধীনতা-সংগ্রাম চালাইতেছিলেন তাহার প্রতি হরি মহারাজের আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। তাঁহার মতে স্বামীজীর স্বদেশোদ্ধার-কাজটি গান্ধীজী করিয়াছেন। সেবাশ্রমের অনতিদূরে অবস্থিত হিন্দু কলেজে মহাত্মা গান্ধী যে বক্তৃতা দেন তাহা স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বয়ং সভাস্থলে যাইয়া শুনিয়াছিলেন। যেদিন গান্ধীজী সেবাশ্রম পরিদর্শন করেন, সেদিন তাঁহাকে দেখিয়া হরি মহারাজ বলিয়াছিলেন, "এঁকে দেখলে মনে হয় যেন যোগযুক্ত, একদিকে চোখ। যেটি দেখাতে নিয়ে যাচ্ছ সেটিই দেখছেন, অন্যদিকে চোখ নেই। অন্য অন্য যে নেতারা সেবাশ্রমে এসেছেন তাঁদের যেন পাঁচ-সাতটা করে চোখ, মন বিক্ষিপ্ত। যেটা দেখাচ্ছ সেটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে আরও পাঁচটা জিনিস দেখে নিচ্ছেন।" দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মহাত্যাগে তিনি অতিশয় আনন্দ প্রকাশপূর্বক স্বামী কালিকানন্দকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা শীঘ্র স্বরাজ দেখবে, আমি ততদিন থাকব না।"

বৈকাল পাঁচটা হইতে ছয়টার মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থপাঠান্তে তিনি সেবাশ্রমে কিছুক্ষণ পায়চারী করিতেন। ইতোমধ্যে তাঁহার গৃহের সম্মুখস্থ ময়দান জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইত। তিনি তাহার উপরে একটি চেয়ারে বসিয়া বিশ্রাম করিতেন। তখন তাঁহার সম্মুখে বেঞ্চে আসিয়া ভক্তগণ বসিতেন। তিনি তাঁহাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ

সংপ্রসঙ্গ করিতেন। তাঁহার নৈশ আহার হইত রাত্রি আটটায়। তখন তিনি সাত-আটখানি লুচি খাইতেন। লুচি না ফুলিলে বলিতেন, "মন ছিল কোথায়? ষোলআনা মন দিলে এই সামান্য কাজ সংসিদ্ধ হবে না কেন? যখন যেটা করবে তখন সেটায় পুরো মন দিলে সাফল্য সুনিশ্চিত।" একজন সেবক অন্যের সাহায্যে তাঁহার বিছানার চাদরটি উল্টাইয়া পাতিয়া দেন। তাহাতে তিনি বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, "যার যে কাজ, সে সেটা একলাই করবে, অন্যের সাহায্য নেবে কেন?" পরে জানা গেল, যাহার সাহায্য লওয়া হইয়াছিল তিনি আদর্শে সুপ্রতিষ্ঠিত নহেন বলিয়া হরি মহারাজ তাঁহার সেবা লইতে চাহিতেন না। সেবকগণ স্নানাহার করিয়া আসিলে তিনি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন, খাওয়ার সময় কে কে ছিল এবং কি কি কথা হল, ইত্যাদি। সেবকদের স্নানাহার সারিতে দেরী হইলে তিনি বিরক্ত হইয়া বলিতেন, "চকড়বা ক'রো না, বহির্মুখী হ'য়ো না। যেটা নিয়ে আছ, সেটায় সব মন রাখ।"

স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ (সুধীর) ছাত্রজীবনে ১৯১৯ খ্রীঃ কাশীধামে স্বামী তুরীয়ানন্দকে প্রথম দর্শন করেন। তিনি সেবাশ্রমে যাইয়া দেখেন, অম্বিকা কুটিরে বাহিরের বারান্দায় এক সৌম্যমূর্তি সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ হইতে যেন জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছে। জ্ঞানাত্মানন্দ তাঁহাকে প্রণামান্তে সঙ্গীর নিকট হইতে জানিলেন, ইনি স্বামী তুরীয়ানন্দ। দৈহিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তখন তিনি ধীরস্থিরভাবে বহুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া সমবেত ভক্তগণের নিকট সুন্দর সুমিষ্ট ভাষায় নানা শাস্ত্র হইতে শ্লোকোদ্ধারপূর্বক প্রত্যেকের জীবনসমস্যা-সমাধানের চেষ্টা করিতেন। সমবেত যুবকদের মধ্যে কেহ কেহ ঘোর শাস্ত্রজ্ঞানহীন সংশয়বাদী ছিলেন। তাঁহারা হরি মহারাজের জ্ঞানগর্ভ উপদেশের মর্ম বুঝিতে না পারিলেও ব্যাখ্যা-কৌশলে মুগ্ধ হইতেন।

একদিন স্বামী তুরীয়ানন্দ গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের এই শ্লোকটি গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করিলেন—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥

শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়া তিনি বলিলেন, আত্মাকে আত্মার দ্বারাই উদ্ধার করিতে হইবে। আত্মাই প্রকৃত বন্ধু। তাঁহাকে না জানিতে পারিলেই তিনি শত্রু হইয়া পড়েন। তিনি ব্যতীত উদ্ধার করিবার জগতে আর কেহ নাই। আমাদের সকলের তাঁহারই শরণ লইতে হইবে। কেহ কেহ তাঁহার মুখে পূর্বে বহু শ্লোকের আবৃত্তি শুনিলেও সেদিনের আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা তাঁহাদের প্রাণে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করিল। কাহারো কাহারো মনে হইল, তাহাদের মধ্যে সেই মহান্ আত্মা আছেন ; তাঁহাকে জানিতে না পারিলে জীবনের সবই বৃথা হইবে। স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ (সুধীর) হরি মহারাজের কাছে প্রায়ই যাইতেন। কোন কোন যুবক তাঁহার সহিত তর্ক-বিতর্ক করিতেন। হরি মহারাজ কখনও মৃদু হাস্যে, কখনও বা তীব্র তিরস্কারে তাঁহাদের সংশয় নিরসন করিতেন। একদিন বৈকালে সুধীর তাঁহার সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে সেবাশ্রমের নিকটে দেখিলেন, বহু যাত্রী দেশবিদেশ হইতে সমাগত। সেদিন পূর্ণিমা তিথি ও চন্দ্রগ্রহণ ছিল। হরি মহারাজ তাহাদের দেখিয়া যুবক সঙ্গীকে বলিয়া উঠিলেন, "দেখ, দেখ, কি ভক্তি নিয়ে কত দূর দেশ হতে এই যাত্রীরা এসে একত্রিত হয়েছে! আজ চন্দ্রগ্রহণ। তারা গঙ্গাস্নান করে ধন্য হবে।" ইংরেজী-শিক্ষিত যুবক সুধীর গ্রহণ-বিষয়ে বর্তমান জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অভিমত জানিতেন। বিদ্যাভিমানে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ, এ তো ঘোর কুসংস্কার। রাহু তো কখন চন্দ্রকে গ্রাস

করে না। পৃথিবীর ছায়ামাত্র পড়ায় চন্দ্রকে রাহুগ্রস্ত দেখায়। এতগুলি লোক কেন এই ভ্রান্ত ধারণায় পড়ে চন্দ্রকে রাহুগ্রস্ত ভাববে ও গঙ্গাস্নানে পাপ-মুক্তির চেষ্টা করবে?" স্বামী তুরীয়ানন্দ গম্ভীর হইয়া উত্তর দিলেন, "তুমি কি এই বিষয়ে সবই জেনে ফেলেছ? কোন্ অনাদিকাল থেকে এইরূপ কত ভক্ত এসে এইভাবে মনের ময়লা ধোবার প্রয়াস করছে। তার কি কোন ফলই নেই?" যুবক একথা নির্বিচারে না মানিয়া লইয়া পঠিত পুস্তকের বুলি আওড়াইতে লাগিলেন। হরি মহারাজ সেদিন আর কোন কথা না বলিয়া সেবাশ্রমে ফিরিয়া উপস্থিত সাধুদের বলিলেন, "শোন, এই ছেলেটি গ্রহণ সম্বন্ধে কি বলছে।" সাধুগণ হাসিতে লাগিলেন।

পরদিন সেবাশ্রমে সুধীর আসিতেই হরি মহারাজ সস্নেহে তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, "গ্রহণ-স্নানের কথা কাল যা বলছিলে, ওর অনেক অর্থ আছে। আমাদের ঋষিগণ শাস্ত্রে কোন বিষয় বৃথা লিখে যান নাই। ছোট বালক দেখেছ তো? তারা সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর থাকে। একদল সুবোধ—তাদের অভিভাবকগণ বললেই তারা পড়তে বসে যায়। দ্বিতীয় দলকে পড়াশুনা করাবার জন্য মিঠাই-মণ্ডা প্রভৃতি উপহার দিতে হয়; এরা ঐ লোভেই পড়ায় মনোযোগ দেয়। কিন্তু আর একদল বালক আছে যারা এতেও ভুলে না; তাদের জন্য বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা করতে হয়। তা না হলে তারা পড়তে বসে না। আমাদের শাস্ত্রকার ঋষিগণ দেখেছেন, মানবসমাজে এইরূপ তিন শ্রেণীর লোক আছে। যারা সুকৃতিমান তারা শাস্ত্রবাক্য শুনেই সংসারের অনিত্যত্ব হৃদ্‌গত করে নিত্যবস্তুলাভের জন্য ধাবিত হয়। কিন্তু এরূপ ভাগ্যবানের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। তাই শাস্ত্রকারগণ অন্য-শ্রেণীর লোকের জন্য মোদক বা পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছেন এবং বলেছেন,

'প্রকৃতির এইসব পরিবর্তনের সময় এইরূপ ভজন-পূজন ও অনুষ্ঠানাদি কর। ওতে বিশেষ ফল পাবে। অর্থাৎ অক্ষয় স্বর্গাদি লাভ হবে। একদল লোক এই লোভেই ধর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় এবং অন্ততঃ সেই সময়টুকু সমগ্র মন-প্রাণ দিয়ে ঈশ্বরের চিন্তা করে। কিন্তু ইহা ছাড়া আরও একশ্রেণীর লোক আছে যারা অনিত্য সুখের লোভ ছাড়তে পারে না। শাস্ত্রকারগণ তাদের জন্যই বেত্রাঘাত বা নরকাদির সৃষ্টি করেছেন। শাস্ত্রকারদের উদ্দেশ্য, যেকোন প্রকারেই হ'ক মানব-মনকে ভগবানের দিকে আকৃষ্ট করা। ঈশ্বর-চিন্তায় প্রবৃত্ত হলে ক্রমে মানুষ অনন্ত সুখের সন্ধান পাবে। তাই এসকল পুরস্কার ও প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থা। যাঁরা প্রতিক্ষণ তাঁর নাম করতে পারেন, তাঁদের অবশ্য এসকলের কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু এ শ্রেণীর লোক সংসারে কজন আছে বল তো ?"

আর একদিন সুধীর তুরীয়ানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, "মহারাজ, গঙ্গাস্নান করে কি লাভ হয় ?" হরি মহারাজ বলিলেন, "তুমি কি গঙ্গাকে সামান্য নদীমাত্র মনে কর ?" পূর্বাপেক্ষা অধিক প্রগল্‌ভতার সহিত সুধীর উত্তর দিলেন, "না মহারাজ, কাশীতে গঙ্গার যে রূপ দেখছি তাতে একে নদীও বলা যায় না।" ইহা শুনিয়া হরি মহারাজ হাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীরভাবে বলিলেন, "যাদের লিখিত পুস্তকের তু'চার পাতা পড়ে তোমরা আজ তোমাদের দেশের শাস্ত্রোক্ত দেবদেবীগণকে এরূপ অশ্রদ্ধা করতে শিখেছ, জান কি, স্বামীজী তোমাদেরই সেই শাস্ত্র নিয়ে তাদের (বিদেশীদের) মস্তকে পদাঘাত করে এসেছেন ? এই গঙ্গার মাহাত্ম্য পড়তে পড়তে তিনি ভাবে অভিভূত হয়ে পড়তেন। শুধু তিনি কেন, অনাদিকাল থেকে কত মুনি-ঋষি এই গঙ্গার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে গেছেন। এমন

কি, অদ্বৈতবাদী আচার্য শঙ্করও গঙ্গামাহাত্ম্য বর্ণনা করতে পরাঙ্মুখ হন নি। তোমরা দু-একখানি পাশ্চাত্ত্য পুস্তক পড়েই আজ গঙ্গাকে অনাদর করতে শিখলে?"

এই প্রসঙ্গে স্বামী তুরীয়ানন্দের গঙ্গাভক্তি সম্বন্ধে দুই-একটি কথা না লিখিলে বিষয়টি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। বহুদিন দেখা যাইত, অতি অসুস্থ শরীর লইয়াও তিনি পদব্রজে প্রায় দুই মাইল পথ চলিয়া গঙ্গা-দর্শনে যাইতেন এবং গঙ্গাতীরে দশাশ্বমেধ ঘাটে বসিয়া একাগ্রচিত্তে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া গঙ্গাদর্শন করিতেন। সেখানে পরিচিত কাহারও সহিত দেখা হইলে নীচ হইতে গঙ্গাজল হাতে আনিয়া তাঁহার সর্বাঙ্গে ছিটাইয়া দিতে বলিতেন। পরম জ্ঞানী হইলেও তিনি ঐ সময়ে অসুস্থ শরীরে অতিকষ্টে কয়েকবার বিশ্বনাথ-দর্শনেও গিয়াছিলেন। একবার শিবরাত্রির সময় অদ্বৈত আশ্রম ও সেবাশ্রমের সাধুব্রহ্মচারিগণ ৺বিশ্বনাথ-দর্শনান্তে ৺লবেশ্বর শিবের মাথায় জল দিয়া হরি মহারাজকে প্রণাম করিতে আসিলেন। কেদারবাবা, যোগী মহারাজ, মুরারী মহারাজ প্রভৃতি সাধুগণকে লক্ষ্য করিয়া হরি মহারাজ বলিলেন, "আজকের শুভদিনে বাবা বিশ্বনাথকে দর্শন করতে পারলুম না! ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সামর্থ্য নাই, কি করি!" এই বলিয়া তিনি দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার পায়ে খুব ব্যথা ছিল, বাহিরে যাইতে পারিতেন না। কেদারবাবা তখন তাঁহাকে বলিলেন, "আপনারা ঠাকুরের কৃপা-প্রাপ্ত মহাপুরুষ। আপনাদের অন্তরেই বাবা বিশ্বনাথ আছেন।" এই কথা শুনিয়া হরি মহারাজ বিশ্বনাথ মন্দিরের দিকে হাত জোড় করিয়া ভাবাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার কথা বন্ধ হইয়া গেল এবং চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু পড়িতে লাগিল। কাশীধামের মাহাত্ম্য তাঁহার মুখে মাঝে মাঝে শোনা যাইত। 'কাশী কা সম নাহি পুরী'—গানের এই

পদটি ভক্তিভরে গাহিতে গাহিতে তিনি বলিতেন, "কাশীর মত স্থান কি আর ভূভারতে আছে? শরীরবোধরহিত ত্রৈলঙ্গ স্বামীর মত কত মহাপুরুষই এখানে বাস করে কাশীকে পরম তীর্থে পরিণত করেছেন।"

সমাগত সাধুভক্তগণকে হরি মহারাজ প্রবল পুরুষকার সহায়ে পরম সত্যলাভের জন্য নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করিতেন। তরুণদের অভিমানে আঘাত করিয়া বলিতেন, "তোমরা কি ছেলে? তোমরা পিলেমাত্র।" উপহাসচ্ছলে একথাটি উল্লেখ করিয়া আরও বলিতেন, "ছেলে ছিলেন স্বামীজী! যাঁকে ঠাকুর বলতেন পুরুষ পায়রা, তার ঠোঁট ধরলেই সে ঠোঁট ছিনিয়ে নিয়ে যায়। যেন তেজস্বী বলদ, যার লেজে হাত দিলেই তিড়িং বিড়িং করে ওঠে। তোমরা কি এরকম হতে পার?"

একদিন সুধীর মহারাজ ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "মহারাজ, কিছু উপদেশ দিন।" তিনি উত্তর দিলেন, "ওহে, চোখে চশমা পরলে কি হবে? আগে চোখটি খোল, নতুবা চশমায় কোন কাজই হবে না।" আবার সেই 'উদ্ধরেৎ আত্মনাত্মানং' শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়া বলিলেন, "আত্মাকে স্বীয় পুরুষকার দ্বারাই উদ্ধার করতে হবে নতুবা কে তাঁকে উদ্ধার করতে পারে বল?" একটি যুবক কয়েক বৎসর রাজনৈতিক কারণে সরকারের নির্যাতন ভোগ করিয়া জেল হইতে মুক্ত হইয়া হরি মহারাজের নিকট আসিলেন। হরি মহারাজ তাঁহার সঙ্গে দুই-একটি কথা বলিয়াই তাহার তেজস্বিতার পরিচয় পাইলেন। ইহাতে পরম প্রীত হইয়া পরে বলিয়াছিলেন, "ছেলে হলে এরূপ ছেলেই চাই দেখনা, আমাদের মুখের সামনেই বলে গেল, 'যাঁরা সংসারত্যাগ করেছেন তাঁদের আমি coward (ভীরু) বলি। সংসারের দুঃখকষ্টের সঙ্গে তাঁরা যুদ্ধ করলেন না কেন?' ছেলেটি স্বামীজীর বই পড়েছে ও তাঁর বিশেষ ভক্ত। তাই তার ঐ কথার উত্তরে আমি বললাম, 'তোমার স্বামীজী?

তিনিও তো তাহলে ঐরূপ **coward** (ভীরু) ।' ছেলেটি তখন চুপ করে রইল ।"

স্থানীয় সেবাশ্রমের কর্মীদের মধ্যে যখন কোন কাজ-কর্ম লইয়া সামান্য সামান্য মনোমালিন্য হইত তখন হরি মহারাজ তাহাদিগকে তীব্র তিরস্কার করিয়া বলিতেন, "তোরা কিসের ধ্যান-ভজন করিস ? তোরা কি ঠাকুরঘরে গিয়ে মালাজপ করে এলি, না কলা চট্‌কালি ? ওরে, সন্তুষ্ট যদি কাউকে করতে হয় তো তোর ভিতরে যে অন্তরাত্মা আছেন, তাঁকেই সন্তুষ্ট কর। তখন দেখবি, সকলেই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। নতুবা এইসকল কাজ করে তোরা কাকে সন্তুষ্ট করতে যাচ্ছিস, বল্ ?" কোন যুবকের শরীর খারাপ যাইতেছিল। হরি মহারাজ নিত্যই তাহার কুশল-সংবাদ লইতেন। শরীর-বুদ্ধি তাহার ধর্মজীবনের অন্তরায় হইবে, ইহা জানাইবার উদ্দেশ্যে একদিন হরি মহারাজ তাহাকে বলিলেন, "দেখ, অপরের সংসারাসক্তির কথা বলছো। কিন্তু এই শরীরটিও তো সংসার, কি বল ?" সাধন-ভজনে প্রেরণা-দানের জন্য কোন যুবককে একদিন বলিয়াছিলেন, "দেখ, হরিণের নাভিতে কস্তুরী আছে। কিন্তু হরিণ তা জানে না। তাই পাগল হয়ে ওর সন্ধানে এদিক ওদিক বৃথা ঘুরে মরে। তোমরাও যখন অন্তরাত্মার অনুসন্ধান পাবে, তখন এরূপ ঘুরে মরবে না।"

আবার কখন কখন তিনি মাথায় কাপড় টানিয়া বলিতেন, "দেখ, ঠাকুরও এরূপে গামছায় মাথাটি ঢেকে বলতেন, 'তোমরা কি এখন আমাকে দেখতে পাচ্ছ। অথচ সামান্য একটি গামছা মুখটি আড়াল করে রেখেছে।' এইরূপে মহামায়া তাঁর সামান্য অবগুণ্ঠন দ্বারা হৃদয়স্থিত পরব্রহ্মকে আমাদের নিকট অজ্ঞাত রেখেছেন। এই অবগুণ্ঠন সরিয়ে ফেল। দেখবে, চিরদিন পরমাত্মা তোমার অন্তরে বিরাজমান।"

সাধু শান্তিনাথ তখন হরি মহারাজের নিকট প্রায়ই আসিতেন। শান্তিনাথজী তখন মৌনী, কঠোর তপস্যায় ব্রতী। অনেকে চিন্তিত ছিলেন যে, ইহার ফলে তাঁহার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিতে পারে। রোজই হরি মহারাজ তাঁহার শারীরিক কুশল-বার্তা জিজ্ঞাসা করিতেন। একদিন তাঁহার কঠোর তপস্যার কথা শুনিয়া সস্নেহে তাঁহাকে বলিলেন, "দেখ শান্তিনাথ, সবই তো করলে। কিন্তু জেনো, মহামায়ার কৃপা ছাড়া কিছুই হবার নয়। তাঁর শরণাগত হও।"

জনৈক সন্ন্যাসীর হাতে একটি মানচিত্র আসে। উক্ত মানচিত্রে ক্ষীর-সমুদ্র প্রভৃতি সপ্তসমুদ্র এবং জম্বু দ্বীপাদির ভৌগোলিক সংস্থান অঙ্কিত ছিল। মানচিত্রখানি স্বামী তুরীয়ানন্দকে দেখানো হইলে তিনি ভালরূপে দেখিয়া সহাস্যে বলিলেন, "কেউ কিছ্ছু জানে না। সব অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ছে। মায়ার রাজ্যে কে কতটুকু বোঝে ?"

প্রাচীনকালে গুরুকুলে থাকিয়া বিদ্যার্থীরা বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে চরিত্রগঠন করিত। বর্তমান যুগে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইলে ছাত্রদের প্রকৃত কল্যাণ হইবে—এই শুভ সংকল্প স্বামী তুরীয়ানন্দের মনে উদিত হয়। তিনি এই বিষয় যুবক সাধুদিগকে বারবার বলিলেন। তাঁহারা ইহা শুনিয়া চুপ করিয়া থাকিতেন। একদিন হরি মহারাজ একজনকে এই কথা বলিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "কি, তুমি কিছু উত্তর দিচ্ছ না ?" তিনি ভূমিষ্ঠ প্রণামান্তে নিবেদন করিলেন "আপনি কি সত্যাই মনে করেন আমার দ্বারা এই কাজ হবে ?' স্বামী তুরীয়ানন্দ—"নিশ্চয়ই। নচেৎ তোমাকে এত করে বলি কেন ?' যুবক সাধু—"আপনার আদেশপালনে আমি প্রস্তুত। তবে এত বড় কাজের জন্য অন্ততঃ দুইজন লোক দরকার। আমি ভেতরের কাজের ভার নিতে পারি। বাহিরের কাজের ভার নেবার জন্য স্বামী

সদ্‌ভাবানন্দকে বলুন। সে সম্প্রতি ঢাকা থেকে এসেছে।” স্বামী তুরীয়ানন্দের প্রস্তাবে স্বামী সদ্‌ভাবানন্দ প্রস্তাবিত কার্যের দায়িত্ব লইতে সম্মত হইলেন। তদনুসারে ব্রহ্মচর্যাশ্রম-প্রতিষ্ঠার আয়োজন আরম্ভ হইল। স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বয়ং দুইটি ছাত্রের ব্যয়ভার বহন করিতে অগ্রসর হইলেন। একটি পৃথক বাড়ী ভাড়া লওয়ার চেষ্টা চলিল। দুই-একটি ছাত্র যোগাড় করিয়া সেবাশ্রমেই ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সূত্রপাত হইল। এমন সময় সংবাদ আসিল, স্বামী ব্রহ্মানন্দ কলিকাতায় অন্তিম শয্যায় শায়িত। স্বামী সদ্‌ভাবানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণ কাশী ছাড়িয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। কলিকাতায় স্বামী সদ্‌ভাবানন্দ স্বামী নির্বেদানন্দের সহিত পরামর্শান্তে বুঝিলেন কাশীতে মিশনের দুইটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান আছে। তথায় অন্য একটি প্রতিষ্ঠান চলিতে পারে না। স্থির হইল মিহিজামে ব্রহ্মচর্যাশ্রম আনিতে হইবে। অতএব ইন্দু (পরে স্বামী দেবাত্মানন্দ) ও বলাইকে (পরে স্বামী কাশীশ্বরানন্দ) সহকর্মিরূপে লইয়া স্বামী সদ্‌ভাবানন্দ মিহিজামে একটি ভাড়াটে বাড়ীতে বিদ্যাপীঠ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তথায় নানা অসুবিধা হওয়ায় বৈদ্যনাথধামে ইহা স্থানান্তরিত হয়। বিদ্যাপীঠ অচিরে সমৃদ্ধ হইতে থাকে এবং উহার স্থায়ী জমি ও বাড়ী হয়। ইহা অধুনা রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সুবৃহৎ শিক্ষালয়। ইহার উৎপত্তির মূলে আছে স্বামী তুরীয়ানন্দের শুভ সংকল্প ও আশিস।

হরি মহারাজের কোমরে নিউর‍্যালজিয়া (স্নায়ুশূল) ছিল। অসহ্য ব্যথাটা কোমর হইতে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত সদা সর্বদা অনুভূত হইত। একটু বেড়াইলে বা দাঁড়াইলে তাহা খুব বাড়িত। গ্রীষ্মকালে এক সন্ধ্যায় তিনি সেবাশ্রমে খানিকটা ঘুরিয়া আসিয়া মাঠের উপর একটি বেঞ্চে বসিলেন। তখন জনৈক সাধু আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"মহারাজ, কোমরে ব্যথাটা কেমন আছে?" তিনি উত্তর দিলেন, "পায়ের আঙ্গুল থেকে মাথা পর্যন্ত shooting painটা (দপ্ দপে ব্যথা) সব সময় আছে। তা আছে ত আছে, আর কি করা যায়? 'ব্যথা আছে', 'ব্যথা আছে' বলে চীৎকার করতে হবে নাকি?" তখন তাঁহার পা টিপিয়া দিলে ব্যথা সাময়িকভাবে একটু কমিত ও আরাম হইত। তাই সেবক স্বামী ভবেশানন্দ তাঁহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছিলেন। সেই সময় স্বামী তুরীয়ানন্দ সেবককে বলিলেন, "আর পারি না, এত খাটনি।" সেবক বলিলেন, "মহারাজ, আপনার খাটনি কোথায়? সকাল-সন্ধ্যায় সাধু-ভক্তরা কেউ এলে দুটো কথা বলেন এবং নিজে একটু বেড়ান মাত্র!" তখন হরি মহারাজ উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "বলিস্ কিরে? ঠাকুর যাদের এখানে পাঠাচ্ছেন, তাদের দেখাশুনা করতে হয়, তাদের কিছু দিতে হয়। তা না হলে যখন ঠাকুরের কাছে যাব তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলে কি বলব? সেবাশ্রমের ডাক্তার ও তাঁর স্ত্রী এবং কলিকাতার এক ভদ্রমহিলা এসেছিল শোকার্ত হয়ে। তাদের প্রাণে শান্তি দিতে হলো।"

উপরি লিখিত ঘটনাটি নিম্নে বিবৃত হইল। তখন সেবাশ্রমের জনৈক ডাক্তার স্ত্রীপুত্রাদি সহ পার্শ্ববর্তী একটি বাড়ীতে থাকিতেন। তাঁহার দুই পুত্র গঙ্গাস্নান করিতে করিতে জলে ডুবিয়া মারা যায়। মাতাপিতা পুত্রশোকে অধীর হইলেন। সেবাশ্রমের অন্যতম পরিচালক স্বামী কালিকানন্দ তাঁহাদিগকে স্বামী তুরীয়ানন্দের কাছে লইয়া আসিলেন ডাক্তার বাবু শোক একটু চাপিয়া পত্নীকে ধরিয়া আনিতেছেন। কিন্তু মাতা শোকে এত অভিভূতা যে, আর চলিতে পারিতেছেন না! স্বামী কালিকানন্দের কাছে দুর্ঘটনাটি শুনিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ গম্ভীর এবং ধ্যানমগ্ন হইলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি ডাক্তার-দম্পতীর সহিত মৃদুস্বরে

কয়েকটী কথা বলিলেন। কি আশ্চর্য, ঐ সামান্য কয়েকটি কথায়ই তাঁহাদের শোকের প্রভূত উপশম হইল। হরি মহারাজ যেন ধ্যানবলে অমৃতসমুদ্র হইতে শান্তিবারি আনিয়া শোকসন্তপ্ত হৃদয় দুটিতে সিঞ্চন করিলেন।

এইশ্রেণীর আর একটি ঘটনাও এখানে বর্ণনা করা দরকার। কলিকাতার এক প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলার একটিমাত্র পুত্র এম. এ. পাশ করিয়া সদ্যঃ বিবাহ করিয়াছিল। হঠাৎ রোগাক্রান্ত হইয়া সে মারা যায়। বিধবা মাতা একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে শোকে পাগলিনীর ন্যায় হইয়া আহার নিদ্রাদি ত্যাগ করিলেন। একরাত্রে তিনি দেখিলেন, এক মহাপুরুষ তাঁহাকে উপদেশ দিতেছেন। পুত্রের শয়নকক্ষে একদিন দেওয়ালে রামকৃষ্ণদেবের ছবি দেখিয়া তিনি বুঝিলেন ইনিই স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষ। উক্ত দর্শনে তিনি কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইলেন। আত্মীয়-স্বজনও তাঁহাকে কাশীধামে যাইয়া সাধুসঙ্গ করিতে পরামর্শ দিলেন। তিনি তদনুযায়ী কাশী যাইয়া শুনিলেন, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে প্রাচীন সাধুগণ থাকেন এবং তন্মধ্যে কেহ কেহ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য। শোকার্ত মহিলা সেবাশ্রমে যাইয়া হরি মহারাজকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া শোকঘটনা ও স্বপ্ন-বৃত্তান্তটি বলিলেন। হরি মহারাজ তাঁহাকে স্বপ্নে প্রাপ্ত উপদেশ পালন করিতে পরামর্শ দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। তাঁহার কৃপায় মহিলাটির প্রাণে শান্তি আসিল।

স্বামী ভবেশানন্দ যখন হরি মহারাজের সেবা করিতেন তখন তিনি হরি মহারাজের মুখে সেবাধর্ম সম্বন্ধে এই সুন্দর কথাটি শুনিয়াছিলেন। অন্য একটি সাধু হরি মহারাজের সেবা করিতে আগ্রহ প্রকাশ করায় হরি মহারাজ রহস্যচ্ছলে স্বামী ভবেশানন্দকে বলিলেন, "এবার তোমাকে সেবাশ্রমে পাঠিয়ে দেব। আমার সেবা নবাগত সাধুটিই করবে।

কি বল?" ভবেশানন্দজী অনিচ্ছা প্রকাশপূর্বক বলিলেন, "মিছরীর পানা ফেলে কি কেউ চিটে গুড় খায়?" এই মন্তব্যশ্রবণে স্বামী তুরীয়ানন্দ বিরক্ত হইয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "বলিস্ কি রে? স্বামীজীর প্রবর্তিত সেবাধর্ম সম্বন্ধে এরূপ কথা মুখে আনতে নাই। সেবাশ্রমে রোগীর সেবায় সাক্ষাৎ নারায়ণের সেবা হয়। শিবতুল্য স্বামীজীর বাক্যে বিশ্বাস কর, সেবাশ্রমে শিবের সেবায় লাগ, মুক্ত হয়ে যাবি। পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্ম এতে ক্ষয় হয়ে যায়, চিত্ত শুদ্ধ হয়। নারায়ণজ্ঞানে সেবাই এই যুগের উপযোগী সাধনা। আমি ঠাকুরের কাজ এড়িয়ে ছিলাম বলে আমাকে এত ভুগতে হ'ল।" পরে স্বামী অরূপানন্দ আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনি নাকি বলেছেন যে, ঠাকুরের কাজ করলে আপনাকে এত ভুগতে হত না এবং আবার আমেরিকা যদি যান আপনার শরীর সেরে যাবে?" স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "হাঁ, সত্যই। আমেরিকায় ঠাকুর আমাকে দর্শন দিয়ে তাঁর কাজ করতে বলেছিলেন। তাঁর কথা না শোনায় আমায় এত ভুগতে হল। ঠাকুরের ইচ্ছায় যদি আবার আমেরিকায় যাওয়া হয় তবে শরীর সেরে যাবে মনে হয়।"

সেবাশ্রমের সেবকগণকে প্রেরণা দিবার জন্য হরি মহারাজকে কখন কখন বলিতে শুনা গিয়াছে—"তিন দিন ঠিক ঠিক এই নারায়ণসেবা করলে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়ে যাবে। যারা করেছে তারা প্রাণে প্রাণে বুঝেছে।"

ঠাকুর বলিতেন, "শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধা ভক্তি এক।" এই বাক্যটি হরি মহারাজের জীবনে মূর্ত হইয়াছিল। একদিন তাঁহার কাছে ভাগবত পড়া হইতেছে। স্বামী কমলেশ্বরানন্দ টুলের উপর ভাগবতখানি রাখিয়া পড়িতেছিলেন। সাধারণতঃ টুলের উপর একখানি কাপড়

দিয়া ভাগবত রাখা হয়। কিন্তু সেদিন তাহা করা হয় নাই। ইহাতে হরি মহারাজ মর্মাহত হন এবং পাঠশেষে বলেন, "আমার বুকের উপর যেন একটা পাথর চাপা ছিল। টুলের উপর একখানা কাপড় দিলে না কেন? ঠাকুর ভাবনেত্রে দেখেছিলেন—ভাগবত, ভক্ত, ভগবান এক। ভাগবতকে ঈশ্বরীয় মূর্তিরূপে শ্রদ্ধা করা উচিত। শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করলে ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হন।"

স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহার কোন অনুরক্ত সেবককে সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য যারপরনাই তিরস্কার করিতেন। ইহা দেখিয়া কোন কোন সাধু ভাবিলেন, "সেবক হরি মহারাজের উপর বেশী মন দিয়ে ফেলেছেন। ভগবানের দিকে বেশী মন দেবার জন্য তিনি সেবককে বকৃছেন।" উক্ত সেবক মায়াবতী হইতে ফিরিয়া আসিয়া এই কথা দুই-এক জন সাধুর মুখে শুনিয়া একদিন হরি মহারাজকে বলিলেন, "মহারাজ, আমি একটা কথা আপনাকে বলব ভাবছি।" তিনি উৎসুক হইয়া সেবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কথা?" সেবক সবিনয়ে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ, আপনার সেবায় আমার অধিকাংশ মন দেওয়াতে যদি আমার ক্ষতি হয়, তাহলে এখন আর আপনার সেবা না করে ছত্রে খাই এবং এখানে মাঝে মাঝে আসি। তাতে আপনার উপর মনের টান কমে যাবে।" ইহা শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "না হে, আমার উপর যত অধিক টান হয় ততই তোমার ভাল। আমার উপর টান হলে ঠাকুর-মা-স্বামীজীর ওপর টান হবে। তাঁদের ওপর ভালবাসা এলে আমার ওপরও ভালবাসা আসবে। আমার কথা আমার কাছে শুনে নেবে, অন্যের কাছে শুনবে না। দেখ, আমাদের বকুনি খাওয়া খুব ভাল। আমি ত রাস্তার লোককে বকৃছি না, আপনার জনকে বকৃছি, তোমাদের ভালবাসি এবং ভাল

চাই বলে বকৃছি। পরে দেখবে, আর বকবার লোক পাবে না। তখন মনে হবে, এখন আর বকবার কেউ নেই! স্বামীজীর বকুনি যারা খেয়েছে তারা মানুষ হয়ে গেছে, বা নিশ্চয়ই হবে। দেখ, সব মনটা দিয়ে আমাদের সেবা করতে হয়। তাতেই তোমাদের পরম কল্যাণ। খানিকটা সেবা করলাম, খানিকটা চকড়বা করলাম, বা খানিকটা বেড়িয়ে এলাম, তাতে ঠিক ঠিক সেবা হয় না। ষোল-আনা মন দিয়ে সেবা করলে সেবা সাধনায় পরিণত হয়। সেরূপ সেবা সাধনভজনের সমান।"

স্বামী তুরীয়ানন্দ কখন কখন ভৎর্সনা করিলেও প্রতি কথা ও কার্যে সেবকদের মনে এতটা আধ্যাত্মিকতা চালিয়া দিতেন যে, তাহারা তাহাতেই পরিতৃপ্ত হইয়া অন্য কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। ইহার উল্লেখ করিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ কোন সময়ে অপর এক গুরু-ভ্রাতাকে বলিয়াছিলেন, "ওরা পালিয়ে কাশী যায়, সেখানে ভিক্ষা করে খায় এবং হরি মহারাজের সেবা করে। এর কারণ, হরি মহারাজের নিকট তারা কিছু পায়। তাই সেখানে খাওয়া-থাকার কষ্ট এবং তাঁর ভৎর্সনা সহ্য করেও তাঁর কাছে পড়ে থাকে। সেবকদের কিছু দিতে হয়। কিছু আধ্যাত্মিক শক্তি না পেলে সাধুসেবা করবে কেন?"

স্বামী তুরীয়ানন্দ একদিকে যেমন অতি কঠোর ছিলেন, অপরদিকে তেমনি গলিয়া যাইতেন। কোন সন্ন্যাসী সেবককে তিনি একদিন বলিলেন, এতটার সময় পায়ে তেল মালিশ করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু সেবকের আসিতে মাত্র দেড় মিনিট দেরী হইয়া গেল। নির্দিষ্ট সময়ে হরি মহারাজ অন্য এক সাধুর দ্বারা তেল মালিশ আরম্ভ করাইয়া দিলেন। সেবক দেড় মিনিট দেরীতে আসিলেই হরি মহারাজ তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তোমাকে আর তেল মালিশ

করতে হবে না। দেরী করলে কেন?" তখন সেবক সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া ঘরের কোণে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সেবকের কাতরতাদর্শনে বজ্রবৎ কঠোর সাধুর হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি সেবককে কাছে ডাকিয়া তাঁহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। মাথায় হাত দেওয়া মাত্রই সেবকের সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎবৎ আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইল, তাঁহার মনে আর বিন্দুমাত্র ক্ষোভ রহিল না। তাঁহার কঠোরতা সত্ত্বেও সেবকগণ তাঁহার এত কৃপা পাইতেন যে তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে চাহিতেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, স্বামী অনন্তানন্দ তিনবার চলিয়া যান, কিন্তু আবার ফিরিয়া আসেন। স্বামী প্রবোধানন্দ শারীরিক অসুস্থতার জন্য ছুটি লইয়া মায়াবতী যান, কিন্তু একটু সুস্থ হইয়া পুনরায় হরি মহারাজের সেবাকার্যে ব্রতী হন। হরি মহারাজ সেবকদের বলিতেন—"তোদের দায়িত্ব আমার উপর, তোদের কল্যাণের জন্যই বকি।"

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বুকে ও পিঠে যখন কার্ব্বাঙ্কলের উপর কঠিন অস্ত্রোপচার হয় তখন তাঁহাকে দর্শন ও সেবা করিবার জন্য বহু আশ্রম হইতে সাধুরা কাশীতে আসিয়াছিলেন। মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম হইতে স্বামী বিবিদিষানন্দ উঁহাদের অন্যতম। তিনি হরি মহারাজকে হাওয়া করা প্রভৃতি ছোটখাটো সেবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাহাতেই তিনি তৃপ্ত এবং কৃতার্থ বোধ করেন। স্বামী শিবানন্দকে এই বিষয় পরে তিনি মায়াবতী হইতে পত্রে জানাইয়াছিলেন। মহাপুরুষজী লিখিয়াছিলেন, "হরি মহারাজের সামান্য সেবা করে তুমি ধন্য হয়েছ। তিনি আমাদের মধ্যে শুকদেব।"

স্বামী তুরীয়ানন্দের হৃদয় ছিল মাতৃহৃদয়তুল্য স্নেহপূর্ণ ও ক্ষমাশীল। একদা কোন ব্রহ্মচারী বেলুড় মঠ হইতে স্বামী শিবানন্দের নিষেধসত্ত্বেও

কাশী চলিয়া যান। ব্রহ্মচারীর পক্ষে ইহা গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়। ব্রহ্মচারী কাশী সেবাশ্রমে উপস্থিত হইলে স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহাকে অভয়দানপূর্বক আশ্রয় দেন এবং ভাগবত পাঠ করিয়া শুনাইতে বলেন। তিনি জানিতেন, ব্রহ্মচারী বেশ ভাগবত পাঠ করিতে পারেন। স্থানীয় সাধুদের কেহ কেহ মন্তব্য প্রকাশ করেন—ব্রহ্মচারীকে আশ্রয় দেওয়া উচিত হয় নাই এবং তাহার কঠোরদণ্ড হওয়াই উচিত, ইত্যাদি। স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহাদের এই বলিয়া নিরস্ত করেন যে স্বামীজী এবং রাজা মহারাজ পূর্বে এইরূপ অনেক ক্ষেত্রে ক্ষমা ও অভয় প্রদর্শন করিয়াছেন। স্বামী শিবানন্দজী যখন শুনিলেন ব্রহ্মচারী হরি মহারাজের আশ্রয় পাইয়াছে, তখন তিনিও বিশেষ প্রীত হন এবং সর্বান্তঃকরণে তাহাকে ক্ষমা করেন।

"ভক্ত শ্রী পুলিনচন্দ্র মিত্র সেবাশ্রমের পাশে হরি মহারাজের ঘরের পিছনে একটি বাড়ীতে সপরিবার কিছুদিন ছিলেন। একদিন হঠাৎ বৈকাল তিন-চারিটার সময় তাঁহার দুই-তিন বৎসরের মেয়েটি উপরতলা হইতে নীচে পড়িয়া যায়। পিতা কন্যাটিকে ঘরে রাখিয়া হরি মহারাজের কাছে ছুটিয়া আসেন এবং ব্যাকুলভাবে দুর্ঘটনাটি বিবৃত করেন। হরি মহারাজ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ দ্রুতবেগে পুলিন বাবুর বাসায় উপস্থিত হইলেন এবং আহত শিশুটির মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "ঠাকুরের কৃপায় এর কিছু অনিষ্ট হবে না।" সিদ্ধ পুরুষের বাক্য সফল হইল। মেয়েটি সে যাত্রা বাঁচিয়া গেল।

১৯২০ খ্রীঃ কাশী সেবাশ্রমে স্বামী তুরীয়ানন্দ বৈকালে নিজের ঘরের পূর্বদিকের বারান্দায় আরাম-চেয়ারে বসিলে তাঁহার কাছে স্বামী কমলেশ্বরানন্দ বা স্বামী জগদানন্দ শাস্ত্রপাঠ করিতেন। উভয় আশ্রমের সাধু-ব্রহ্মচারীরা এবং কাশীবাসী অনেক ভক্ত পাঠ শুনিতে আসিতেন।

একদিন স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বীয় সেবক সনৎ মহারাজকে বলিলেন, "ললিত (কমলেশ্বরানন্দ স্বামী) পণ্ডিত হয়ে গেছে। সে বেশ পড়ে, বেশ ব্যাখ্যা করে, চমৎকার সমঝ্‌দার। তবে যেদিন সে খাটে না, বুঝতে পারি যে, সে ফাঁকি দিচ্ছে। তাই একদিন তাকে বললুম, 'না খাটলে, আগে থেকে পড়ে বিষয়টি আয়ত্ত করে না রাখলে গোঁজামিল দিয়ে যেতে হবে।' তারপর থেকে ললিত বেশ খেটে তৈরী করে আসত, আর ফাঁকি দিত না। শাস্ত্রব্যাখ্যায় পাঠক ফাঁকি দিলে আমার ভালই লাগে না, আলুনি লাগে।"

আর একদিন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইতেছিল। শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর উদ্ধব দুঃখ করিতেছেন: "কি আশ্চর্য ব্যাপার! তিনি যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিলেন, কিন্তু যদুবংশের কেহই একটুও তাঁহাকে বুঝিতে পারিলেন না। দিবারাত্র একসঙ্গে শোওয়া-বসা, খাওয়া-খেলা প্রভৃতি সত্ত্বেও জগচ্চিন্তামণি পরব্রহ্ম সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কেহ বুঝিতে পারিল না।" একঘণ্টা ধরিয়া উদ্ধবের আক্ষেপ, বিলাপাদি ব্যাখ্যাত হইল। হরি মহারাজ একটি ঘণ্টা গম্ভীর হইয়া সব শুনিলেন। রোজ পড়িবার সময় একটু-না-একটু কিছু বলিতেন, বা জিজ্ঞাসা করিতেন; কিন্তু সেদিন একেবারে চুপচাপ পাঠ বন্ধ হইয়া গেল, সকলেই নিস্তব্ধ। রোজই পাঠান্তে তিনি পঠিত বিষয় আলোচনা করিয়া সব বুঝাইয়া দিতেন, সকলে তাঁহার অমৃতময়ী বাণী শুনিয়া তৃপ্ত হইয়া বিদায় লইতেন। সেদিন তিনিও কিছু বলিতেছেন না, আর কেহ উঠিয়াও যাইতেছেন না। অবশেষে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "দেখ, উদ্ধব ঠিকই বলেছেন। আমি এতক্ষণ কি ভাবছিলাম জান? আমরা স্বামীজীর সহিত একসঙ্গে কাটালুম, একসঙ্গে খাওয়া-বসা, চলা-ফেরা-শোয়া, গল্প-গুজব, শাস্ত্রপাঠ, হাসিঠাট্টা দিনের পর দিন বছরের পর বছর করেছি,

কিন্তু স্বামীজীকে আমরা একটুও চিনতে পারি নি, তাঁর স্বরূপ আদৌ বুঝতে পারি নি। তিনি যে অত বড় মহাপুরুষ ছিলেন, তার বিন্দু-বিসর্গও আমরা বুঝতে পারি নি যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন। এখন আস্তে আস্তে একটু একটু যেন বুঝতে পারছি। ঠাকুর যে কত বড় মহাপুরুষকে সঙ্গে এনেছিলেন তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য! যতই উদ্ধবের কথা শুনছিলুম ততই মনে হচ্ছিল, উদ্ধব ঠিকই বলেছেন। স্বামীজীর সঙ্গে আমরা কী না করেছি! কিন্তু আমরা তাঁকে ধরতে পারি নি। তখন আমরা ভাবতুম তিনি আমাদেরই মতন, তবে খুব উঁচুঘরের, সব বিষয়ে আমাদের চেয়ে expert (অভিজ্ঞ)—এই পর্যন্ত মনে হত। আমার মনে হয়, এত বড় মহাপুরুষ, একাধারে এত গুণ ইতঃপূর্বে আর জন্মগ্রহণ করেন নি। তিনি কী গুণের আদরই না জানতেন! এতটুকু গুণ দেখলে, তিলকে তাল করে বলবার অভ্যাস তাঁর ছিল। লোককে ঠেলে তুলে দেবার অসীম শক্তি তাঁর ছিল। কী মহাপ্রাণ ছিলেন তিনি! সকলের জন্য কী feel (সমবেদনা অনুভব) করিতেন! সকলের জন্য এত প্রীতি, এত সহানুভূতি আর কোন মানুষের মধ্যে দেখি নি, আর দেখবও না। তাঁর কথা শুনলে মরা মানুষ বেঁচে উঠত। তোমাদের সঙ্গে কথা কইতে ঘুম পেয়ে যায়, কোন উৎসাহই আসে না। কিন্তু স্বামীজীর কথা শুনলে মরা মানুষ তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে বলত—'দাঁড়াও দাঁড়াও! মরে ত গেছি, কথাটা একবার শুনে যাই।' তাঁর কথার এতই জোর ছিল যে, ভাব ও ভাষা হৃদয়ের অন্তস্তলে তখনই গিয়ে পৌঁছত, একটুও বিলম্ব হত না। সে সময়ের জন্য সব ভুল হয়ে যেত। লোকে নিজের অস্তিত্ব ভুলে যেত। সকলের মনকে এক উচ্চ ভাবভূমিতে তিনি তুলে দিতে পারতেন।" স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রায় আধ ঘণ্টা বা

পৌনে একঘণ্টা ধরিয়া স্বামীজীর সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন। শেষে আপশোষ করিয়া বলিলেন, "স্বামীজী আমাদের ফাঁকী দিয়ে চলে গেলেন। যতই দিন যাচ্ছে ততই মনে হচ্ছে, কেন তাঁর সঙ্গে আরও ভাল করে মিশলুম না, তাঁর কথা আরও কেন শুনলুম না!" এইভাবে হা-হুতাশ করিতে করিতে তিনি কথা শেষ করিলেন, যেন ভাবপ্রকাশের ভাষা আর খুঁজিয়া পাইলেন না, ভাবে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ এপ্রিল মাসে স্বামী অদ্ভুতানন্দ কাশীধামে দেহরক্ষা করেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ গুরুভ্রাতা অদ্ভুতানন্দজীকে গভীর শ্রদ্ধা-প্রীতি করিতেন এবং তাঁহার অসুখের সময় প্রায় প্রত্যহই টাঙ্গায় চড়িয়া তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন।

একদিন দুপুরে গুরুভ্রাতার অবস্থা খুব খারাপ শুনিয়া তিনি হাঁটিয়াই চলিলেন। লাটু মহারাজ যেখানে থাকিতেন তাহা সেবাশ্রম হইতে প্রায় এক মাইল। হরি মহারাজের সঙ্গে স্বামী কৈবল্যানন্দ ছিলেন। ওদিককার রাস্তা তখন খুঁড়িয়া কাঁকর ঢালা হইয়াছিল। হরি মহারাজ কাঁকরের উপর দিয়াই এত জোরে চলিতে লাগিলেন যে সঙ্গী পিছনে পড়িয়া রহিলেন। যে রোগী পঙ্গুবৎ লাঠি ধরিয়া ধীরে ধীরে চলেন, তাঁহার পক্ষে এত দ্রুতবেগে চলা অদ্ভুত মনের জোরের পরিচায়ক।

লাটু মহারাজকে ঐরূপ একদিন দেখিতে গিয়াছেন। তখন লাটু মহারাজের শরীরে ক্ষতস্থানে ড্রেসিং হইতেছিল। লাটু মহারাজ গুরু-ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি অসুখ? ডাক্তার কি বলিতেছে?" হরি মহারাজ উত্তর দিলেন, "অসুখ তেমন কিছু নহে, খালি দুর্বলতা। না খেয়ে শরীরপাত করেছ, এখন আর লড়বার ক্ষমতা নাই। একটু খেয়ে জোর করলেই সব সেরে যাবে।" তাহাতে লাটু মহারাজ

বলিয়াছিলেন, "শরীর গেলেই তো ভাল।" হরি মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার ও-কথা বলতে নাই। ঠাকুর যেরূপ করিবেন সেরূপ হবে।" ইহাতে লাটু মহারাজ উত্তর দিলেন, "তা তো জানি। তবে আমাদের কষ্ট!" ইহাই গুরুভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে শেষ কথোপকথন। যেদিন লাটু মহারাজ মহাসমাধিলাভ করেন, সেদিন পূর্বাহ্ণে হরি মহারাজ তাঁহার কাছে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার নাড়ী দেখিয়া জানিলেন, নাড়ী নাই। বেলা দশটা পর্যন্ত মহাপ্রয়াণে উন্মুখ গুরুভ্রাতার নিকট থাকিয়া তিনি সেবাশ্রমে ফিরিলেন এবং পুনরায় বৈকাল চারিটায় আবার যাইবেন বলিয়া আসিলেন। আহারান্তে বিশ্রামকালে তিনি গুরুভ্রাতার মহাসমাধির সংবাদ পাইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ শেষ দর্শন করিবার জন্য মহাসমাধিস্থ গুরুভ্রাতার নিকট ছুটিলেন এবং তাঁহার গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন, জ্বরের সময় তাঁহার শরীর যেমন গরম ছিল সেরূপই রহিয়াছে। গুরুভ্রাতার মহাপ্রয়াণের বিস্তৃত বর্ণনা স্বামী তুরীয়ানন্দ যে পত্রে দিয়াছেন তাহাতে লিখিয়াছেন, "অদ্ভুতানন্দ নাম পূর্ণ করিতেই যেন প্রভু এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখাইলেন।"

ভক্তগণ স্বেচ্ছায় যাহা দিতেন তাহাতেই কাশীধামে স্বামী তুরীয়ানন্দের সেবা-শুশ্রূষার ব্যয়নির্বাহ হইত এবং কিছু উদ্বৃত্ত অর্থও জমিয়াছিল। সম্ভবতঃ শেষ বৎসরে তাঁহার অন্যতম সন্ন্যাসী সেবক তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন, "মহারাজ, এই উদ্বৃত্ত অর্থ আলমোড়া রামকৃষ্ণ কুটীরে দান করিলে ভাল হয়, কারণ আশ্রমটি আপনিই প্রতিষ্ঠা করেছেন।" তদুত্তরে হরি মহারাজ বলিলেন, "সংঘের অধ্যক্ষ এই বিষয়ে যা নির্দেশ দেবেন তা পালিত হবে। এই টাকা তো আমার নয়, সংঘের। ভক্তগণ যা যা দিয়েছেন তাই জমা আছে, আমি খরচ করতে পারি নাই। আলমোড়া আশ্রম করেছি বলে তার জন্যে টাকা রাখতে আমি পারি না।"

উপরি উক্ত সেবক যুক্তিসহায়ে তাঁহাকে এই বিষয়ে সম্মত করিবার চেষ্টা করিলে তিনি তেজোদীপ্তভাবে বলিলেন, "সংঘের একমাত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দের নামে টাকা থাকতে পারে, কারণ তিনি সংঘের অধ্যক্ষ। সংঘাধ্যক্ষ ব্যতীত অন্য কাহারও নামে টাকা রাখা উচিত নয়। সন্ন্যাসীর পক্ষে অর্থসঞ্চয় নিষিদ্ধ। সাধুর ব্যক্তিগত অর্থ না থাকাই উচিত। যদিও উদ্বৃত্ত অর্থ আমার নামে আছে, তথাপি তাহা সংঘের সম্পত্তি। সুতরাং সংঘাধ্যক্ষ যাহা করিবেন তাহাই চরম।" স্বামী তুরীয়ানন্দের নামে ভক্তগণ যে টাকা পাঠাইতেন তাহা তাঁহার নামে জমা হইত মাত্র। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে বিশেষ কিছু জানিতেন না, কে কত দিতেন তাহাও তাঁহাকে বলা হইত না। কিন্তু তাঁহার জন্য এই অর্থের কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত ব্যয়িত হইলে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। তাঁহার নিজের জন্য যতটুকু দরকার তদতিরিক্ত তিনি ব্যয় করিতে দিতেন না। তাঁহার জন্য নিত্য যেসকল জিনিসপত্র কেনা হইত তাহার হিসাব তিনি দেখিতেন। মাসের শেষে অফিস হইতে পুরা হিসাব তাঁহার নিকট পাঠান হইত। তিনি হিসাবটি সেবকের দ্বারা পড়াইয়া শুনিতেন। কোন জিনিস বেশী কেনা হইলে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। একদিন সেবক এক পয়সার স্থানে দুই পয়সার লঙ্কা আনিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এত লঙ্কা কি হবে?" সেবক তখন হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দুই-এক পয়সার জিনিস বেশী আনিলে কি হয়? আপনি ত খুব কৃপণ! সামান্য জিনিসের জন্য এত বাড়াবাড়ি করেন কেন?" সেবকের কথা শুনিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ একটু হাসিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "হিসাব এত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখি কেন জান? ভক্তেরা এখানে সেবার জন্য যে টাকা পাঠায় তার অপচয় যাতে না হয় তা দেখবার জন্যে। গৃহস্থদের পয়সা তাদের গায়ের রক্ত। কত পরিশ্রম

করে তারা অর্থোপার্জন করে ও এখানে পাঠায়! তার অপচয় হলে ঠাকুরের কাছে আমাকে জবাব দিতে হবে।" সেবাশ্রম হইতে তাঁহার নিত্য ব্যবহার্য যে দুধ শাকশব্জী সরবরাহ করা হইত তজ্জন্য হরি মহারাজ প্রতিমাসে কিছু টাকা দিতেন। তাঁহার কথায় অনুপ্রাণিত হইয় সেবকগণ রান্নাঘরের সম্মুখে অল্পপরিসর উঠানে কয়েকটী বেগুন ও লঙ্কাগাছ রোপণ করিয়াছিল। অল্প যত্নে গাছগুলিতে এত লঙ্কা ও বেগুন ফলিত যে, নিত্য প্রয়োজন মিটাইয়া অতিরিক্ত অংশ ভক্তদের মধ্যে বিলাইয় দেওয়া হইত। উহাতে হরি মহারাজ খুব আনন্দ প্রকাশ করিতেন।

অপরিগ্রহভাবে স্বামী তুরীয়ানন্দ কত সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন তাহ নিম্নোক্ত বিবরণ হইতে প্রমাণিত হয়। তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত নিবৃত্তিই সাধুজীবনের আসল অলঙ্কার। সেবকদের মধ্যে কেহ ভক্তদে নিকট হইতে কাপড় জামা চাহিয়া লইলে তিনি খুবই চটিয়া যাইতেন একবার কোন সেবক কলিকাতার কোন বিশিষ্ট ভক্তের নিকট তাঁহা জন্য দুইটি কোট ও চারিটি শার্ট করাইয়া আনেন। ভক্তবাড়ীর ভক্তিমত মেয়েরাই শ্রদ্ধা ও আনন্দ সহকারে সেইগুলি নিজেদের সেলাইয়ের কলে প্রস্তুত করেন। একটি জামা বা শার্ট ময়লা হইলেই অন্য পরিষ্কার জা বা শার্ট তাঁহাকে পরান হইত। বারবার নূতন জামা বা শার্ট দেখি তিনি সব বুঝিতে পারিলেন। ইহাতে তিনি এতদূর চটিয়া গেলেন ে নূতন শার্ট বা জামা আর ব্যবহার করিলেন না এবং সেবকের সহি কয়েক দিন কথা বন্ধ করিয়া দিলেন। অবশ্য সেবকের মনে অপরিগ্র ভাব জাগাইবার জন্য তাঁহাকে এই কঠোর পন্থা অবলম্বন করিতে হইল সেই সময় তিনি বিরক্ত হইয়া সেবককে বলিয়াছিলেন, "নিজেদের বাস কামনাগুলো চরিতার্থ করবার জন্য এই সব করা হয়। উদ্বোধন ম যখন আমার শরীর অসুস্থ হয় তখন মহাপুরুষ মহারাজ বলেছিলে

'আপনার শুদ্ধ শরীরে অসুখ হবে কেন? এসব অপরের অসুখ। সেবকরা আপনার সেবা করবার বাসনা করে বলেই আপনার এসব রোগ।' মহাপুরুষ ঠিক বলেছিলেন। তাঁর বাক্য কি মিথ্যা হয়? এইজন্যই ত এই শরীরে এত কষ্টভোগ!" উপরোক্ত সেবক হরি মহারাজের তিরস্কারে অনুতপ্ত হইয়া ও সেবায় বঞ্চিত থাকিয়া গঙ্গাস্নান ও শাস্ত্রপাঠাদিতে মনোনিবেশ করিলেন এবং তাঁহার উচ্ছিষ্ট বাসনাদি মাজিয়া দিতেন। কয়েকদিন পরে হরি মহারাজ তাঁহাকে ডাকিয়া পুনরায় সেবাকার্যে নিযুক্ত করেন ও বলিলেন, "মহামায়ার যা ইচ্ছা তাই হবে। শরীরে যা ভোগ হয় হোক্।"

কাশীধামে অবস্থানকালে সম্ভবতঃ ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী তুরীয়ানন্দ এক বৈকালে একায় চড়িয়া সেবকের সঙ্গে বেড়াইতে গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ বলতেন, একার ঝাঁকানিতে ক্ষিধে হয়। মাঝে মাঝে একা চড়লে মন্দ হয় না।" কিন্তু পরদিন বৈকালে আর বেড়াইতে গেলেন না, কারণ দেখা গেল তাঁহার বাম হাতের আঙ্গুলে ব্যথা হইয়াছে। দুই-এক দিনের মধ্যে ব্যথায় বেশ যন্ত্রণা হইতে লাগিল। বোধ হয় একা জোরে ধরার জন্য চোট লাগিয়াছিল। যাহা হউক, তাঁহার বহুমূত্ররোগ থাকার জন্য ব্যথার স্থানটি খুব ফুলিয়া উঠিল। স্থানীয় ডাক্তার বাবু ব্যথিত আঙ্গুলে অস্ত্রোপচার করিলেন। তিনি রোজ আসিয়া দেখিতেন, আঙ্গুলটি পূর্ববৎ ফুলিয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য তিনি রোজ কিছু মাংস কাটিয়া বাঁধিয়া দিতেন। হরি মহারাজকে খুব নিয়মিত পথ্যে রাখা হইল। ডাক্তার বাবু দিনের পর দিন ঐরূপ করিয়া যাইতেন, কিন্তু ফোলা বা ব্যথা আদৌ কমিল না। রোজ ডাক্তার বাবু বলিতেন, "অস্বাভাবিক মাংসবৃদ্ধি হয়েছে এবং রোজ খানিকটা মাংস চাঁচিয়া ফেলিয়া দিতেন। মাংস চাঁচিয়া ফেলা কত

কষ্টকর তাহা সকলে বুঝিতেন, কিন্তু উপায়ান্তর ছিল না। আশ্চর্য এই যে, এত যন্ত্রণাসত্ত্বেও হরি মহারাজ একদিনও ভুলে উঃ! আঃ! করিতেন না। আঙুল চাঁচিবার সময় তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইত, যেন কোন বেদনাই নাই। ডাক্তার বাবু কার্যারম্ভের পূর্বে রোজই বলিতেন, "ইহা বড় যন্ত্রণাদায়ক, কিন্তু কোন উপায়ও দেখছি না।" এই সময়ে তাঁহার রোগযন্ত্রণা সহ্য করিবার ক্ষমতা দেখিয়া অবাক হইতে হইত। কাশীতে পূর্বোক্ত মাংস চাঁচিবার সময় প্রচুর রক্ত বাহির হইত। ঐ রক্ত তুলা দিয়া পুঁছিয়া তিন-চারি বার চাঁচা হইত। অস্ত্রোপচারকালে তিনি স্থির শান্ত হইয়া যেখানে অস্ত্রোপচার হইতেছিল তাহা দেখিতেছিলেন। তখন তাঁহার মুখে কোনপ্রকার অস্বস্তির ভাব ক্ষণমাত্রও দেখা যায় নাই। পরদিন একান্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, "অস্ত্রোপচারের সময় আপনি কি কোনপ্রকার বেদনা অনুভব করেন নি?" ইহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "দেখ, মনটা ছেলেমানুষের মত। তাকে ধরে রাখলে সে ক্রমাগত বলে, 'ছাড়, ছাড়।' একবার তাকে ছেড়ে দিলাম। কিন্তু তখনও অস্ত্রোপচার শেষ হয় নি; তাই আবার ধরে ফেললাম।" ঐকথা বলিয়া তিনি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর আবার বলিলেন, "কি জান, 'যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুনাপি ন বিচাল্যতে।' 'গুরুনা দুঃখেন' অংশের অর্থ ভাষ্যকার (শ্রীশঙ্কর) এরূপ করেছেন—'শস্ত্রসম্পাতজনিতেনাপি দুঃখেন ন বিচাল্যতে।'" প্রথম উত্তরটি সিদ্ধযোগীর মনের উপর অসাধারণ প্রভাবের পরিচায়ক। দ্বিতীয় বাক্যের মধ্যে পাওয়া যায়, তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষের অতিপ্রাকৃত অবস্থার ইঙ্গিত। গীতাতে শ্রীভগবান বলিয়াছেন, আত্মজ্ঞানী গুরুদুঃখেও বিচলিত হন না। একবার হরি মহারাজ ঠাকুরের দিব্যসঙ্গের কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "অবতারের সঙ্গে একদিনে যে আনন্দ হয়,

সারাজীবন দুঃখকষ্ট পেলেও তা লোভনীয়। ঐ একদিনের আনন্দেই সারাজীবনের দুঃখকষ্ট সব পুষিয়ে যায়।"

এইরূপ অসম্ভব যন্ত্রণা দেখিয়া সেবকদের কষ্ট হইল। তাঁহারা কলিকাতায় ডাক্তার দুর্গাপদ ঘোষকে চিঠি লিখিবার সঙ্কল্প করিয়া হরি মহারাজের মত লইলেন। দুর্গাপদ বাবুকে একটা চিঠি লেখা হইল ডাক্তার সুরেশ ভট্টাচার্যকে সংবাদ দিতে। দুর্গাপদ বাবু চিঠি পাইয়া সুরেশ বাবুকে পড়িয়া শুনাইলেন। উভয়ে হরি মহারাজের আঙ্গুলটি স্বচক্ষে দেখিবার জন্য কাশী যাওয়া স্থির করিলেন। পরদিন সকালবেলা সেবাশ্রমে দেখা গেল, দুই ডাক্তারই হরি মহারাজের সমীপে উপস্থিত। হরি মহারাজ তাঁহাদের দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়া সেবককে বলিলেন, "দেখেছ এঁদের কি ভালবাসা! একটু খবর পেয়ে সব ফেলে চলে এসেছেন। ঠাকুরের দয়া, ঠাকুরের কৃপা।" ডাক্তারদের আগমনে সকলেরই খুব আনন্দ হইল। হরি মহারাজ এবং ডাক্তার বাবুদের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া গল্প হইতে লাগিল। সুরেশ বাবুকে তামাক, পান, জর্দা, দোক্তা প্রভৃতি দেওয়া হইল; এইসব খাইতে তিনি ভালবাসিতেন। হরি মহারাজ বলিলেন, "যতক্ষণ থাকবেন ততক্ষণ বেশী বেশী করে দাও।" ঘণ্টাখানেক ধরিয়া গল্প চলিল, কিন্তু অসুখের কথা আর উঠিল না। তখন সুরেশ বাবু বলিলেন, "আপনাকে দেখবার খুব ইচ্ছা হল, তাই কাউকে কিছু না বলেই চলে এলাম। স্ক্রেপ (চাঁচা) করছে শুনে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। এই ধরনের ঘায়ে এইরূপ করা অসহ্যযন্ত্রণাদায়ক।" এই বলিয়া তিনি হঠাৎ বলিলেন, "দুর্গা, হাতটা খোল, একবার দেখি।" ক্ষতটা দেখিয়াই সুরেশ বাবু নূতন ব্যবস্থা করার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, তাড়ি (yeast) পাওয়া যাইবে কিনা। স্বামী কালিকানন্দ বলিলেন, "হাঁ, পাওয়া যাবে।

তালগাছের তাড়ি হলে হবে ত?" সুরেশ বাবু সম্মতিজ্ঞাপনান্তে দুর্গাপদ বাবুকে বলিলেন, "হরি মহারাজের আঙ্গুলে তাড়ির মোটা প্রলেপ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দাও। চব্বিশ ঘণ্টা পরে আমি খুলব; আর যেন কোন ডাক্তার হাত না দেয়। অন্য কোন রোগী এতদিন এত কষ্ট সহ্য করতে পারত না।" সুরেশ বাবু পরদিন ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া বলিলেন, "দেখ দুর্গা, এটা ত খোস বলে মনে হচ্ছে। দেখ ভাল করে; খোসের ভাল ওষুধ কি বল।" দুর্গাপদ বাবু বলিলেন, "নিম-ঘি।" সুরেশ বাবু বলিলেন, "ঠিক বলেছ। ষ্টোভ জ্বেলে নিজের হাতে নিম-ঘি তৈরী কর এবং হরি মহারাজের আঙ্গুলে লাগিয়ে বেঁধে রেখে দাও।" তাহাই করা হইল।

সুরেশ বাবুর এবারে অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা গেল। তাঁহাকে বসিতে চেয়ার দেওয়া হইল; কিন্তু তিনি চেয়ারে না বসিয়া মেঝেতেই বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, "আপনাদের সামনে চেয়ারে বসা ভাল দেখায় না।" সকলে সুরেশ বাবুর নম্রতা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন। হরি মহারাজের নির্দেশ অনুসারে মেঝেতে একখানি কম্বল পাতিয়া দেওয়া হইল। সুরেশ বাবু তদুপরি বসিলেন। গল্প করিতে করিতে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা মশাই, আমাদের আর কি কিছু হবে না? আমাদের আর কি কোন উপায় নেই? আজকাল 'কথামৃত' পড়ছি, বড়ই ভাল লাগছে। আর কোন বই পড়তে ইচ্ছা হয় না। 'কথামৃত' যতবার পড়ছি, ততবার নূতন বলে মনে হচ্ছে। আরও ভাল করে বুঝতে পারছি। মনে হয়, গতবারে যখন পড়েছিলুম, তখন কি ভাল করে পড়ি নি! আশ্চর্য বই বটে!" সুরেশ বাবু নিস্তব্ধ হইতেই হরি মহারাজ বলিলেন, "হাঁ, 'কথামৃতে' যা ঠাকুর বলে গেছেন, তা সাধনার জিনিস কিনা। ঠাকুর নিজে সাধন করে যা জেনেছেন, যা বুঝেছেন, যা উপলব্ধি করেছেন, তাই সরল সহজ

কথায় বলে গেছেন। তাই তাঁর কথা এত সহজবোধ্য, এত মর্মস্পর্শী; কিন্তু অতি গভীর। আমরা এখনও যতবারই পড়ি না কেন, নূতন মনে হয়, বেশী বুঝতে পারি। সাধনভজন করলে এবং ভগবানে অনুরাগ হলে আরও বেশী বুঝা যায়। তাঁর উপর টান হলেই হল, তাঁর উপর বিশ্বাস ভক্তি হলেই হল।" সুরেশ বাবু তখন বলিলেন, "আমাদের কি কিছু হবে?" হরি মহারাজ বলিলেন, "সে কি, আপনাদেরই ত হবে। কেন বলছি যে, আপনারা যখন যা ভেবেছেন তখন তা করেছেন। আপনি মহোদ্যমে, মহোৎসাহে ডাক্তারী করেছেন ও করছেন বলে আপনার এত উন্নতি। সব মনটা দিয়ে একরোখ করে লেগেছেন বলেই এত সাফল্য। এইরূপে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তাঁকে ডাকলে তাঁকে নিশ্চয়ই লাভ করা যায়। ডাক্তারীতে যেমন সব প্রাণ ঢেলে দিয়েছেন, তেমনি ভগবানলাভের জন্য ষোল-আনা মন দিলেই হবে। আপনাদের পক্ষে খুবই সহজ, কারণ আপনারা মনটা একটা কাজে লাগাতে শিখেছেন। সমগ্র মনটা তাঁতে দিলেই তৎক্ষণাৎ তাঁর দর্শন পাওয়া যায়। ঠাকুর বলেছেন মোড় ফিরিয়ে দিতে। ডাক্তারী থেকে মন টেনে নিয়ে তাঁতে দিন, রোখ করে তাঁকে ডাকুন। একেই বলে তীব্র বৈরাগ্য। ঠাকুর ঢিমে-তেতালা ভাব পছন্দ করতেন না। হচ্ছে হবে—এই ভাবে ধর্মজীবনে অগ্রসর হওয়া যায় না। এই জীবনেই তাঁকে লাভ করব—এইরূপ রোখ চাই। তাঁকে পেতে হলে ডাকাতপড়া ভাব চাই। দেরী সইছে না—এইরূপ মনোভাব হলে উন্নতি দ্রুত হয়। স্বামীজীও মহা উদ্যমে উঠে পড়ে লাগতে বলেছেন। আপনারাই ত পারবেন। যে নুনের হিসাব করতে পারে, সে মিছরীর হিসাবও করতে পারে। যে কাজে আপনারা হাত দেন তাতেই success (সফলতা) হচ্ছে। মনের মোড় যেই ধর্মসাধনের দিকে ফিরিয়ে দেবেন তাতেও এইরূপ success (সফলতা)

হবে, হবেই হবে। তিনি অন্তর্যামী। তিনি অন্তরের ভাব দেখেন ও বোঝেন। সর্বান্তঃকরণে যে সাধন করবে তারই হবে, নিশ্চয়ই হবে।"

হরি মহারাজের আশ্বাসবাক্যে সুরেশ বাবু অতিশয় অনুপ্রাণিত হইলেন। বলিলেন, "তাইত আপনার সঙ্গে কথা কইলে খুব আনন্দ পাই, আশ্বাস পাই, উঠতে ইচ্ছা করে না।" হরি মহারাজ চুপ করিয়া রহিলেন। সুরেশ বাবু কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ অস্ত্র চিকিৎসক। তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্য স্থানীয় বড় বড় ডাক্তাররা দুইখানি মোটর-গাড়ীতে আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল, সুরেশ বাবু বাহির হইলে তাঁহাকে গাড়ী করিয়া লইয়া যাইবেন এবং কঠিন রোগীদের সম্বন্ধে পরামর্শ করিবেন। খুব বেলা হইয়া যাইতেছে দেখিয়া সুরেশবাবু হরি মহারাজকে বলিলেন, "আপনার আহারের সময় হয়েছে, এবার উঠি।" হরি মহারাজ বলিলেন, "না না, বেলা হয় নি। আমি এরকম সময়েই ত খাই।" সুরেশ বাবু অসাধারণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলিলেন, "না, আর দেরী করা হবে না, আপনার শরীর ভাল নেই।" তারপর তিনি দুর্গাপদ বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দুর্গা, বাইরে এতগুলি মোটরগাড়ী কেন? আমরা ত স্টেশন থেকে টোঙ্গা করে এসে গাড়ী ছেড়ে দিয়েছি।" সেবাশ্রমের একজন সাধু বলিয়া উঠিলেন, "আপনি কলিকাতা থেকে এসেছেন। আপনার নাম শুনে এঁরা আপনার সঙ্গে পরামর্শের জন্য নিয়ে যাবার চেষ্টায় উপস্থিত হয়েছেন।" সুরেশ বাবু তাহা শুনিয়া বলিলেন, "তাই ত মহা মুশ্‌কিলে পড়লাম। আমি চুপি চুপি কোলকাতা থেকে চলে এলুম, স্বামীজীর সঙ্গে একটু গল্প করব নিশ্চিন্ত হয়ে। এখানেও আবার সেই ডাক্তারী! কি বিপদ!" দুর্গাপদ বাবু বলিলেন, "রামনগরের রাজার গাড়ী এসেছে, রাজা মতিচাঁদের গাড়ীও হাজির ইত্যাদি। সবার খুব অসুখ করেছে;

পারছে না। তাই একবার আপনাকে consultation (পরামর্শ)-এ নিয়ে যেতে চায়। সবগুলিই serious case (সাংঘাতিক অবস্থা)।" সুরেশ বাবু বলিলেন, "দুর্গা, এদের সকলকে বলে দাও খাওয়া-দাওয়ার পর যেন আমাদের ওখানে আসেন। তখন যাওয়ার চেষ্টা করব। এখন আর ডাক্তারী ভাল লাগছে না।" সেবাশ্রমের সাধুরা দেখিলেন সুরেশ বাবুর সঙ্গে 'কথামৃত' আছে। দুই ডাক্তারবাবু হরি মহারাজের কাছে বিদায় লইয়া তাড়াতাড়ি মোটরে উঠিলেন।

সেই সময় একদিন হরি মহারাজ বলিয়াছিলেন, "কিছুদিন থেকে দেখছি, যা ইচ্ছা করছি তাই হয়ে যাচ্ছে। তিনবার scraping (ক্ষতস্থান চাঁচা) হয়েও কিছু ফল হল না দেখে মনে হয়েছিল, সুরেশ ভট্টাচার্য এলে বেশ হয়। অমনি মন বললে, আসবে। তা দেখ এসে গেল।"[১]

১৯২০ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহার পায়ের একটি বুড়ো আঙুলের যন্ত্রণায় খুব ভুগিয়াছিলেন। গরম সরিষা তৈল মালিশ করিয়া উক্ত ব্যথা প্রায় সারিয়া যায়। তাঁহার শরীরে কেন এত কষ্টভোগ সেই সম্বন্ধে তখন বলিয়াছিলেন, "এই জীবনে ত কোন অনর্থ

১ শাস্ত্র বলেন সিদ্ধপুরুষ সত্যসংকল্প হন। মুণ্ডকোপনিষদে (৩।১।১০) আছে—

যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি
বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্।
তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামান্
তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চয়েদ্ ভূতিকামঃ॥ ১

শুদ্ধচিত্ত আত্মজ্ঞ যে যে লোক মনে মনে সংকল্প করেন এবং যেসকল কামনা করেন সেই লোকসমূহ প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার সকল সংকল্প সিদ্ধ হয়। অতএব অভ্যুদয়কামী ব্যক্তি আত্মজ্ঞের অর্চনা করিবেন। কারণ ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্ম অভিন্ন বলিয়া ব্রহ্মের নিকট প্রার্থনা এবং ব্রহ্মবিদের নিকট প্রার্থনা সমান ফলপ্রদ হয়।

হয় নি। তবে কত জীবনের পাপ রয়েছে। এসব ভোগ তারই ফল।" এই উক্তি হইতে জানা যায়, তাঁহার দেহমন কত অপাপবিদ্ধ ও শুদ্ধসত্ত্ব ছিল। ঔষধে যখন তাঁহার অসুখ সারিতেছিল না তখন বলিয়াছিলেন, "ঔষধে আমার বড় কাজ হচ্ছে না, ভোগ হয়ে যাচ্ছে। প্রারব্ধ ক্ষয় হলে শরীরটা পড়ে যাবে।"

স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতি থাকিলেও তিনি হুজুগ পছন্দ করিতেন না এবং সাধুদিগকে স্বীয় পথ ধরিয়া থাকিতে বলিতেন। ১৯২১ সালে নিখিল ভারত কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদানের জন্য অদ্বৈতাশ্রমের জনৈক সাধু অধ্যক্ষকে না বলিয়া আর এক সাধুকে লইয়া চলিয়া যান। ইহা শুনিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ অতিশয় বিরক্ত হন এবং উক্ত সাধু ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলেন, "স্বামীজীর মঠে থাকবে, মঠের সব **advantage** (সুযোগ) নেবে, অথচ মঠের আদর্শ ও **discipline** (নিয়ম) মানবে না, এসব ভাল নয়। এ ত নিমকহারামী।" এই ক্ষেত্রে এইরূপ খোলাখুলি ভৎ'সনা করিলেও দেশের যুবকদের মনের অবস্থা সবিশেষ জানিতেন বলিয়া তিনি এই সব বিষয়ে সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহারই করিতেন। অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভে দেশব্যাপী চাঞ্চল্যে তরুণগণ যখন বিচলিত, বিক্ষিপ্ত তখন স্থানীয় আশ্রমের একটি সাধু হুজুগে মাতিয়া নবপ্রতিষ্ঠিত কাশী বিদ্যাপীঠে যাইয়া বাস করেন। তিনি এ বিষয়ে হরি মহারাজের সহিত কোন পরামর্শ করেন নাই। আশ্রমস্থ সাধুগণ ইহাতে চিন্তিত হওয়ায় হরি মহারাজ বলিলেন, "তোমরা ভেবো না। ও সাময়িক উত্তেজনাবশে গেছে, শীঘ্র ফিরে আসবে।" সিদ্ধ মহাপুরুষের বাক্য সত্য হইল। এক সপ্তাহের মধ্যে সাধুটি ফিরিয়া আসেন।

বালগঙ্গাধর তিলকের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। স্বামীজীর

মুখে তিলকের ভূয়সী প্রশংসা তিনি শুনিয়াছিলেন। তিলক-রচিত 'গীতারহস্যে'র মাধবরায় সাপ্রে-কৃত হিন্দী অনুবাদ ১৯১৭ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে বোম্বাই হইতে আনাইয়া পড়িয়াছিলেন এবং ইহার উচ্চ প্রশংসা করিতেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দ কাব্যরসিক ছিলেন। কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের[১] 'মহিলাকাব্য', 'সবিতা', 'সুদর্শন' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ এত উত্তমরূপে তিনি পড়িয়াছিলেন যে, এইসকল কাব্য হইতে নানা অংশ তিনি বার বার আবৃত্তি করিতেন। 'মহিলাকাব্য' হইতে নিম্নোক্ত অংশ এক পত্রে উল্লেখ করিয়াছিলেন—

"যত সুখ কল্পনায় যত দুঃখ আশঙ্কায়
কার্যকালে না হয় তেমন।
চিরকাল ভাবি ব্যগ্র মানবের মন।"

কাব্যোদ্ধৃতির পর হরি মহারাজ লিখিয়াছিলেন, "ইহা অতি সত্যকথা। আমরা ভাবিয়াই অধীর হই, নচেৎ সবই সহিয়া যায়।"

কাশী সেবাশ্রমে স্বামী তুরীয়ানন্দ তখন অন্তিম অসুখে শয্যাশায়ী। তাঁহার শরীর অত্যন্ত দুর্বল, পাশ ফিরিতে অক্ষম। সংবাদ পাইয়া পাটনা হইতে স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ* প্রমুখ সন্ন্যাসিগণ তাঁহাকে দর্শন করিতে গেলেন। তাঁহারা সেবাশ্রমে সন্ধ্যায় পৌছিয়াছিলেন। তখন হরি মহারাজের সঙ্গে দেখা হয় নাই। শেষরাত্রে সনৎ মহারাজ তাঁহাদের আসিবার সংবাদ তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন। তিনি সংবাদ পাইয়া বলিলেন, "তাদের ডাক।" সনৎ মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন, "এখন রাত্রি

১ সুরেন্দ্রনাথ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহীশিষ্য দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

* স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দের স্বহস্তলিখিত স্মৃতিকথা হইতে সংগৃহীত।

তিনটা, তারা ঘুমুচ্ছে। সকাল হ'লে তাদের ডেকে দেবো।" প্রত্যুষে সনৎ মহারাজ তাঁহাদিগকে ডাকিয়া লইয়া আসিলেন। হরি মহারাজ শয্যায় শায়িত ছিলেন। জ্ঞানেশ্বরানন্দজী মেজের উপর হাঁটু গাড়িয়া তাঁহার মুখের সম্মুখে বসিলেন। তিনি সস্নেহ দৃষ্টিতে তাঁহাদিগকে দেখিতে দেখিতে পাটনা আশ্রমের কাজকর্মের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আশ্রমের কুশল সংবাদ শুনিয়া তিনি খুশী হইলেন। একটু পরে বলিলেন, "কি বল? শরীরটা এবার যাবে।" স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ বলিলেন, "এর চেয়ে বেশী অসুখ হয়েও তো শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় আপনি ভাল হয়েছেন।" তিনি বলিলেন, "তাই ত, স্বামীজীর কাজের অন্ততঃ কতকটা শুরু হয়েছে। এটি না দেখে কি শরীরটা যাবে?"

স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দজীর খুব একটা ভরসা হইল। পরক্ষণেই হরি মহারাজ বলিতে লাগিলেন, "আর শরীরটা যদি যায়ই তাতেই বা কি? ঠাকুর ত দেখিয়ে দিয়েছেন এটা কিছুই নয়।" আবার পাটনা আশ্রমের কাজের কথা তুলিলেন। তাঁহার স্বর উত্তেজিত, মুখমণ্ডল আরক্তিম। দৃঢ়স্বরে তিনি বলিলেন, "সংশয় রেখো না। তাঁর কাজ জেনে সবটা শরীর মন প্রাণ তাতে ঢেলে দাও। এ থেকেই সব হয়ে যাবে। সমাধি-টমাধি যা কিছু ভাবছ সব এর থেকেই হবে। সংশয় রেখো না। কাজে লেগে যাও। স্বামীজী আমায় দার্জিলিং-এ বলেছিলেন, "হরি ভাই, এবারে নূতন একটা পথ করে দিয়ে গেলুম। এতদিন লোকে জানত, ধ্যান, জপ, বিচার প্রভৃতি দ্বারাই মুক্তি হয়। এবারে এখানকার ছেলেরা মেয়েরা তাঁর কাজ করে জীবন্মুক্ত হয়ে যাবে। তাঁর আদেশ সত্য, তাতে সংশয় রেখো না।" হরি মহারাজ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া কথাগুলি বলিতেছিলেন। সনৎ মহারাজ জ্ঞানেশ্বরানন্দজীকে ইঙ্গিত করিলেন,

এত বেশী কথা বলিলে তিনি দুর্বল হইয়া পড়িবেন। তাই তাঁহারা একটু পরে ধীরে ধীরে সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। ইহাই হরি মহারাজের সহিত জ্ঞানেশ্বরানন্দজীর শেষ সাক্ষাৎ।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে আগস্ট মাসে স্বামী তুরীয়ানন্দের অবস্থা খুবই খারাপ হইয়াছিল। এই সংবাদ পাইয়া স্বামী সারদানন্দ কলিকাতা হইতে ডাঃ কাঞ্জিলালকে লইয়া আগস্টের শেষভাগে কাশীধামে গমন করেন। দুই সপ্তাহের মধ্যে গুরুভ্রাতাকে একটু সুস্থ দেখিয়া তিনি সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। স্বামী তুরীয়ানন্দের অবস্থান কালে ইহাই তাঁহার তৃতীয়বার কাশীগমন এবং তপস্বী গুরুভ্রাতার সহিত শেষ সাক্ষাৎ।

স্বামী তুরীয়ানন্দ শীতকালে ঘরের মধ্যে শুইতেন, গরমকালে উঠানে বা আকাশতলে। দয়াল বাবা নামে এক বাঙ্গালী বানপ্রস্থী বৈদ্য তাঁহার কাছে আসিতেন। তিনি গেরুয়া পরিহিত দীর্ঘ শ্মশ্রু-জটাধারী ও সুদর্শন ছিলেন। তিনি কেদার বাবার চিকিৎসা করিতেন। হরি মহারাজও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ মানিয়া চলিতেন। হরি মহারাজের পিঠে ছোট ছোট চুলকনা হইয়াছিল। তিনি নিজে বা সেবক সেগুলি নখে চুলকাইতেন। দয়াল বাবার পরামর্শে সেইগুলি পয়সা দিয়া চুলকাইয়া দেওয়া হইত। একদিন একটি চুলকনা একটু ফুলিয়া যায়, সেঁক দেওয়াতে উহা শক্ত হইয়া উঠে। পরে উহা বাড়িয়া বিস্ফোটকে পরিণত হয়। ইহার পাঁচ-সাত দিন পূর্বে স্বামী ব্রহ্মানন্দের দেহত্যাগের সংবাদ তিনি পাইয়াছিলেন। ইতঃপূর্বে শ্রীশ্রীমাও স্বধামে গমন করিয়াছেন। গুরুভ্রাতা স্বামী অদ্ভুতানন্দের মহাসমাধিও হরি মহারাজ স্বচক্ষে দর্শন করেন। তিনি দুনিয়া হইতে মন গুটাইয়া স্বধামে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন এবং মহাপ্রস্থানের ভবিষ্যদ্বাণী

করিয়া সেবককে বলিলেন, "তিন মাস পরে আমিও যাচ্ছি। আর থেকে কি লাভ, সকলের সেবা নিতে হচ্ছে। স্বামীজী, মহারাজ যেখানে আছেন, সেখানে যাব। উপরে চলে যাব, ঠাকুরের কাছে।" বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল। ঠিক তিন মাস পরে স্বামী তুরীয়ানন্দ মহাপ্রস্থান করিলেন।

নবম অধ্যায়

মহাসমাধি

কলিকাতা হইতে কাশীধামে যাইবার পর স্বামী তুরীয়ানন্দের শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। বহুমূত্র ত ছিলই। আবার দুইবার উপর্যুপরি ইনফ্লুয়েঞ্জা হয় এবং পূর্বের হাঁপানি রোগও দেখা দেয়। ফলতঃ নানা ব্যাধিতে তাঁহাকে জীবনের শেষ তিন বৎসর, আমাদের সাধারণ দৃষ্টিতে, অতিশয় শারীরিক কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। সেই সময় কাশী হইতে যেসকল পত্র লিখিয়াছিলেন উহাদের কয়েকটিতে ইহার কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। ১৯১৯ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে কোন ভক্তকে পত্রে লিখিয়াছিলেন, "আমার কাশিটা অনেক কমিয়াছে এবং আমের ভাব আর নাই বলিলেই হয়। কিন্তু পায়ের বেদনা যেমন তেমনই আছে, বরং একটু বাড়িয়াছে। এখানে দুই বেলাই একটু চলাফেরা করি; অধিক দূর নহে নিকটেই ২০০।৪০০ পা হাঁটিয়া থাকি মাত্র।" উক্ত বৎসর জুন মাসে অন্য একজনকে লিখিয়াছিলেন, "এখানে আসিয়া আমার শরীর প্রথমে খুবই খারাপ হইয়াছিল। প্রায় দেড়মাস সর্দিকাশি ও অন্যান্য অনেক প্রকার উপদ্রব সহিতে হয়। পরে সে ভাবটা চলিয়া গিয়া একটু প্রকৃতিস্থ হই। কিন্তু পূর্বের যেসব রোগ ছিল তাহাদের এ পর্যন্ত কোন উপকারই দেখিতে পাইলাম না। Diabetes (বহুমূত্র)* যেন বাড়িয়াছিল। কলিকাতায় থাকিতে প্রস্রাবে চিনি

---

* ১৯১১ খ্রীঃ স্বামী তুরীয়ানন্দের বহুমূত্র রোগ প্রথমে ধরা পড়ে। উক্ত রোগ-বৃদ্ধির ফলে তাঁহার শরীরে বিস্ফোটক ও দুষ্ট ব্রণ বার বার হয়। সেইজন্য তাঁহার শরীরে প্রথম অস্ত্রোপচার হয় পুরীতে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে। উদ্বোধন অফিসে ও বলরাম মন্দিরে অবস্থানকালেও ১৯১৮ খ্রীঃ

ছিল ১৯ গ্রেন। এখানে আসিয়া ৩৩ গ্রেন অবধি হইয়াছিল। সেদিনের পরীক্ষায় ২৬ গ্রেন পাওয়া গিয়াছে। পায়ে হাতে বেদনা প্রায় সমানই রহিয়াছে; তাহাতে ইচ্ছামত চলাফেরা করিতে পারি না।"

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে তাঁহার বহুমূত্ররোগ পূর্ববৎই ছিল। উক্ত মাসে কোন ভক্তকে তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমার শরীর বেশ ভাল থাকে না। সম্প্রতি কবিরাজি চিকিৎসা করাইতেছি। খাইবার ঔষধ পাঁচন, পায়ে লাগাইবার প্রলেপ প্রভৃতি অনেক রকম চলিতেছে। উপশমবোধ এখনও কিন্তু কিছু হয় নাই।" উক্ত বৎসর আগস্ট মাসে সর্দিজ্বরে তিনি চার-পাঁচ দিন ভুগিয়াছিলেন। তাঁহার প্রস্রাবে চিনি আবার অত্যন্ত বাড়িয়াছিল; পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, প্রতি আউন্সে ৩০½ গ্রেন চিনি ছিল। পায়ের বেদনার জন্য তাঁহার চলা-ফেরাও প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসে একজনকে পত্রে লিখিয়াছিলেন, "আমার শরীর ক্রমেই অধিকতর দুর্বল হইতেছে। পায়ের বেদনা অনেক বাড়িয়াছে। এখন আর ইচ্ছামত চলাফেরা করিতে পারি না। আশ্রমের মধ্যে অল্প-স্বল্প পায়চারি করি। আহার ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে, অরুচি খুব আছে।" উক্ত বৎসর এপ্রিল মাসে তাঁহার কানে পুঁজ হইয়াছিল। স্নানকালে কানে জল ঢুকিয়া এইরূপ হয়। কানের যন্ত্রণায় প্রায় এক সপ্তাহ তিনি ছট্‌ফট্‌ করিয়াছিলেন। কত ঔষধ ডাক্তাররা দিলেন, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হইল না। ব্যথার আধিক্যে তিন রাত্রি তিনি আদৌ ঘুমাইতে পারেন নাই। পায়ের বেদনা এত অধিক

ছোট ছোট দুই-তিনটি অস্ত্রোপচার হয়। কিন্তু ছোট বা বড় কোন অস্ত্রোপচারকালেই তাঁহাকে ক্লোরোফর্ম দ্বারা সংজ্ঞাহীন করিতে হয় নাই। ইহা শুনিয়া শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, "হরি শরীর থেকে মন সরিয়ে নিতে পারে ঠাকুরের মত।"

হইয়াছিল যে, তাঁহাকে চলাফেরা একেবারে বন্ধ করিতে হয়। একটু চলিলে ভয় হইত, পাছে পড়িয়া যান। প্রস্রাবে এ্যাল্‌বুমেন বাড়িয়াছিল, আবার এ্যাসিটোন দেখা দিল। রুটি, ঘি, মাখন, বাদাম প্রভৃতি খাওয়া বন্ধ করিতে হইল। তখন দিনে ভাত ও রাত্রে ওটমিল খাইতেন। ভাতের সঙ্গে সামান্য তরকারি ও দুধ থাকিত। কিন্তু ভয়ানক অরুচি থাকায় কিছুই খাইতে পারিতেন না।

উক্ত মাসের শেষে কোন পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমি এখন স্কুল বাড়িতেই শুই। কয়েকদিন হইল বাহিরেই শুইতেছি। কানের বেদনা সারিয়া গিয়াছে। দশ-পনের দিন খুব কষ্ট দিয়াছিল। প্রস্রাবে এ্যাসিটোন ও এ্যাল্‌বুমেন আর তেমন নাই; সুগারও কমিয়া গিয়াছে। আহারে ধরাকাট করিয়া কিন্তু শরীরও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। অরুচিও পূর্বের ন্যায় আছে। ভাত খাই, তাই একটু ভাল আছি; রাত্রে ওটমিল খাইতেছি।" ফলতঃ কোন ঔষধে বা পথ্যে তিনি তখন উপকার পাইতেন না। অল্প অসুখই ভীষণ হইয়া পড়িত। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত তাঁহার শরীর পূর্ববৎই চলিল। পায়ের বেদনায় কাতর হইয়া তিনি শয্যাশায়ী হইলেন।

১৯১৯ খ্রীঃ হরি মহারাজের শরীরে কোন অস্ত্রোপচার হয় নাই। ১৯২০ খ্রীঃ শ্রীশ্রীমায়ের দেহত্যাগের কিছু পরে তাঁহার বাম বুকে উপরের দিকে একটি ফোড়া হয়। ফোড়াটা শীঘ্র পাকিয়া উঠে এবং ইহা হইতে প্রচুর পুঁজ বাহির হয়। উহাতে অস্ত্রোপচার আবশ্যক হয় নাই। ১৯২১ খ্রীঃ বর্ষার প্রারম্ভে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে তাঁহার একটি বড় দুষ্ট-ব্রণ হইল। কাশীর প্রসিদ্ধ সার্জন ভূষিত বাবু উহার উপর অস্ত্রোপচার করেন। তখন ডাঃ চৌধুরী প্রভৃতি ছয়-সাত জন ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন। আক্রান্ত জায়গার একটা বড় চাকা কাটিয়া তুলিয়া ফেলা হয়।

অস্ত্রোপচারকালে ক্লোরোফর্ম দ্বারা তাঁহাকে সংজ্ঞাহীন করিতে হয় নাই। তিনি চোখ খোলা রাখিয়া দেহ হইতে মন সরাইয়া লইলেন। মনে হইল যেন অন্য কাহারও শরীরে অস্ত্রোপচার হইতেছে। ডাক্তার অস্ত্রোপচারের পরে ক্ষতস্থান ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। পরদিন তিনি আসিয়া পুনরায় ক্ষতস্থানটি দেখিলেন এবং হরি মহারাজকে কিছু না বলিয়া ধারাল কাঁচি দিয়া সামান্য একটু অতিরিক্ত মাংস কাটিবার চেষ্টা করিলেন। পূর্বদিন এত বড় অস্ত্রোপচারকালে হরি মহারাজ কোন সাড়া-শব্দ করেন নাই, একবারও 'আঃ' 'উঃ' বলেন নাই। সুতরাং এই সামান্য মাংসটুকু কাটিয়া লইলে তিনি বুঝিতে পারিবেন না এই ভাবিয়া ডাক্তার ঝোলা মাংসটুকু কাঁচিতে ধরিলেন, অমনি হরি মহারাজ চেঁচাইয়া এত চমকাইয়া উঠিলেন যে, ডাক্তারের হাত হইতে কাঁচি পড়িয়া গেল! ডাক্তার আর মাংসটুকু কাটিতে চেষ্টা করিলেন না। পরন্তু হরি মহারাজকে সেইদিন ঐরূপ চিৎকারের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, ডাক্তার পূর্বে কিছু না বলায় তিনি শরীর হইতে মন সরাইবার অবকাশ পান নাই। দেহে যতক্ষণ মন থাকে ততক্ষণ দৈহিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়—দেহ নিজ ধর্ম্ম পালন করিয়া কষ্ট জ্ঞাপন করে।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে বর্ষার প্রারম্ভে হরি মহারাজের পৃষ্ঠে একটি সামান্য দুষ্ট-ব্রণ দেখা দিল। কলিকাতার ও স্থানীয় সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণের পরামর্শে ও প্রযত্নে তিনি উহা হইতে আবার সারিয়া উঠিবেন, এইরূপ সকলের দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল। বিশেষতঃ ইতঃপূর্বে ইহাপেক্ষা দ্বিগুণ সঙ্কটজনক অবস্থা হইতেও তিনি আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন, ইহা সকলেরই স্মরণে ছিল। ক্রমে উক্ত ক্ষুদ্র ব্রণ একটি বৃহৎ দুষ্ট-ব্রণে পরিণত হইল ও, ভীষণ আকার ধারণ করিল এবং উহাতে

অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হইল। কলিকাতা হইতে ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল অস্ত্রোপচারের জন্য কাশীতে আসিলেন। মহাসমাধির প্রায় একমাস পূর্বে হরি মহারাজের পিঠে এই সর্বশেষ অস্ত্রোপচার হয়। দুষ্ট-ব্রণটি পৃষ্ঠের কেন্দ্রস্থলে উঠিয়াছিল। উহার উপরে চারিদিকে চারিটা লম্বা লম্বা চির দেওয়া হইল। কিন্তু ইহা হইতে পুঁজ-রক্ত কিছুই পড়িল না। পূর্ব পূর্ব বারের ন্যায় এবারও ক্লোরোফর্ম ব্যতীত অস্ত্রোপচার নিষ্পন্ন করাইলেন। ডাঃ কাঞ্জিলাল তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আপনাকে অস্ত্রোপচারকালে সাধারণ লোকের মত চিৎকার করতে হবে।" কিন্তু হরি মহারাজ অস্ত্রোপচারকালে কোন সাড়াশব্দ করিলেন না; কেবল তৎপর কৌতুকচ্ছলে ডাক্তারের অনুরোধ রাখিবার জন্য 'বাপ রে মা রে' বলিয়া চিৎকার করিয়া সকলের হাস্য উৎপাদন করিলেন। অস্ত্রোপচারের পরে হরি মহারাজের সমস্ত পিঠ পচিয়া গেল, ডাক্তার আরোগ্যের আশা একেবারে ছাড়িয়া দিলেন। সকলে বুঝিলেন, মহাসমাধি সন্নিকট।

মহাসমাধির দুই-তিন সপ্তাহ পূর্বে এই দুঃসংবাদ সংঘের বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রেরিত হইল। তাঁহার শেষ দর্শনলাভের জন্য বহু সাধু, ব্রহ্মচারী ও ভক্ত কাশীতে উপনীত হইলেন। স্বামী বিবেকানন্দের মার্কিন শিষ্যা কুমারী ম্যাকলাউড পুরীধাম হইতে আসিলেন। তিনি হরি মহারাজকে বলিলেন, "আপনি শীঘ্র সেরে উঠুন, স্বামীজীর কাজ করতে হবে।" হরি মহারাজ স্বীয় শয্যায় কাত হইয়া শুইয়াছিলেন, সমগ্র পিঠে অস্ত্রোপচার-জনিত ক্ষত থাকায় তিনি চিৎ হইয়া শুইতে পারিতেন না। তাঁহার শরীরে তখন ভীষণ যন্ত্রণা। কিন্তু স্বামীজীর নাম শুনিয়া তিনি রোগ-যন্ত্রণা ভুলিলেন এবং মার্কিন স্ত্রী-ভক্তের কথা সমর্থনপূর্বক ইংরেজীতে বলিলেন, "হাঁ, হাঁ। নিশ্চয়ই।" কিছুক্ষণ

থাকিয়াই মিস্ ম্যাকলাউড চলিয়া গেলেন। বিদায়গ্রহণের পূর্বে মিস্ ম্যাকলাউড বলিলেন, "আপনি স্বামীজীকে ভালবাসতেন, স্বামীজী আপনার খুব প্রিয় ছিলেন। আপনাকে স্বামীজীর একটি স্ফটিক-মূর্তি উপহার দিচ্ছি।" এই বলিয়া তিনি ইতালীর বিখ্যাত ভাস্কর লালিক স্ফটিক-পাথরে স্বামীজীর যে পরিব্রাজক-মূর্তি খোদাই করিয়াছিলেন তাহার একটি উপহার দিলেন। স্বামীজীর স্ফটিক-মূর্তিটি হরি মহারাজ হাতে লইয়া ভাল করিয়া দেখিলেন ও খুব আনন্দিত হইলেন। উক্ত মূর্তিটি আলমোড়া রামকৃষ্ণ কুটীরে অদ্যাপি সংরক্ষিত আছে। তখন হরি মহারাজ সমীপস্থ সেবককে বলিলেন, "দেখলে এদের কেমন good training (ভাল শিক্ষা)! রোগীকে বেশীক্ষণ বিরক্ত করলে না। দেশী লোক হলে নানা কথা বলে প্রাণ বার করে দিত।"

গুরুভ্রাতাগণের মধ্যে কৈশোরসহচর স্বামী অখণ্ডানন্দজী কেবল তুরীয়ানন্দজীর অন্তিম শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। অখণ্ডানন্দজী বলেন, "দৈহিক যন্ত্রণা অসহ্য হইলে হরি মহারাজ কখনও 'মা, মা,' কখনও বা 'দীনবন্ধু, কৃপাসিন্ধু, দুঃখনিবারণ' বলিয়া ইষ্টনাম উচ্চারণ করিতেন।" স্বামী তুরীয়ানন্দের কাছে অবস্থিতির সময় স্বীয় আশ্রমে ত্বরায় ফিরিবার জন্য তিনি এক পত্র পাইলেন। কিন্তু কাশীস্থ আশ্রমদ্বয়ের সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীরা তাঁহার যাত্রায় বাধা দিলেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া স্বামী অখণ্ডানন্দ হরি মহারাজের কক্ষে প্রবেশ করিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এস, ভাই এস। দাদা এস। তুমি কাছে না থাকলে সব ভুল হয়ে যায়। তুমি এখন যেও না।" স্বামী অখণ্ডানন্দ গুরুভ্রাতার অনুরোধে যাত্রা বন্ধ করিলেন। তিনি কাছে আসিলেই কয়েকদিন ধরিয়া হরি মহারাজ কথাপ্রসঙ্গে প্রায়ই স্বামীজীর এই বাক্যটি উচ্চারণ করিতেন, "দীয়তাং ভুজ্যতাং।"

ইহার নিগূঢ় উদ্দেশ্য না বুঝিলেও গঙ্গাধর মহারাজ তাঁহার কথায় সায় দিতেন। পূর্ব পূর্ব বৎসরে একাধিকবার হরি মহারাজ এরূপ কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। এবারে তাঁহার আরোগ্যকামনায় সাধু-ব্রহ্মচারীরা অখণ্ডানন্দজীকে ধরিয়া বসিলেন, "মহারাজ, একটা ভাণ্ডারা দিন।" স্বামী অখণ্ডানন্দ সেবার নিঃসম্বল অবস্থায় কাশী গিয়াছিলেন। সুতরাং তখন তাঁহার পক্ষে ভাণ্ডারা দেওয়াও দুঃসাধ্য, আবার সাধু-ব্রহ্মচারীদিগকে বিমুখ করাও সুকঠিন। কিন্তু সেদিন হরি মহারাজের কক্ষে যাইয়া এই কথা প্রস্তাব করিতেই সমস্যার সমাধান হইল। তাঁহার প্রধান সেবকের সহিত পরামর্শ করিয়া এবং হরি মহারাজের অনুমতি লইয়া অখণ্ডানন্দজী ভাণ্ডারা দিবার ব্যবস্থা করিলেন। হরি মহারাজের সেবার্থ ভক্তগণ যে টাকা পাঠাইতেন তাহার উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে ভাণ্ডারার ব্যয়নির্বাহ করা হইল। ভাণ্ডারায় উভয় আশ্রমের সমস্ত সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও কর্মী পরিতোষপূর্বক ভোজন করিলেন।

মহাসমাধির প্রায় এক সপ্তাহ পূর্বে মৃত্যুঞ্জয়ী মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন, "আর পাঁচ-ছয় দিন খুব আনন্দ করে নাও।" দেহরক্ষার দুই-এক দিন পূর্বে বৈকালে হরি মহারাজ স্বীয় সেবককে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার কৌপীন ও কমণ্ডলু কোথায়?" সেবক উত্তর দিলেন, এই ঘরের মধ্যেই আছে অমুক অমুক জায়গায়। তিনি সেবককে আবার বলিলেন, "আমি সাধু, গাছতলায় থাকব, ভিক্ষা করে খাব। এখানে কি? এখন কোথায় আছি?" সেবক উত্তর দিলেন, "এটা কাশী সেবাশ্রম।" সম্ভবতঃ তখন তাঁহার মন সমাধিলোকে চলিয়া গিয়াছিল। তাই তথা হইতে দেহভূমিতে নামিয়া স্থান-কালের জ্ঞানলাভে অক্ষম ছিল। হরি মহারাজ তখন এত দুর্বল হইয়াছিলেন যে, উঠিয়া বসিতে,

পাশ ফিরিতে বা নড়িতে চড়িতে পারিতেন না; কিন্তু তাঁহার দীপ্ত তেজ তখনও হ্রাস পায় নাই। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আমায় কৌপীন পরিয়ে দাও, কমণ্ডলু দাও। আমি গাছতলায় থাকব। মনে করছ, আমি হাঁটতে পারব না। দেখ্‌বে?" সেবক তাঁহাকে শান্ত করিবার জন্য বুঝাইয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি নিশ্চয়ই পারবেন। আপনার পায়ে একটা ক্ষত হয়ে পুঁজ হয়েছিল, ঔষধ দিয়েছি। শীঘ্র সেরে যাবে। তখন আপনি যাবেন, ইচ্ছা করলে।" সেবকের সান্ত্বনায় তেজস্বী সন্ন্যাসী নিরস্ত হইলেন।

১৯২১ খ্রীঃ অসহযোগ আন্দোলনের প্রারম্ভ হইতেই তিনি উহার সম্বন্ধে আলোচনাপূর্বক ফলাফল-নির্ধারণে চেষ্টা করিতেন। অন্তিম সময়েও তাঁহাকে কয়েকবার সি. আর. দাস, সি. আর. দাস নামটি উচ্চারণ করিতে শোনা গিয়াছিল, যেন তাঁহার নিঃস্বার্থতার জন্য তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ আশীর্বাণী দিয়া গেলেন। শরীরত্যাগের দুই-এক দিন পূর্ব হইতেই আহারে তিনি সম্পূর্ণ বীতরাগ হইয়াছিলেন। অসহ্য যন্ত্রণা সহিয়া তিনি মনের অলৌকিক সংযম ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছেন। Toxin-poisoning (রোগবিষে রক্তদুষ্টি) হওয়া সত্ত্বেও অনেক সময় সুস্থ মানুষের ন্যায় কথাবার্তা কহিতেন। উঠিয়া বসিতে অনেক সময় তাঁহার ইচ্ছা হইত এবং নিকটে যাহাকে দেখিতেন তাহাকে সম্বোধন করিয়া উঠাইয়া বসাইয়া দিতে বলিতেন। আবার বসাইয়া দিবার পরে তাঁহার দুর্বল অবস্থা দেখিয়া যদি কেহ তাঁহাকে ধরিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি বিরক্ত হইয়া বলিতেন, "ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। আমাকে ধরো না, আপনি বসব। গায়ে হাত দিও না, গায়ে হাত দিও না।"

মহাসমাধির পূর্বরাত্রির শেষে তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "কাল শেষ দিন, কাল শেষ দিন।" আবার ইংরেজীতে বলিলেন, "To-morrow

last day !" তখন সেই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য বলিয়া কেহ 'ভাবিতে পারেন নাই। বৃহস্পতিবারেও বুঝা যায় নাই যে, পরদিন তিনি মহাসমাধিতে মগ্ন হইবেন। কারণ দুই-চারি দিন পূর্ব হইতে তাঁহার অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালই যাইতেছিল। মহাসমাধির দিবস ও শেষরাত্রে তিনি যে-সমস্ত কথাবার্তা বলিয়াছিলেন তাহার গূঢ় অর্থ তখন সম্যক্ বুঝা যায় নাই। কিন্তু মহাসমাধির পর সকলে বুঝিলেন, তিনি পূর্ব হইতেই জানিয়া সেবকগণকে উহার আভাস দিয়াছিলেন এবং নিজেও উহার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। মৃত্যুশয্যায় তাঁহার অমানুষিক সহ্যগুণ দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত ও বিস্মিত হইলেন। ইতঃপূর্বে রোগযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে সহসা মৃত্যুঞ্জয়ী বেদান্ত-কেশরী কম্বুকণ্ঠে বলিয়া উঠিতেন, "আমি এসব যন্ত্রণা, ক্ষতাদি মনেই করি না। কি হয়েছে, কার হয়েছে ?" সেবক সুদীপ্ত সিংহকে শান্ত করিবার জন্য বলিতেন, "না, আপনার কিছুই হয় নাই; আপনার কি হবে ?"

১৩২৯ সালের ৫ই শ্রাবণ (২১শে জুলাই ১৯২২ খ্রীঃ) শুক্রবার স্বামী তুরীয়ানন্দের জীবনের শেষ দিন। সেদিন প্রাতে তাঁহার গুরুভ্রাতা স্বামী অখণ্ডানন্দ তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া 'সুপ্রভাত' বলিলেন এবং তিনিও "এস দাদা, এস দাদা, সুপ্রভাত, সুপ্রভাত" এইরূপ উত্তর দিলেন। প্রত্যহ প্রাতে গুরুভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে যেরূপ শুভবাক্যের বিনিময় হইত শেষ দিনও সেইরূপ হইল। তৎপরে হরি মহারাজ বারংবার বলিতে লাগিলেন, "আমরা মায়ের, মা আমাদের। মা আমাদের, আমরা মায়ের।" তৎপর শ্রীশ্রীচণ্ডীর নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকদ্বয় আবৃত্তি করিলেন—

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

ইহার পরে মহামায়ীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন। সেদিন দ্বিপ্রহরে এবং বৈকালেও জগদম্বাকে এইরূপে প্রণতি জানাইয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার প্রকাশ করিলেন, "বড় যন্ত্রণা হচ্ছে। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।··· তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হচ্ছে, লোকে জানতে পারছে না।"

সেদিন তিনি সেবকদের কাহারও কোন কথা শুনিতে চাহিলেন না এবং বিরক্তস্বরে সকলকে বারংবার ঘরের বাহিরে যাইতে বলিলেন। মনে হয়, সেবকদের উপর তাঁহার বহুবর্ষব্যাপী স্নেহমমতার যে বন্ধন ছিল তাহা ছিন্ন করিবার জন্য তিনি এইরূপ করিতেছিলেন। মহাসমাধির দুই-তিন ঘণ্টা পূর্বে তিনি সেবক স্বামী ভবেশানন্দকে তীব্র তীরস্কার করিয়া ঘরের বাহিরে যাইতে আদেশ দিলেন। তৎপরে প্রধান সেবক স্বামী প্রবোধানন্দকে কোমলস্বরে বলিয়াছিলেন, "তোমরা আমায় ছেড়ে দাও, তা হলেই নিশ্চিন্ত হতে পারি।" উক্ত সেবক উত্তর দিলেন, "আমরা আপনাকে ছেড়ে দিয়েছি। আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন।" উহার একটু পরেই হরি মহারাজ আবার বলিলেন, "সব হয়ে গেছে?" সেবক উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে হাঁ।" তিনি বলিলেন, "তবে যাই, তবে যাই।" সেবক ইহা শুনিয়া নীরব রহিলেন, আর কোন উত্তর দিলেন না। কোনরূপ খাদ্য মুখে দিলেই তিনি 'থু থু' করিয়া ফেলিয়া দিতেছিলেন এবং ঔষধ একেবারেই খাইতেছিলেন না। তাঁহার এইরূপ আচরণে সেবকগণ স্বামী অখণ্ডানন্দকে ডাকাইলেন। গুরুভ্রাতা কাছে আসিতেই হরি মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন, "আমার বন্ধন খুলে দাও, সব বন্ধন খুলে দাও। কি এ সব?" তাঁহার পৃষ্ঠদেশে বৃহৎ ক্ষত থাকায় বুকে ব্যাণ্ডেজ করা হইয়াছিল। তৎক্ষণাৎ কাঁচি দিয়া সেই ব্যাণ্ডেজ কাটিয়া

দেওয়া হইল। তখন তিনি শান্তভাবে সেবককে বলিলেন, "খুলে দিয়েছ, বেশ করেছ, একটু গায়ে হাত বুলিয়ে দাও।" তখন স্বামী অখণ্ডানন্দের অনুরোধে তিনি একবার ঔষধও খাইলেন।

বৈকালে ক্ষতস্থান আবার ব্যাণ্ডেজ করিবার পর তিনি আপন মনে ইংরেজীতে কথা বলিতে লাগিলেন। তাঁহার একান্ত অনুরক্ত শিষ্যতুল্য সেবক ও ভক্ত মার্কিন সন্ন্যাসী স্বামী অতুলানন্দের নাম দুইবার উচ্চারণ করিলেন, 'গুরুদাস' 'গুরুদাস'। স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী সারদানন্দ এবং আরও কাহারও কাহারও নাম তাঁহার মুখে তখন উচ্চারিত হইল। তাঁহাকে এইরূপ কথা বলিতে দেখিয়া গঙ্গাধর মহারাজ বলিলেন, "আপনি একটু ঘুমান।" হরি মহারাজ ইংরেজীতে উত্তর দিলেন, "Yes, I want that (হাঁ, আমি তা চাই)।" কিছুক্ষণ পরে পার্শ্বে উপবিষ্ট জনৈক সেবককে ডাকিয়া বলিলেন, "Can you make me get up (আমাকে বসিয়ে দিতে পার)?" সেবক সবিনয়ে উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আপনার কষ্ট হবে।" ইহাতে হরি মহারাজ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "That is a mistake on your part (সেটা তোমার ভুল)।" তখন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কে আছে?" তদুত্তরে স্বামী প্রবোধানন্দের নাম করায় সুস্থ অবস্থায় যেরূপভাবে তিনি ডাকিতেন সেইরূপ অতি গম্ভীরস্বরে 'সনৎ' বলিয়া ডাকিয়া আদেশ দিলেন, "আমায় বসিয়ে দাও।" তদনুসারে তাঁহাকে বসাইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু তিনি বসিতে পারিলেন না, মাথা ঝুকিয়া পড়িল। তখন তিনি বলিলেন, "Can't you give me strength? Can't you give me strength (আমাকে তোমরা বল দিতে পার না)? আমায় তুলে ধর, আমায় তুলে ধর।" নিজে তিনি সোজা হইয়া বসিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। সেই সময় 'মহামায়া' নামটি তাঁহার

মুখে দুইবার শোনা গেল। কিন্তু তাঁহার উর্ধ্বদৃষ্টি এবং দীর্ঘশ্বাসের লক্ষণ দেখিয়া তাঁহার ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে শোওয়াইয়া দেওয়া হইল। অল্পক্ষণ শুইয়া থাকিবার পর তিনি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, 'প্রভু' 'প্রভু'। তখন গঙ্গাধর মহারাজ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া ডাকিলেন, 'দাদা' 'দাদা'। হরি মহারাজ উত্তর দিলেন, "ঠাওর করতে পারছি না।" পরে বলিলেন, "হরের্নামৈব হরের্নামৈব, ওঁ রামকৃষ্ণ ওঁ রামকৃষ্ণ, আমায় বসিয়ে দাও।"

ইতোমধ্যে হোমিওপ্যাথ ডাঃ বি. কে. বসু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি উঠাইয়া বসাইতে নিষেধ করিলেন এবং হরি মহারাজকে একটু ব্র্যাণ্ডি খাওয়াইবার জন্য সেবককে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু সেবক তাহা করিতে সাহসী না হওয়ায় ডাঃ বসু স্বয়ং ঔষধপাত্রে একটু ব্র্যাণ্ডি লইয়া হরি মহারাজকে খাওয়াইতে গেলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার বিরক্তিভাব দেখিয়া পশ্চাৎপদ হইলেন। তাহার পর হরি মহারাজ বলিলেন, "কই বসিয়ে দিলে না? আমায় বসিয়ে দাও, বসিয়ে দাও।" বেশ বোধ হইল, আসনে বসিয়া দেহত্যাগ করিবার জন্য তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু যখন দেখিলেন, তাঁহাকে বসাইয়া দেওয়া হইল না তখন বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "সব বোকা, কেউ বুঝতে পারছে না। শরীর যাচ্ছে, প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে।" বলিলেন, "পা টেনে সোজা করে দাও।" তাঁহার পা দুইটি টানিয়া দেওয়া হইলে তিনি আদেশ দিলেন, "টানো, টানো, ভাল করে টেনে সোজা করে দাও, হাত তুলে ধর। হাত তুলে ধর।" তাঁহার হাত দুইটি তুলিয়া ধরা হইলে তিনি বলিলেন, "তোল, তোল, তোল, আরও তোল।" তদ্রূপ করা হইলে দুই হাত জোড় করিয়া 'জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব, জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ'

বলিয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণামৃত দিলে দুইবার পান করিলেন এবং বলিলেন—"সব সত্য—ব্রহ্ম সত্য, সংসার সত্য, জগৎ মিথ্যা নয়—সব সত্য, সত্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত। হাত তুলে ধর—জয় গুরুদেব, জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ—বলো, বলো, সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ।" স্বামী অখণ্ডানন্দ উপনিষদের "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই বাক্য উচ্চারণ করিলেন। ইহা শুনিয়া হরি মহারাজ খুব আনন্দের সহিত বলিলেন, "হুঁ, ঠিক। আবার বল।" তখন গঙ্গাধর মহারাজ আবার বলিলেন, "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম।" হরি মহারাজও উচ্চারণ করিলেন, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।" গঙ্গাধর মহারাজ উপরোক্ত উপনিষদ্‌বাক্য আবার বলিলেন। কিন্তু হরি মহারাজ উহা উচ্চারণ না করিয়া বলিলেন, 'ব্যস' এবং স্থির চিত্তে আত্মপ্রত্যক্ষ করিতে করিতে সজ্ঞানে মহাসমাধিস্থ হইলেন। মনে হইল যেন ঘুমাইয়া পড়িলেন, মুখে বিষাদ, বিকৃতি বা যন্ত্রণার চিহ্নমাত্র আর দেখা গেল না। মহাসমাধিমগ্ন মহাপুরুষের মুখমণ্ডল স্বর্গীয় সৌন্দর্য ও মাধুর্যে ভাস্বর হইয়া উঠিল। শেষ কয়েকদিন তাঁহার দেহ যেরূপ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল তাহাতে অনেকের আশঙ্কা হইয়াছিল, বুঝিবা অজ্ঞান অবস্থায় তাঁহার দেহত্যাগ হয়। কিন্তু জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের মনের শক্তি প্রাকৃত বুদ্ধির অগোচর। যদিও তিনি শেষ কয়দিন প্রায়ই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিতেন তথাপি মহাসমাধির কয়েক মিনিট পূর্বে সহসা যেন অন্য লোক হইয়া গেলেন এবং দুঃসহ রোগ-যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করিয়া ভগবানের নাম করিতে লাগিলেন। আর চরম সময়ে মহামায়ার রঙ্গস্থল শেষবার দেখিয়া লইবার নিমিত্ত যেন চক্ষুদ্বয় বিকচ কুসুমের মত প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। তখন নয়নযুগল হইতে

তন্দ্রাভাব দূরীভূত—মুখে এক অনাসক্ত অলৌকিক ভাব ও শান্তি। চারিদিক দেখিতে দেখিতে তিনি ইহধাম হইতে বিদায় লইলেন। শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ মিনিটের সময় স্বামী তুরীয়ানন্দ সার্ধ উনষষ্টি বৎসর বয়সে মহাসমাধিস্থ হইলেন।[১] সেবাশ্রম মুখরিত এবং সান্ধ্য গগন প্রকম্পিত করিয়া উচ্চ সংকীর্তনরোল উঠিল, 'রামকৃষ্ণ, হরিবোল।' সন্ধ্যা হইতে পরদিন প্রাতঃকাল পর্যন্ত সমগ্র রাত্রি কীর্তন ভজন পাঠাদিতে অতিবাহিত হইল। শনিবার প্রাতে সাধু-ভক্তমণ্ডলী তাঁহার পুণ্য শরীর কুসুমচন্দনচর্চিত করিয়া আরাত্রিকাদির পর মণি-কর্ণিকার মহাশ্মশানে আনিয়া ভাগীরথীতে জল-সমাধি দিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দের মহাসমাধি উপলক্ষে কাশীধামস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ 'অদ্বৈতাশ্রমে ১৯২২ খ্রীঃ ২রা আগস্ট বুধবার ঠাকুরের বিশেষ পূজা ও চণ্ডীপাঠ এবং সাধু-ভক্ত-দরিদ্র-নারায়ণসেবাদি সমারোহে সম্পন্ন হয়। হরি মহারাজের ব্যবহৃত জিনিসপত্রাদি আলমোড়া শ্রীরামকৃষ্ণ কুটীরে রক্ষিত আছে।

পরিশেষে স্বামী মাধবানন্দের কথায় পুনরাবৃত্তি করিয়া আমরাও বলি, "স্বামী তুরীয়ানন্দের মৃত্যুকে যদি মৃত্যুই বলা যায় তবে উহা তাঁহার জীবনের মতই মহিমময়। বস্তুতঃ তাঁহার মৃত্যু মৃত্যুই নহে, উহা মহামুক্তি, মৃত্যুঞ্জয়, অমরধামে গমনমাত্র। স্বামী তুরীয়ানন্দের মত মহাপুরুষের মহিমা আমাদের মত ইন্দ্রিয়জ্ঞানাবদ্ধ মানুষ কতটুকু বুঝিতে পারে? আমরা মাত্র এইটুকু বলিতে পারি, শুধু তাঁহার সান্নিধ্যই ছিল পরমানন্দলাভের সমান। তাঁহার ভাগবত চরিত্রের জ্যোতি এবং জ্ঞানগর্ভ উপদেশের শক্তি শ্রোতার মনের ঘনান্ধকার,

১ 'উদ্বোধন' পত্রিকায় ১৩২৯ ভাদ্র সংখ্যায় মহাসমাধির বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত। 'মাসিক বসুমতী'র ১৩২৯ ভাদ্র সংখ্যায় শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসুর প্রবন্ধেও বহু তথ্য প্রদত্ত।

তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট করিত। শ্রোতা তাঁহার সান্নিধ্য হইতে এই ধারণা লইয়া ফিরিয়া আসিতেন যে, তিনি যে ব্যক্তির সঙ্গলাভ করিলেন সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের সহিত নিরন্তর সুগভীর সংযোগ অনুভব করেন। এই একটি বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত যে, ত্যাগ সংযম পবিত্রতা আধ্যাত্মিকতা প্রেম প্রভৃতি দৈবী সম্পদের প্রার্থী জগতে যতকাল থাকিবেন ততকাল স্বামী তুরীয়ানন্দের শুভ নাম আদর্শ ধর্মাচার্যরূপে মানবের মানসপটে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।"[১]

ওঁ তৎ সৎ। ওঁ শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু।

১ 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামক ইংরেজী মাসিকের ১৯২২ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে অনূদিত ও উদ্ধৃত।